দণ্ডক-শবরী

দ্বিতীয় পর্ব

নারায়ণ সান্যাল
(বিকর্ণ)

৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

মৌলানা সাহেব এসেছিলেন কোরাপুটে। অর্থ উপদেষ্টা। কিন্তু সেটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। সুলেখক আর সুরসিকই শুধু নন, সজ্জন। বললেন : ও পাড়ায় যাবেন নাকি? পারালকোট যাচ্ছি দিন তিনেকের জন্য।

বললুম : আলবৎ যাব। পিল্লাইসাহেবের নিমন্ত্রণ তামাদি হয়ে যাবার উপক্রম করছে। গত একবছর ধরে তালই ঠুকছি শুধু।

: পিল্লাই? ডাক্তার আর, পিল্লাই? সে তো এখন আর পারালকোটে থাকেনা। নারানপুরের মোবাইল য়ুনিটে বদলি হয়ে এসেছে।

বলি : যাই হোক। নারানপুর তো পারলকোটের পথেই পড়বে। দেখা করে যাব।

: দেখা করে শুধু নয়; রাত্রিবাস করে। একদিনে তো আর অতটা পথ যাওয়া যাবে না। একরাত কোথাও হল্ট করতে হবেই।

: সে তো আরও ভাল।

যে কথা সেই কাজ। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় মৌলানা সাহেবের গাড়িতে হাজির হলাম নারানপুরে। ডাক্তার পিল্লাই তো আমাদের পেয়ে খুব খুশী। নারানপুর শহরের একান্তে তাঁবু খাটিয়েছেন। তাঁবুর সামনে একটা বেতের আরাম কেদারায় বসে তিনদিনের বাসী খবরের কাগজের টাটকা খবর পড়ছিলেন। কলকাতার কাগজ নারানপুরে পৌছাতে দিনতিনেক লাগে। পায়ে চপ্পল, খালি গা, পরিধানে লুঙ্গির মতো করে পরা পাট-ভাঙ্গা ধুতি। আমাদের দেখে উঠে এলেন অভ্যর্থনা করতে। চাকরজাতীয় একজন লোক খানকয় ক্যাম্পচেয়ার এনে পেতে দিল, ক্যাম্প টেবিলও। যাঁরা ক্যাম্পে থাকেন সরকার থেকে তাঁদের ফার্নিচার দেওয়া হয়। পিল্লাই সাহেব তাঁবুর প্রবেশদ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অন্দরমুখী হয়ে হাঁক পাড়েন : কই গো, তোমার দ্যাশের লোকরা সব এসেছেন যে!

সেই 'কই গো' ডাক আর 'দ্যাশের লোকে'র টান শুনে বুঝলাম ডাক্তার পিল্লাই শুধু বাঙ্গলা ভাষাটাকেই শেখেননি, উনি একেবারে বাঙ্গালী হয়ে

গেছেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন মিসেস পিল্লাই। সাদা খোল লালপাড় একখানা শাড়ি ড্রেস করে পরা। মাথায় সিঁদুর, হাতে শাঁখা—শুধু কানে যে জড়োয়া দুলটা পড়েছেন ওটা বোধকরি শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। সুন্দরীই বলা চলে। আঁচল ধরে পিছু পিছু এল একটি ফুটফুটে মেয়ে—বছর চারেক বয়স।

বললাম : আরে আরে এর কথা তো জানি না।

কোলে তুলে নিলাম বাচ্ছাটাকে : কি নাম তোমার ?

: খুকু।

মা বললেন : ছি, ভাল নাম বলতে হয়, বল……

মেয়েটি মুখ নীচু করে বললে : শরবরী পিললাই।

বললাম : এটা অন্যায় করেছেন ডাক্তার সাহেব। মেয়ে আপনার রঙ পায়নি, পেয়েছে মায়ের রঙ। বিয়ের বাজারে পাত্রপক্ষকে মিথ্যা আশঙ্কায় ভোগাবেন অহেতুক। শর্বরী ও নয়।

মৌলানা বলেন : ওদের যুগে বাপ-মায়ে বিয়ের ব্যবস্থা করবে না। আগে পরিচয়, তারপর প্রণয় এবং পরিশেষে পরিণয় !

মিসেস্ পিল্লাই বলেন : শর্বরী মানেই অমাবস্যা রাত্রি ধরে নিচ্ছেন কেন আপনি ? জ্যোৎস্নামুখরিত রাত্রিকেও তো শর্বরীই বলব।

আমি বললুম : তা হতে পারে। কিন্তু গোলাপ বললে যেমন ব্ল্যাকপ্রিন্স ব্যতিক্রমের কথা মনে পড়ে না, শর্বরী বললেও তেমনি মনে পড়ে না জ্যোৎস্নার কথা। না কি বলেন মৌলানা সাহেব ?

মৌলানা বলেন : হতে পারে। কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কি ? পাত্রপক্ষের কাছে সেটা হবে কন্‌জিউমার্স সারপ্লাস !

আমি আর রমানাথন এক সঙ্গে বলে উঠি : তার মানে ?

: তার মানে বোঝাতে গেলে আপনাদের ইকনমিক্স শেখাতে হয়। একজন এঞ্জিনিয়ার একজন ডাক্তার—অর্থশাস্ত্রের এ গূঢ় সূত্র বোঝাই কাকে ?

রমানাথন বলেন : শর্মিলাকে বোঝাতে পারেন—বি-এ'তে ওর ইকনমিক্স ছিল।

মৌলানা ব্যাখ্যা করেন : একটা বীজনেস্ ডীলে যখন কোন ক্রেতা কোন একটা কিছু পূর্বস্বীকৃত মূল্যে কিনতে রাজী হয়, এবং ট্রানজাক্‌শান শেষ হলে

যদি সে দেখে যে সে হিসাবের বাইরে বেশি কিছু পেয়েছে, তখন সেই অপ্রত্যাশিত মুনাফাটিকে বলি কনজিউমার্স´ সারপ্লাস। যে ছেলেটির বাবা শর্বরীর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করবে সে ছাঁদনাতলায় এসে দাঁড়াবে একটি কালো কনের প্রত্যাশায়। শুভদৃষ্টির সময় সে চমকে উঠবে! ঐ চমকটুকু হবে খুকুর বরের পক্ষে কনজিউমার্স´ সারপ্লাস!

সবাই হেসে ওঠে। মায় খুকুও!

আমি বললুম: তা যেন হল, কিন্তু নামটা দিয়েছে কে? মেয়ের বাবা না মা?

ডাক্তার পিল্লাই বলেন: দুজনেই।

: সে আবার কি?

: নয় কেন? একটা মানুষকে সৃষ্টি করতে যদি দুটি ব্যক্তিসত্তার প্রয়োজন হয়, তখন একটা নামকে দুজনে মিলে সৃষ্টি করবে এতে আবার অবাক হবার কি আছে?

বললুম: ওয়ার্ড-মেকিং খেলার মতো?

বললেন: প্রায় তাই। নামের কাঠামোটা আমিই তৈরি করেছি। শর্মিলা নিজের নামের মাথার রেফের মুকুটটা খুলে পরিয়েছে মেয়ের মাথায়।

শর্মিলা দেবী বলেন: উনি মেয়ের নাম রেখেছিলেন শবরী। ওঁর দণ্ডকারণ্যে চাকরির অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার যেদিন এল তার ক'দিন পরেই হল খুকুর অন্নপ্রাশন। দণ্ডকবনের এই নামটি পছন্দ করলেন উনি। আমার কিন্তু সে নাম পছন্দ হয়নি। আমি সেটাকে করেছি শর্বরী। ভাল করিনি?

ডাক্তার পিল্লাই বলেন: বেশ আপনিই বলুন। একটা দীর্ঘদিনের তর্কের মীমাংসা হক। আপনাকেই সালিশ মানছি। বলুন রেফ্ দেওয়াতে কি ভাল হয়েছে?

বিব্রত বোধ করি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই রায় শুনতে উন্মুখ।

বাঁচিয়ে দিলেন মৌলানা সাহেব: পয়েন্ট অফ রেফারেন্স ইজ্ নট সাবজেক্ট টু আর্বিট্রেশান!

: তার মানে?

: আহ্! একজন ডাক্তার একজন এঞ্জিনিয়ার। আইনের ধারা বোঝাই কাকে? ইণ্ডিয়ান আর্বিট্রেশান এ্যাক্ট অফ নাইন্টিন ফর্টি´ খুলে দেখবেন,

আর্বিট্রেটারকে কোন স্কোপ দেওয়া হয়নি একটি বিশেষ ক্ষেত্রে,—দাম্পত্য মতান্তরের ক্ষেত্রে। ল অফ কণ্ট্রাক্টের পথ ক্ষুরস্য ধারা—একচুল এদিক-ওদিক হবার যো নেই!

: তাহলে আমাদের তর্কের মীমাংসা?

: সেটা এ কোর্টের এক্তিয়ারের বাইরে। ও তর্কের মীমাংসা কোর্টের কাঠগড়ায় হয় না—ওর মিটমাট সম্ভব মশারি-ফেলা জনান্তিকে!

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো আমার।

খাওয়া দাওয়া মিটতে বেশ রাত হয়ে গেল। তারপর যে-যার তাঁবুতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। ডাকবাংলোতে একটি মাত্র সীট পাওয়া গেছে। মৌলানা সাহেবকে সেখানে চালান করা হল, যদিও পাকাবাড়ির চেয়ে তাঁবুই তাঁর বেশি পছন্দ। সেই ভাল। মৌলানা সাহেবের সঙ্গে রাত্রিবাস করতে হল না এটাই নগদ লাভ। মৌলানা খাফী খান সংযত-জিহ্ব ব্যক্তি। সকাল দশটা থেকে লাঞ্চ ইস্তক আবার দুটো থেকে পাচটা পর্যন্ত তাঁকে নাগাড় মিটিং অ্যাটেণ্ড করতে দেখেছি, নির্বাক, নিশ্চুপ। কেউ যদি মিটিং শেষে প্রশ্ন করে: কই স্যার, আপনি তো কোন কথাই বললেন না? মৌলানা নির্ঘাৎ প্রতিপ্রশ্ন করে বসবেন: কেন, তাতে বাগাড়ম্বরের কিছু কমতি হয়েছে? জিহ্বা জাগ্রত মৌলানার হুকুমে চলে বটে, কিন্তু নাসিকা নিদ্রিত মৌলানাকে চালায়। আর সেই আধিদৈবিক শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গে ঋক্ষ-নিনাদের সাদৃশ্য এত বেশি যে ভল্লুক-সমাকীর্ণ এ অরণ্যে সে বিভীষিকাকে উপেক্ষা করে পাশের খাটিয়ায় ঘুমাতে পারি—এত বড় বীর আমি নই। তাঁর সঙ্গে ডাকবাংলোয় ঘুমাতে যেতে হল না বলে আমি খুশি। যাক্ ঘুমটা তাহলে হবে।

কিন্তু নাসিকা-গর্জনের মতো নিদ্রাও কারও হাতধরা নয়। ঘুম এল না কিছুতেই। এ-পাশ ও-পাশ করতে থাকি প্রহরের পর প্রহর। ও-পাশের খাটিয়ায় ডাক্তার পিল্লাইও উশ্‌খুশ করেছেন মনে হল। ডাক্তার সাহেবের কম্পাউণ্ডারবাবু সদরে গেছেন কয়েকটা ওষুধের প্যাকিং কেস্ আনতে। কম্পাউণ্ডার গৃহিণী একা তাঁবুতে রাত্রিবাস করতে সাহসী হননি। তিনি আছেন পাশের তাঁবুতে মিসেস্ পিল্লায়ের সঙ্গে। সন্ধ্যা থেকেই অকালবর্ষণ শুরু হয়েছে। বৃষ্টিটা যদি তাড়াতাড়ি না থামে তাহলে পারলকোট যাবার পথ হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। টেণ্টের উপর একটানা বৃষ্টির শব্দ। গাছের ছায়ায়

টেণ্ট খাটানো। গাছের জল ঝরে পড়ছে। ব্যাঙ ডাকছে এক নাগাড়ে বাঙলা দেশের মতই। অকালবর্ষণে তাদের উল্লাসটা আর চেপে রাখতে পারছে না। লণ্ঠনটা কমানো আছে। ডবল-ফ্লাই তাঁবুর চন্দ্রাতপে চিমনির কালো একটা গোলাকৃতি ভূতুড়ে ছায়া। হাতঘড়িটা মাথার কাছে টেবিলে ছিল—দেখলাম রাত সাড়ে এগারটা।

ডাক্তার পিল্লাই বললেন: আপনারও ঘুম আসছে না বুঝি?

বললুম: কই আর আসছে? এমন একটা অদ্ভুত রাত কি ঘুমিয়ে কাটাবার?

ডাক্তারবাবু কপট বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন: সেকি? এমন রাত বুঝি জেগে কাটাতে হয়? কিন্তু কি ভাবে নিশি ভোর হবে রাতি জাগিয়া?

হেসে বললুম: সে কথা কি মুখে বলবার? বুঝ লোক যে জান সন্ধান!

ডাক্তারবাবুও হেসে বললেন: তা বটে! কিন্তু এ অরণ্যে উপযুক্ত অনুপান জোগান দিই কেমন করে বলুন?

বলি: শাস্ত্র বলেছেন, ক্ষেত্র বিশেষে মধু-র অভাবে গুড়ও চলতে পারে। অভাবপক্ষে নিদেন প্রেমের গল্পই শোনান বরং একটা—

কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঠে বসেন: বলেন কি মশাই? আমি শোনাব প্রেমের গল্প? আমি? নারানপুরের মোবাইল ডাক্তার পিল্লাই? এ তল্লাটে ও বস্তু পাবেন কোথায়? একি আপনাদের কলকেতা শহর? অলিতে গলিতে, এ বাড়ির রোয়াকে ও-বাড়ির জানালায় প্রেমের ফাঁস জড়ানো!

: বেশ, একটা ভূতের গল্পই শোনান তাহলে। এ অরণ্য প্রেমের পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা হলেও ভূতের পক্ষে নয় নিশ্চয়। প্রেম বিচিত্রগতি, কিন্তু ভূতের গতি সর্বত্র। শাস্ত্র যদিচ বলেন নি, তবু নলেনগুড়ের বদলে ক্ষেত্রবিশেষে না হয় ভেলিগুড়ই চলুক। এমন ঘনঘোর বর্ষণরাত্রে ভূতের গল্পও মন্দ জমবে না।

ডাক্তার সাহেব বলেন: আমাদের শাস্ত্র কিন্তু অন্য কথা বলে।

: কি বলে?

: বলে, আপনাকে দু চামচ অ্যাকোয়া টাইকটিস্ খাওয়াতে। মুর্গীটা হজম হয়নি আপনার।

আমি বললাম : শেষরক্ষার গদাইও মনে হচ্ছে প্রেমরোগের এবম্বিধ একটা প্রেসক্রুপশন বাতলেছিল।

পিল্লাই বলেন : স্বাভাবিক। গদাইও ছিল চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র। হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থান যে ঠিক পাকযন্ত্রের উপরেই, এ তত্ত্বটা আপনাদের মত কবিরা না মানলেও আমাদের মত কবিরাজরা মেনে থাকে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু গল্পই শোনাতে হল ওঁকে! আমি জানতাম এ ভদ্রলোক দীর্ঘদিন এই মাড়িয়া-মুরিয়াদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে চিকিৎসা করেছেন। দরদী লোক। ওঁর ঝুলি ঝাড়লে নিশ্চয় কিছু রসদের সন্ধান পাওয়া যাবে। উনিও জানতেন শুধু স্থপতিবিদ্যার প্রয়োগ করতেই আমি এ অরণ্যে আসিনি—এসেছি এ অরণ্যপর্বতের পথে-প্রান্তরে কিছু মণিমুক্তোর সন্ধানে। ফলে ডাক্তার-বাবুকে শোনাতে হল ওঁর অভিজ্ঞতা থেকে একটি বাস্তব গল্প। তবে উনি প্রথমেই একটা রফা করে নিলেন। ভূত নয়, যে গল্প উনি শোনাবেন সেটা পেত্নীর। আমি তাতেই রাজি।

জানি নারানপুরের সেই বর্ষণমুখর রাত্রে টেণ্টের নীচে আধ-অন্ধকারে যে গল্পটি শুনেছিলাম সেটি হুবহু শোনাবার ক্ষমতা আমার নেই। সে গল্পের পূর্ণ রসাস্বাদন করতে হলে আপনাদের কষ্ট করে যেতে হবে সেই বিরলবসতি অরণ্যের একান্তে—মহুয়াগাছতলার সেই ডবল্-ফ্লাই তাঁবুর আশ্রয়ে। বেছে নিতে হবে ঝড়ো-হাওয়ার ক্ষ্যাপামিতে বিধ্বস্ত তেমনি একটি ধারাক্লান্ত রাত্রি, খুঁজে নিতে হবে ডাক্তার পিল্লাইয়ের মত একজন দরদী কথক, যিনি গোণ্ডি আর হাল্‌বি শব্দের সুচয়িত প্রয়োগে এ গল্পের একটা মেজাজ আপনিই গড়ে তুলতে পারেন।

আর একটা কথা। রসিকতা করে রমানাথন বলেছিলেন তিনি পেত্নীর গল্প শোনাচ্ছেন। আসলে কিন্তু এটি একটি প্রেমেরই গল্প। বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে ওঠা নারী-পুরুষের বিচিত্রতম হৃদয়বৃত্তি। ওদের পূর্বরাগের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ ঘটুলের অদ্ভুত আইন-কানুনের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ঘটুলঘরের আধো-অন্ধকারে প্রেম-বিরহ, ঈর্ষা-আত্মত্যাগের অদ্ভুত ইতিকথা। আমাদের অতিপরিচিত ড্রইং-রুম-পূর্বরাগের মার্জিত-রুচি সে কাহিনীতে আশা করা অন্যায়, কিন্তু তাতে আদিম হৃদয়াবেগের অভাব দেখিনি। ডাক্তারবাবুর নায়ক হয়তো সংস্কৃত-কাব্যের নায়কের সংজ্ঞা মেনে চলেনি, দুটি নায়িকা প্রেম-নাটকের

আইন-কানুন অমান্য করে বিচিত্র পথে আনাগোনা করেছে নায়কের চরিত্রটি ঘিরে, তবু এক অখ্যাত পল্লীর তিনটি অজ্ঞাত চরিত্র যেন মূর্ত হয়ে উঠল আমার চোখের সামনে। অন্তত সেদিন তাই মনে হয়েছিল আমার।

আজ ভুলটা বুঝতে পারি। ডাক্তারবাবুর গল্পের নায়ক সেই সুদর্শন মুরিয়া তরুণটি নয়। এ কাহিনীর নায়ককে সেদিন চিনতে পারিনি। আজ পারি। এ কাহিনীর নায়ক স্বয়ং ডাক্তার রমানাথন পিল্লাই! সভ্যজগত থেকে বহু দূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে এ নাটকের মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন একজন সভ্যজগতের প্রতিনিধিই। জীবনের প্রতিষ্ঠা, ব্রিলিয়াণ্ট কেরিয়ার, বৈজ্ঞানিক জগতের মৌলিক গবেষণার সম্ভাবনাকে ভাসিয়ে দিয়ে এ গল্পের নায়ক নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন একটি মুরিয়ার প্রেমে অন্ধ হয়ে। সে কথা সেদিন ডাক্তার পিল্লাই গোপন করতে চেয়েছিলেন। আজ তিনি ধরা পড়ে গেছেন আমার কাছে!

গল্প শুনতে শুনতে শেষ হয়ে এল রাত। ক্রমে ভোরের আলো ফুটে উঠল পূব আকাশে। তবু শেষ হল না গল্প। ডাক্তারবাবুর জবানিতেই গল্পটি বলার চেষ্টা করছি ঃ

প্রায় মাস দুয়েক আগের কথা। সবে বদলি হয়ে এসেছি নারানপুরে। সেদিন ডিস্‌পেন্সারীতে বসে একটি রোগীকে ড্রেস করে দিচ্ছি, হঠাৎ বাইরে কেমন একটা সোরগোল উঠল। সকাল বেলা। রোগীর ভিড় বেশ আছে। ওরা সচরাচর বাইরের গাছতলায় গোল হয়ে বসে থাকে। কম্পাউণ্ডার বিনোদবাবু এক-একটি রোগীকে ভিতরে ঢোকার ছাড়পত্র দেয়। একে একে ওরা আসে, রোগের বর্ণনা দেয়। আমি পরীক্ষা করি, প্রেস্‌ক্রিপশান লিখে দিই। পাশের ঘর থেকে ওষুধ নিয়ে ওরা চলে যায়। চেঁচামেচি সোরগোল ওদের ধাতে নেই। আগে দেখাবার জন্যে, আগে ওষুধ নেবার জন্যে কোন হুড়োহুড়ি নেই। তাই সোরগোলটা শুনে এগিয়ে গেলাম জানালার কাছে। দেখলাম বাইরে বেশ একটা জনতা। সবাই মুরিয়া গোণ্ড। আর জনতার কেন্দ্রস্থলে দেখলাম দুজন জোয়ান মানুষ শক্ত করে ধরে রেখেছে একটি ছেলের দুই বাহু। একনজর দেখেই কিন্তু মোহিত হয়ে গেলাম আমি। ছেলেটির বয়স বছর-কুড়ি হতে পারে। খালি গা, মালকোঁচা-সাঁটা ফর্সা একটা ধুতি। গলায় একসার লাল-সাদা-নীল পুঁথির মালা। পাগড়িতেও একছড়া পুঁথির মালা,

তার উপর ময়ূরের একটা পালক। দু হাতে দুটি ভারি দস্তার বালা। কিন্তু সাজপোশাকের চেয়ে মানুষটাই মনকে আকৃষ্ট করে বেশি। আপনার তো স্কেচ আঁকার বাতিক আছে, আমি নিশ্চিত বলতে পারি, ওকে দেখলে আপনি রাজ্যের কাজ ফেলে রঙ-তুলি নিয়ে বসবেন। প্রশস্ত বক্ষকপাট, পেশল বাহুসন্ধি, ক্ষীণ কটি। অপ্রচুর বস্ত্রের প্রান্ত থেকে বের হয়ে এসেছে মাংসল দুটি জঙ্ঘা—পৌরষের মূর্তপ্রতীক যেন সে। মনে হল, মানুষ নয়—গ্রানাইটে-গড়া অ্যাপোলোর একটি মর্মর মূর্তি চাইনিজ্ ইংকের চৌবাচ্চায় চুবিয়ে কেউ এনে খাড়া করেছে আমার সামনে!

ফিরে এলাম জানালা থেকে। আমাকে জানালার ধারে উঠে যেতে দেখেই ওদের সোরগোলটা থেমে গিয়েছিল। কম্পাউণ্ডারকে বললাম: ব্যাপার কি? ওকে এভাবে ধরে এনেছে কেন?

বিনোদ বললে: কি জানি কেন। বোধহয় অপরের শুয়োর জোর করে কেটে খেয়েছে। তাই আপনার কাছে ধরে এনেছে বিচারের আশায়।

বিরক্ত হয়ে বললুম: চুরি-চামারি করে থাকে তাহলে আমার কাছে কেন? থানায় যেতে বল। দেখ তো ব্যাপারটা কি।

একটু পরেই ফিরে এল কম্পাউণ্ডার। চোর নয়, ছেলেটি পাগল। চিকিৎসা করাতে এনেছে। পাগল? বিধাতার এমন একটি আশ্চর্য সৃষ্টি একটিমাত্র শব্দে এমনভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল?

দুজনে দুদিক থেকে ধরে ওকে নিয়ে এল আমার কাছে। বন্দী বীরের মতই মাথা উঁচু করে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। যেন চন্দ্রগুপ্তকে ধরে আনা হয়েছে সেকেন্দারের তাঁবুতে। আমার দিকে চাইল না কিন্তু। দৃষ্টি তার আমার খোলা জানালা দিয়ে চলে গেছে বহু দূরে—রুক্ষ পাহাড়ে দৃশ্যপটের ওপারে পাণ্ডুর দিগন্তে—ধূসর আকাশে যেখানে পাক খাচ্ছে কি একটা নাম-না-জানা পাখি। কপালে জেগেছে কুঞ্চন। যেন পরিস্থিতিটা ঠিকমতো বরদাস্ত হচ্ছে না ওর। হঠাৎ আমার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ল একটা বুড়ি। ছেলেটার মা। বললে: তোকে জোড়া শুয়োর দেব। তুই ভাল করে দে আমার চয়নকে।

: চয়ন!—চম্‌কে উঠি আমি।

: হ্যাঁ চয়ন। নয়ন শিরদার। মুরিয়া সন্তান। কাবোঙ্গা গাঁয়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল ছেলে।—বললেন ডাক্তারবাবু!

আমি চুপ করে গেলাম। গল্পের এ অংশে বাধা দিলাম না। বললাম না, ছেলেটিকে আমি ভাল করেই চিনি। কিন্তু আমার মনের পর্দায় ফ্লাশব্যাকে ভেসে উঠল কয়েকটা ছবি। সিনেমায় মণ্টাজ এফেক্টে যেমন দেখা যায়। গীতাঞ্জলি হাতে চয়ন, বাদল-ধারার গানে বিহ্বল চয়ন, রঙিলার বিদ্রূপে বিপর্যস্ত চয়ন—আর তালাওয়ের ধারে সাবুগাছতলায় বসে-থাকা উপেক্ষিত নিঃসঙ্গ নায়ক চয়ন শিরদার!

ডাক্তারবাবু আমার সে ভাবান্তর লক্ষ্য করেন নি। আপন মনে তিনি গল্পের জাল বুনে চলেন: হাঁ হাঁ করে ছুটে এল সবাই। ধরে তুলল বুড়িকে। জোড়া শুয়োরের লোভে নয় নিজের গরজেই খুঁটিয়ে শুনলাম কেসহিস্ট্রিটা। চয়ন হচ্ছে কাবোঙ্গা ঘটুলের মধ্যমণি। কী তীর ছোঁড়া, কী শিকার—কী নাচগান হৈ-হল্লা, সেই ছিল কাবোঙ্গার প্রাণ। গাঁয়ের ছেলেমেয়ের দল ওকেই করেছিল ঘটুলের শিরদার, অর্থাৎ প্রধান দলপতি। কোন চেলিক অন্যায় করলে চয়ন তার বিচার করে শাস্তির ব্যবস্থা করত। কোন মোটিয়ারী অন্যায় করলে শাস্তি দিত। সকলে মাথা পেতে মেনে নিত সে আদেশ। ওদের গাঁয়ের ঘটুলে শিরদার ছিল বটে, কিন্তু বেলোসা ছিল না। অর্থাৎ রাজ্যে রাজা আছে, রানী নেই। বস্তুত চয়নের পাশে দাঁড়াবার মত উপযুক্ত মেয়েই ছিল না কাবোঙ্গায়। তা ছাড়া চয়ন ছিল মেয়েদের বিষয়ে জন্ম-উদাসীন। মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার অবকাশই সে পায়নি কোনদিন। ঘটুলের সব ব্যবস্থাপনা তাকে করতে হয়, সেই দলপতি। তারই নির্দেশে ছেলেরা মাঠে ধান রুইতে যায়, কাঠ কাটতে ছোটে; মেয়েরা ধান ভাঙে, গান গায়, ঘর নিকায়, ঘটুলের প্রাঙ্গণ মার্জনা করে। ধনুক, তীর, টাঙ্গি আর নারানপুরের হাট থেকে কেনা একটা বাঁশের বাঁশীতেই ছিল ওর প্রাণ। কিন্তু চয়ন উদাসীন হলে কি হবে—কাবোঙ্গা গাঁয়ের উদ্ভিন্ন-যৌবনা মোটিয়ারীর দল তো আর অন্ধ নয়। তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ওর কাণ্ড, কানাকানি করে। শিকারের সময় তীরবিদ্ধ হরিণের উপর যখন ঝাঁপ দিয়ে পড়ে শিকারী চেলিকের দল তখন দেখা যায় চয়নের কড়ি-বাঁধা তীরটাই বিঁধে আছে তার বক্ষদেশে। যখন ওরা শিকারের পিছনে দলবেঁধে ছোটে তখন সকলের নাগাল ছাড়িয়ে সবার আগে ছুটত চয়ন,

তার বাঁশপাতার মত লঘুছন্দ হাল্‌কা দেহখানি নিয়ে। আবার জ্যোৎস্নারাত্রে ঘটুল-প্রাঙ্গণে যখন সুরেলা-ছন্দের মোহ-বিস্তার করে তালে তালে নাচতে থাকে চেলিক-মোটিয়ারীর দল তখন চয়ন হয়ত বেরিয়ে পড়ে একা। শাল-মহুয়ার বনভূমির ভিতর থেকে ছোপধরা জ্যোৎস্নার টুক্‌রোর মত ভেসে আসে বাঁশীর আর্ত কান্না। থেমে যায় ঘটুলের বিড়িয়াঢোল সে সুরের মূর্ছনায়, তাল কাটে মোটিয়ারীদের নূপুর-নন্দিত চরণ!

তবু ওরা কোনদিন চয়নের নাগাল পায় নি। কোন মেয়েকেই ওরা বেলোসা করতে সাহসী হয় নি। বরং বলা যায় কোন মেয়েই বেলোসা হতে স্বীকৃত হয় নি। ঘটুলের নিয়ম অনুযায়ী চয়নকে শুতে হত তিনদিন অন্তর নতুন মোটিয়ারীকে নিয়ে। নিরন্ধ্র অন্ধকারের সুযোগে আর সবাই যখন যৌব-রাজ্যের তোরণদ্বারের চাবি খুঁজতে ব্যস্ত, চয়ন তখন তার কণ্ঠলগ্না মোটিয়ারীর মাথায় হাত বুলাত ধীরে ধীরে। কাবোঙ্গা গাঁয়ের মেয়েরা জানত শিরদার হচ্ছে ওদের সকলের বড়ভাই—বড়দাদা। তাই সে স্পর্শের মধ্যে তারা খুঁজে পেত প্রীতির একটা ব্যঞ্জনা, স্নেহের একটা আর্তি—তার বেশীকিছু নয়। মোটিয়ারীর দল নিজেদের মধ্যে কানাকানি করত—চয়ন এমন আলাদা জাতের কেন, এমন খাপছাড়া কেন? চয়ন যে রাত্রে যাকে নিয়ে শোয় তার পরদিন তাকে সহস্র প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রশ্ন হাজার রকমের হতে পারে—জবাব হত একই। চয়নের ব্যবহারে, তার স্পর্শে বড়ভাইয়ের স্নেহপ্রীতির বেশী আর কিছু পায় নি কেউ। শেষে ওদের কৌতূহলেরও অবসান হল ক্রমে। ওরা মেনে নিয়েছিল শিরদারের তথাকথিত যৌবন কোনদিনই আসবে না। বুঝে নিয়েছিল, দেব বড়াপেন চয়নের সুগঠিত তনুর স্তরে স্তরে যৌবনের উপাদান এত ঢেলেছেন যে মন তৈরী করবার সময় আর কিছু বাকি ছিল না তাঁর ঝোলায়! চয়নকে ওরা সম্মানের এমন একটি উচ্চ-সিংহাসনে বসিয়েছিল যে এই সহজ সরল প্রশ্নটা তাকে করতে কেউ ভরসা পায় নি—এমন কি ওর সমবয়সী বন্ধু কোতোয়ার পর্যন্ত নয়। কাবোঙ্গা ঘটুল মেনে নিয়েছিল চয়ন একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যতিক্রম, ছন্নছাড়া উদ্‌ভুটে জীব।

একটু দম নিয়ে ডাক্তারবাবু ফের শুরু করেন:

এ তো গেল পটভূমি। রোগের ইতিহাসটা শুনলাম ক্রমে। গত বছর ফাগুন মাসের কথা। কারাংমেটা থেকে ওরা দলবেঁধে গিয়েছিল কাবোঙ্গা

ঘটুলে। চৈত-দাণ্ডার উৎসবে। এমন উৎসবরাত্রে সবাই একটু বাঁধন-ছেঁড়া হয়ে পড়ে। সচরাচর সঙ্গী বদল হয়। দু-পক্ষই একটু মুখ বদলাবার সুযোগ খোঁজে। আগন্তুক চেলিকদল বেছে নেয় স্থানীয় মোটিয়ারীদের; আগন্তুক মোটিয়ারীর দল ধরা দেয় স্থানীয় চেলিকের বাহুবন্ধনে। সে রাত্রেও নিয়ম-

চয়ন শিরদার

মতো সবই হল। গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলল খেলা-ধাঁধা-নাচ-গান। তারপর ঘটুলঘরের অন্ধকারে মহুয়ার নেশায় মাতোয়ারা ছেলেমেয়ের দল কে কার মাসানিতে রাত কাটালো কে তার হিসাব রাখে? কী যে ঘটল সে রাত্রে কেউ তা জানে না। শুধু পরদিন সকালে দেখা গেল চয়নের চোখে লেগেছে যৌবনের মোহাঞ্জন। ধ্যান ভেঙেছে নিঃসঙ্গ নায়কের। চয়নের মন অবশেষে বাঁধা পড়ল কারাংমেটার একটি মেয়ের আঁচলে।

চয়নের বাপ-মা খুশি হল এতে। কারাংমেটার গাইতা আয়েতু-গোও হচ্ছে চয়নদের পাল্‌টি-ঘর। আকোমামা শ্রেণীর। বিবাহে বাধা নাই কিছু। স্থির হল চয়ন আয়েতুর বাড়িতে লামহাদা খাটতে যাবে।

আমি বাধা দিয়ে বলি : 'লামহাদা' বস্তুটা কি ?

: ও, আপনি তাও জানেন না বুঝি। মুরিয়াদের মধ্যে কয়েক রকমের বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। একই ঘটুলের ছেলেমেয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে। আবার যে-কোন ছেলে অন্য কোন ঘটুল থেকেও পাত্র সংগ্রহ্ করে আনতে পারে। শুধু দেখতে হবে কনে যেন বরের 'দাদাভাই' গোত্রের না হয়। আকোমামা হলেই হল। কোন কোন ক্ষেত্রে বরের বাপ হয়তো প্রতি-শ্রুত 'বার্না' বা কন্যাপণ দিয়ে উঠতে পারে না। ছ-মাস, একবছর, দুবছর পাত্রকে সে-ক্ষেত্রে হবু শ্বশুর-বাড়িতে থাকতে হয়—মজুর হিসাবে খাটতে হয় হবু-শ্বশুরের ক্ষেতে। দুই-তিন বছর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বার্না শোধ দিতে হয়। তখন বাজে মান্দ্রি ঢোল, ধুশীর আর কেকরেং। চেলিক-মোটিয়ারীদের ডাক পড়ে। বিয়ের বসে বর-কনে। এই জাতীয় হবু-জামাইকে বলে 'লামহাদা'। খাওয়া-পরা ছাড়া লামহাদা হবু-শ্বশুরের কাছে আর যদি কিছু প্রত্যাশা করে তা হচ্ছে কোন ভবিষ্যৎ-দিনে তার কন্যাটিকে। কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে আর কোন মজুরী সে পায় না। তবে হ্যাঁ, যদি লামহাদা খাটতে খাটতে হঠাৎ খবর পায় পাত্রী অপর কারও সাথে ভেগে পড়েছে তখন সে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে। পাত্র যদি ভিনগাঁ থেকে লামহাদা খাটতে আসে, তখন তাকে এ গাঁয়ের ঘটুলের সভ্য করে নেওয়া হয়। প্রাক্তন ঘটুলের পদমর্যাদা অনুযায়ী এখানেও কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে তাকে অভিষিক্ত করে নেওয়া হয়। রাত্রে লামহাদা ঘটুলেই নিদ্রা যায়, আর পাঁচটা অবিবাহিত চেলিকের মতো। ঘটুলের অন্যান্য চেলিকের সঙ্গে তার অধিকারগত প্রভেদ কিছু নেই—একটিমাত্র বিষয় ছাড়া। সে ঘটুল যদি জোড়িদার ঘটুল হয় তাহলে সে একটি মোটিয়ারীর সঙ্গে স্থায়ীভাবে জোড় বাঁধে—যতদিন না তার বিয়ে হয়। প্রশ্ন হতে পারে ভাবী বধূও যখন সেই একই ঘটুলের মোটিয়ারী তখন লামহাদা তো তাকেও শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে পেতে পারে। এখানেই মজা! তা সে পারে না। অন্যান্য চেলিকের থেকে এইটুকুই তার অধিকারগত পার্থক্য। ভাবী বধূ তার লামহাদার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারে না।

লামহাদা যেন হবু-বউয়ের ভাশুরঠাকুর। লামহাদার সঙ্গে তার ভাবী বধূর কোন গোপন সম্পর্ক যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। অবাধ কোর্টশীপের রাজ্য ঘটুলঘরে একটিমাত্র নিষেধের বেড়া আছে। —'এনগেজমেণ্ট' ঘোষিত হবার পর আর ওটি চল্‌বে না! অথচ একই ঘটুল-ঘরে ভাবী বধূ হয়তো অন্য কোন চেলিকের বাহুবন্ধনে রাত্রিযাপন করে লামহাদার মাতুর থেকে কয়েক হাত দূরে।*

চয়ন এল কারাংমেটা গাঁয়ে আয়েতুগোণ্ডের বাড়ি লামহাদা খাটতে। এমনিতেই চয়ন ছিল অত্যন্ত কর্মঠ, বুদ্ধিমান আর পরিশ্রমী। তার উপর

* এইখানে ডাক্তার পিল্লাইয়ের সঙ্গে আমার কিছু কথোপকথন হয়েছিল যা গল্পের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হলেও কৌতূহলী পাঠকের খাতিরে তা লিপিবদ্ধ করলাম:

আমি বললুম: আচ্ছা ঘটুলের খেলাঘরে যারা বরকনে সাজে তাদের মধ্যেই কি বেশী বিয়ে হয়?

ডাক্তার সাহেব বললেন: এ সম্বন্ধে, যতদূর জানি, সাম্প্রতিককালে কোন গবেষণা হয়নি। তবে দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন সাগরপারের কোন কোন মানুষ এদের মধ্যে খোঁজখবর নিয়েছিলেন। ভেরিয়ার এলুইন সাহেবের একটা পরিসংখ্যান আছে এ বিষয়ে। তিনি দুই হাজারটি মুরিয়া বিয়ের সংবাদ সংগ্রহ করে যে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন সেটাই একমাত্র রেকর্ড।

কৌতূহল প্রবল। বললুম: কাল সকালে সেটা খুঁজে বার করবেন তো, দেখব।

: মনে আছে আমার। খুঁজতে হবে না। শুনুন। দুই হাজারটি বিয়ের হিসাব হল:

বাপ-মায়ের ব্যবস্থাপনায় তাঁদের নির্বাচিত পাত্রীকে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বিয়ে করেছে ... ১৮৮৪ জন অর্থাৎ ৯৪·২০%

বাপ-মায়ের অনুমতি ব্যতিরেকে অস্বাভাবিক বিয়ে ... ১১৬ জন অর্থাৎ ৫·৮০%

এই একশ ষোলটি অস্বাভাবিক বিয়ের হিসাব:

ঘটুল-সঙ্গিনীকে ভালবেসে পরে অনুমতি নিয়ে ... ... ৭৭টি

ঘটুল-সঙ্গিনী গর্ভবতী হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে ... ... ২৬টি

ঘটুল-সঙ্গিনীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে ... ... ১৩টি

একুনে ১১৬টি

আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক ডাক্তার, আদিবাসী-উন্নয়ন-অফিসার নন। তাহলে এভাবে এত সংখ্যাতত্ত্ব মুখস্ত রেখেছেন কেমন করে? সে কথা না বলে শুধু বললুম: কিন্তু এর মধ্যে আমার প্রশ্নের জবাব কোথায়? আমি জানতে চাইছি ওরা ঘটুল সঙ্গিনাকে বেশী বিয়ে করে, না বাইরের কোন মেয়েকে।

শ্বশুরের কাছ থেকে আশু অনুমতি পাবার আশায় সে প্রাণ দিয়ে খাটতে শুরু করে আয়েতুর খামারে। আয়েতু গাঁয়ের সর্দার। বয়স হয়েছে। ছেলে নেই। সংসারে আছে বউ আখালী, বুড়ি পিসিমা কিরিংগো, আর দুই মেয়ে। ফুলের মতো নিষ্পাপ সুন্দরী মাল্‌কো আর আগুনের মতো উজ্জ্বল রূপসী রঙিলা! রঙিলা বড় বোন।

আমি বললুম: কার জন্যে লামহাদা খাটতে এল চয়ন?

ডাক্তারবাবু আমার প্রশ্নটা কানেই তুললেন না। আপনমনে বলে চলেন: বছরখানেক লামহাদা খাটবার পরে যেদিন আয়েতু রাজি হল কন্যা সম্প্রদানে সেদিনই ঘটল দুর্ঘটনাটা। অবশ্য ঘটনা যে কি ঘটেছিল তা ওরা কেউ ঠিক-মতো বলতে পারলে না। তবে ঐদিনই যে কিছু একটা ঘটেছিল এ কথা নিশ্চিত। কারণ পরদিন থেকেই চয়নের ভাবান্তর দেখা গেল। অল্প কিছু-দিনের মধ্যেই পাগলামির প্রচ্ছন্ন লক্ষণ প্রকট হল। আয়েতু খবর পাঠাল কাবোঙ্গায়। চয়নের বাপ কোঙা এল ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তারপর থেকে সে কাবোঙ্গাতেই আছে। এখন সে বদ্ধ পাগল।

: বলতে দিন মশাই সবটা—ধমক দিয়ে ওঠেন ডাক্তারসাহেব। ভেরিয়ার সাহেবের পরীক্ষিত দুই হাজারটি বিয়ের মধ্যে একই ঘটুলের চেলিক-মোটিয়ারীর বিয়ে আছে মাত্র ৭৬৫টি; আর অপর ঘটুল থেকে অজানা পাত্রীকে সংগ্রহ করে এনেছে বাকি ১২৩৫ জন চেলিক! তার মধ্যে ১১৩টি ছিল 'লামহাদা' বিয়ে।

আমি বললুম: আশ্চর্য তো। এমন রোমান্টিক নাইট-ক্লাবে তো এরকমটি হওয়ার কথা নয়।

ডাক্তারবাবু বললেন: আমার তো মনে হয় এইটাই স্বাভাবিক। একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত ছেলেমেয়েরা যেমন একই সঙ্গে বেড়ে ওঠার সময় পরস্পরের প্রতি ততটা যৌন আকর্ষণ অনুভব করে না—এদেরও অবস্থা তেমনি।

আমি বললুম: আচ্ছা বিবাহের ফলাফলের কোন পরিসংখ্যান আছে?

উনি বলেন: ঠিক কি জানতে চাইছেন বলুন।

: আমি জানতে চাইছি এদের মধ্যে সুখী দম্পতি বেশী আছে কোন দলে? দু হাজার বিয়ের মধ্যে মাত্র ১১৬টি হচ্ছে লাভ-ম্যারেজ। কোন দলে কজন সুখী হয়েছে?

ডাক্তারসাহেব হেসে বলেন: আমি যদি প্রতিপ্রশ্ন করি—সুখী দম্পতির সংজ্ঞা কি? আপনাদের সহস্রাব্দীর সংস্কৃতির উপর গড়ে-ওঠা সমাজ দম্পতির সুখের কোন মানদণ্ড আবিষ্কার করতে পেরেছে কি?

পাগলামির লক্ষণগুলি জিজ্ঞাসা করে ডাক্তারবাবু জানতে পারেন চয়ন নাকি কারও সঙ্গে কথা বলে না। খায় না, ঘুমায় না। সারাদিন শুধু পায়চারি করে আর বিড়বিড় করে বকে আপন মনে। হাতে পায়ের গাঁটে গাঁটে ওর বেদনা বোধ হয়। কেউ জোর করে খাওয়াতে এলে তাকে আঁচড়ে কামড়ে দেয়। কদিন হল পাগলামির মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় ওকে নাকি বেঁধে রাখতে হয়েছিল।

যে ভাষায় ওরা কথা বলছিল সেই গোণ্ডিই হচ্ছে চয়নের মাতৃভাষা। ডাক্তারসাহেব কেস্ হিস্ট্রিটা শুনছিলেন কান দিয়ে, কিন্তু তাঁর নজর ছিল চয়নের উপর। আশ্চর্য, সে যেন বধির। এ কাহিনীর বিন্দুমাত্র যে তার বোধগম্য হয়েছিল তা মনে হয় নি ডাক্তারবাবুর—ওর ভাবলেশহীন মূর্তি দেখে। দু একটা প্রশ্ন করেছিলেন তিনি। চয়ন নির্বাক। সে যে ডাক্তারবাবুর প্রশ্নগুলি শুনেছে, তার অর্থ বুঝেছে তাও মনে হয় নি। শুধু মূক নয়, সে যেন বধিরও। জানালা দিয়ে তাপদগ্ধ দিগন্তের পাণ্ডুর ধূসরতার দিকে নিষ্প্রাণ দুটি চোখ মেলে দাঁড়িয়েছিল চয়ন—যেন এক পাথরের মূর্তি।

ডাক্তারবাবু ওর বাঁধন খুলে দিতে বললেন। ওরা প্রথমটা রাজি হয়নি। শেষে ডাক্তারবাবুর পীড়াপীড়িতে চয়নের বাঁধনটা ওরা খুলে দিল। ভয়ত্রস্ত-দৃষ্টিতে জনতা লক্ষ্য করতে থাকে চয়ন এবার কি করে! কিছুই করল না চয়ন—উবু হয়ে বসল সে, মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি। কিন্তু বাঁধন খুলে দেবার সময় সে একবার ডাক্তারবাবুর দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়েছিল। ক্ষণিকের দৃষ্টি।

কোণঠাসা হয়ে বলি: সুখের না হলেও অসুখের একটা মাককাঠি আছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ দাম্পত্য থার্মোমিটারের নিম্ন-সীমান্ত, ফ্রিজিং পয়েণ্ট।

ডাক্তারবাবু বলেন: তাহলে অবশ্য একটা হিসাব দাখিল করতে পারি। পিতৃ-আদেশে যে ১৮৮৪ জন বিয়ে করেছিল তাদের মধ্যে ৪৯ জন পরে বিবাহ-বিচ্ছেদের শরণাপন্ন হয়, অর্থাৎ ২·৬ জন। অপরপক্ষে যারা নিজে পছন্দ করে বা ভালবেসে বিয়ে করেছিল সেই ১১৬ জনের মধ্যে ১০ জন বিচ্ছেদ চায়; অর্থাৎ ৮·৬ শতাংশ। সুতরাং বিবাহ-বিচ্ছেদকেই যদি দাম্পত্য-উত্তাপের ফ্রিজিং-পয়েণ্ট বলেন, তাহলে আমি বলব...

আমি বাধা দিয়ে বলি: বুঝলাম! এবার পরিসংখ্যান ছেড়ে গল্পটা বলুন। চয়ন এল কারাংমেটায় লামহাদা খাটতে। তারপরে?

ডাক্তারবাবু আমার কাছে সে দৃষ্টির বিশ্লেষণ করে বললেন : বিদ্যুত চমকের মতো আমার মনে হল—চয়ন কখনও সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যায়নি। ওর চোখে আমি কৃতজ্ঞতার একটা আভাস দেখেছি। ও বুঝতে পেরেছে—আমার আদেশেই ওর বাঁধনটা খুলে দেওয়া হল। তাই ওর সেই চকিত দৃষ্টির কৃতজ্ঞতা। তাই যদি হবে—তাহলে সে উন্মাদ কখনই নয়!

ওদের সকলকে ঘর থেকে বিদায় করে ডাক্তারবাবু জনান্তিকে দাঁড়িয়েছিলেন চয়নের মুখোমুখি। প্রশ্ন করেছিলেন : চয়ন! তোমার কি হয়েছে?

পূর্ণদৃষ্টিতে চয়ন একবার তাকায় ওঁর দিকে। পরমুহূর্তেই নত হয় তার দৃষ্টি। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন : ওরা বলছে তুমি পাগল। আমার বিশ্বাস ওরা ভুল বলছে, নয়?

জবাব নেই। চয়ন নিষ্প্রাণ পাথরের মতোই ভাবলেশহীন।

: ওরা তোমাকে কষ্ট দেয়, বেঁধে রাখে, তাই নয়? ওরা তোমার মনের কথা বুঝতে পারে না, আমি জানি। আমাকে বলবে সব কথা?

চয়ন এবারও নিরুত্তর।

: ওরা মিছামিছি তোমাকে ভয় পায়। আমি তো তোমাকে ভয় পাই না। আমি তো তোমাকে পাগল মনে করি না। তুমি আমাকে বল তোমার কি কষ্ট, তুমি কি চাও—আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আবার আগের মতো হয়ে যাবে তুমি। বলবে আমাকে সব কথা?

আবার চোখ তুলে তাকাল চয়ন। ডাক্তারবাবুর মনে হল ওর চোখের তারায় একটা প্রত্যাশা যেন কাঁপছে, ঝোড়ো হাওয়ায় বাঁশপাতার মতো। ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বরে সে যেন শুনতে পেয়েছে সুস্থ-সবল প্রাণময় পৃথিবীর আহ্বান, যে আহ্বানে সাড়া দিয়ে যৌবন-উচ্ছল ঐ অরণ্যচারী মানুষটা তারুণ্যের দুর্বার প্রেরণায় ছুটে বেড়াতো বন থেকে বনান্তরে। সে দৃষ্টি যে দেখেছে সে হলপ করে বলতে পারে চয়ন কখনও সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যায়নি। উন্মাদের ঘোলাটে চোখে আশা-আকাঙ্খা ও-ভাবে দোল খেতে পারে না। ডাক্তারবাবুর মনে হল চয়ন তাঁর কথা বুঝতে পারছে ঠিকই, কিন্তু তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। আত্মীয়-বন্ধু মায় গোটা দুনিয়ার প্রতি তার অভিমান। কাউকে ও বিশ্বাস করে না। পাগল নয়, তবু সে পাগল সেজে আছে! ডাক্তারবাবু ওকে বললেন : আমাকে তুমি সব কথা খুলে বলতে

পার না ? আমি কাউকে কোন কথা বলব না। আমাকে যদি সব কথা খুলে বলতে না পার, তাহলে বল, কাকে তোমার মনের কথা বলতে পারবে ?

ডাক্তার পিল্লাই প্রশ্নটা নিক্ষেপ করে ওকে লক্ষ্য করতে থাকেন। ওঁর মনে হল চয়ন যেন তিলে তিলে ওঁর অন্তরের কাছে সরে আসছে। ওঁকে বিশ্বাস করতে, ওঁর কাছে ধরা দিতে চেষ্টা করছে। মনের মধ্যে একটা ভীষণ দ্বন্দ্ব চলেছে চয়নের। ধীরে ধীরে ওর চোখের উপর থেকে পাগলামির আচ্ছন্নতার একটা পর্দা যেন উপরে উঠে যাচ্ছে—যেমন করে ভোরবেলাকার কুয়াশা কেটে গিয়ে সূর্য ওঠে।

ডাক্তারবাবু বললেন : মালকোকে ডাকব ? রঙিলাকে ?

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ চীৎকার করে উঠেছিল চয়ন : না-না-না !

থপ করে বসে পড়ল ফের মাটিতে। আর সেই চীৎকারে ভয় পেয়ে হুড়মুড় করে আবার সবাই ঢুকে পড়ল ঘরে।

ভুল, ভুল, মর্মান্তিক ভুল করে বসেছেন ডাক্তার পিল্লাই। এত সহজ কথাটা তাঁর খেয়াল করা উচিত ছিল। অনুমান করা উচিত ছিল, বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে-আসা বরের মনের গভীরে যদি কোন কাঁটা বিঁধে থাকে—তা হলে তা হচ্ছে তার হলেও-হতে-পারত কনের কাঁটা! আর উনি নির্বোধের মতো চয়নের সেই বেদনার জায়গাটাই মাড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে ওর অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠেছে! বুঝতে অসুবিধা হয়নি পিল্লাই সাহেবের যে পরীক্ষা কার্যের আপাতত ঐখানেই যবনিকা!

ডাক্তার সাহেবের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল ছেলেটি উন্মাদ নয়। ঈশ্বরের এমন একটি অপূর্ব সৃষ্টি কি এভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে ? এ নিশ্চয় একটা কঠিন সাইকলজিক্যাল কেস। ওঁর মনে হয়েছিল চয়নের চিকিৎসার মাধ্যমেই আদিবাসী-মনের একটা অনুদ্‌ঘাটিত মহাদেশ হয়তো আবিষ্কার করতে পারবেন। যতটা ওদের আগ্রহ ছিল তার চেয়ে ডাক্তারবাবুর উৎসাহই যেন বেশী। একটা কথা ডাক্তারবাবু কিছুতেই ভুলতে পারেননি—কাবোঙ্গা গাঁয়ের ঐ অসভ্য লোকগুলি সাত মাইল পথ ঠেঙিয়ে তাঁর কাছেই এসেছে, গুণিয়ার কাছে যায়নি। ঝাড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারস্থ হয়নি। পরে অবশ্য তিনি জানতে পারেন যে ঝাড়-ফুঁকের রাজ্য অতিক্রম করেই ওরা এসেছিল তাঁর কাছে। তা হোক, তবু চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসাবে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করতে নেমে তিনি

নিজের দায়িত্বের কথা ভোলেন নি। উনি লক্ষ্য করেছেন ঐ নেংটিসার মানুষ-গুলো কেমন তিল তিল করে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে শিখছে। সভ্য জগতের মানুষের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুলছে। তার অনিবার্য ফলস্বরূপ একদল ঝাড়-ফুঁক-মন্ত্র-তন্ত্র-ওয়ালাদের সঙ্গে ডাক্তারবাবুর একটা সংঘাত পাকিয়ে উঠছিল ক্রমে ক্রমে। নারানপুরে কাজে যোগ দেবার পর থেকেই সেটা তিনি অনুভব করেছিলেন। এক্ষেত্রেও তাই হল। কাবোঙ্গা গাঁয়ের গুণিয়া ইতিপূর্বেই নিদান হেঁকেছিল—চয়ন ভুগছে অপদেবতার অভিশাপে। 'পাংনাহিন নিহানী ধুরবান!' মন্ত্রবিলাসিনী ডাইনির নিক্ষিপ্ত মারণমন্ত্র। একমাত্র নাকি সেই ডাইনীই পারে আবার চয়নকে স্বাভাবিক মানুষ করে তুলতে। আর কারও সে ক্ষমতা নেই। তাই ডাক্তারবাবু যখন কেসটা হাতে নিয়ে চয়নের আত্মীয়-স্বজনকে ভরসা দিতে গেলেন তখন খল্ খল্ করে হেসে উঠেছিল লোকটা।

ডাক্তারবাবু ধমক দিয়ে উঠেছিলেন: হাসছ কেন তুমি?

লোকটা ঝাঁকড়া চুল সমেত মাথাটা ঝাঁকিয়ে বললে: হাসব না? তুই কেন মিছিমিছি এদের বলছিস যে চয়ন আবার ভাল হয়ে যাবে?

ডাক্তারবাবু বললেন: মিছে কথা আমি বলি না, চয়ন সত্যিই সেরে উঠবে। আমি তাকে সারিয়ে তুলব।

লোকটা অবজ্ঞার হাসি হেসেছিল।

ওর সে হাসি দেখে পিত্তি জ্বলে গেল ডাক্তারবাবুর। গুণিয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন উনি। যেমন করে হোক চয়নকে ভাল করে তুলতে হবে—এই হল ওঁর পণ। চয়নকে নিজ হেপাজতে রাখলেন। কথা হল, রোজ বিকালে ওদের গ্রাম থেকে কেউ না কেউ এসে চয়নকে দেখে যাবে।

গুণিয়া যাবার সময় উপদেশ দেবার ছলে বললে: এ কিন্তু তুই ভাল করলি না। শুধু শুধু তুই বিপদ ডেকে আনছিস।

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন: সে আমি বুঝব। আর শোন, তুমি আর আসবে না এখানে।

লোকটা রুখে উঠে বলে: কেন? আসব না কেন?

: না। তুমি এলে আমার চিকিৎসার ফল হবে না। তুমি তো তোমার মন্ত্রতন্ত্র সবই খাটিয়েছ,—তখন তো আমি বাধা দিতে যাই নি। এবার আমার চিকিৎসা যখন চলবে তখন তুমিও আসবে না বাধা দিতে।

: বাধা দিতে যাব কেন? কর না তুই কি করতে চাস।—বললে লোকটা।

: না! তুমি আসবে না। আমি বারণ করছি!

হঠাৎ ক্ষেপে গেল মানুষটা। ধ্বক করে জ্বলে উঠল ওর চোখ দুটো। চিৎকার করে উঠল: তোরও ঐ অবস্থা হবে!

একটি মাড়িয়া তরুণী

কোণ্ডা ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার উপর, মুখে হাত চাপা দেয়: সর্বনাশ করিস না গুণিয়া! ডাক্তারসাহেবের উপর ধুরবান ছুঁড়িস না!

হাতের প্রচণ্ড ধাক্কায় কোণ্ডাকে সরিয়ে দিল লোকটা। ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হাতের আঙুলগুলো মটকালো, বললে: মোটিয়ারী হয়ে যাবি! আসকালোনে পড়ে থাকবি মাসের পর মাস! ভেড়ী হয়ে যাবি তুই।

ডাক্তারবাবু তাড়িয়ে দিয়েছিলেন লোকগুলোকে।

নারানপুরে ডাক্তারবাবুর মোবাইল ডিসপেন্সারীর ব্যবস্থা। এখানে হাসপাতাল নেই। তবু ওঁর আউট-ডোরে খান দুই খাটিয়া পেতে নিজ দায়িত্বে

ছুটি এমার্জেন্সি বেডের ব্যবস্থা রেখেছেন উনি। সে ছুটি নাকি ভর্তি ছিল। চয়নকে নিয়ে এসে তুললেন নিজের তাঁবুতে। কিন্তু চয়ন কিছুতেই রাজি হল না। জঙ্গল কেটে এনে পরদিনই একটা ছাপরা মতো বানিয়ে ফেলল মহুয়া গাছ তলায়। কাঠের একটা আলপান্‌জি (মাচাঙ) বানিয়ে নিল। ভাব জমিয়ে ফেলল ডাক্তারসাহেবের আলসেশিয়ানটার সঙ্গে। পাগলামির বিশেষ কোন লক্ষণ প্রথমটা নজরে পড়েনি, শুধু তীব্র একটা অনীহা জগতের সব কিছুর উপর। কারও সঙ্গে কথা বলে না, কারও সঙ্গে কোন বন্ধন স্বীকার করে না। আপন-মনে বসে থাকে তার পাতায়-ছাওয়া ঘরে, সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল। ডাক্তারবাবু নিজে যা খেতেন তাই খেতে দেওয়া হত ওকে। লোকজনের সামনে সে কিছু খেত না। ডাক্তারবাবুর মেডিক্যাল-ভ্যানের ক্লিনার ছোকরাও মুরিয়া—খাবারটা সেই দিয়ে আসত ওর ছাপরায়। তার সঙ্গেও কোনদিন কথা বলেনি চয়ন ; তবে খাবারটা খেত। বোঝা যায়, খুব তৃপ্তি পায় না খেয়ে। খায় যতটা, ছড়ায় তার চেয়ে বেশী। পাগলের খাওয়ার ধরন আর কি। প্রতিদিনই ওদের গ্রাম থেকে কেউ না কেউ আসত ওর সঙ্গে দেখা করতে। ওর বাপ কোণ্ডা, গাঁয়ের গাইতা গাদরু, বন্ধু কোতোয়ার, ওর কাকা—চয়নের মাও আসত মাঝে মাঝে ছোট একটি ভাইকে কোলে নিয়ে। চয়ন খুশী হয় না তাদের দেখে। ওরা এলেই সে উঠে গিয়ে বসত তার ছাপরার ভিতর। কাবোঙ্গা গাঁয়ের চেলিক-মোটিয়ারীর দলও মাঝে মাঝে আসত তাদের প্রাক্তন শিরদারের সংবাদ নিতে। চয়ন তখন একেবারে শম্বুক-বৃত্তি অবলম্বন করত ;—চুপচাপ বসে থাকত ঘরের ভিতর, দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। বক্তব্যের চেয়ে বক্তাই আমার কাছে বড় হয়ে উঠছিল। গভীর রাত। বাইরে একটানা ছিপ্‌ছিপ্‌ বৃষ্টির শব্দ। লণ্ঠনের ভূতুড়ে ছায়া তাঁবুর চন্দ্রাতপে। ডাক্তারবাবু খাটিয়ার উপর বসে গল্প বলছেন। বুকের তলায় বালিশ গোঁজা। গল্পের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সাধারণ। মামুলী একটা রোগীর চিকিৎসার গল্প। অখ্যাত এক অরণ্য-পল্লীর অজ্ঞাত এক যুবকের মস্তিষ্ক বিকৃতির কাহিনী। কিন্তু বক্তার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন আফ্রিকার গহন অরণ্যে স্বর্ণখনির সন্ধানে ফেরার গল্প বলছেন উনি।

বললুম : আচ্ছা ডাক্তারবাবু, সে সময় আপনার কি ধারণা হয়েছিল ? হঠাৎ কেন পাগল হয়ে গেল ছেলেটা ?

: ওর ভাবগতিক দেখে আমার মনে হয়েছিল সে যেন কোন অপরাধ-বোধে ভারাক্রান্ত। গিল্ট-কম্‌প্লাসের মতো সে তার মুখখানা লুকাতে চায় শুধু। তাই সে পাগলামির চাদর মুড়ি দিয়ে দুনিয়ার একান্তে আত্মগোপন করতে চায়। দুনিয়াকে সে উপেক্ষা করতে চায়, অস্বীকার করতে চায়, পৃথিবীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে উন্মুখ—নির্বাক উদাসীনতায়। তাই সকলকে বারণ করে দিলাম। কারও আসার দরকার নেই। ওর পরিচিত কেউ যেন ওর কাছে না যায়। থাকুক ও আপন মনে। দেখি তার ফলাফলটা। ক্রমশ কাজের চাপে ওর কথা ভুলেই গেলাম আমি। চয়ন সুখেই আছে, অন্তত স্বচ্ছন্দে আছে। যে কোন কারণেই হক, নির্জনতাটাকেই ওর পছন্দ। দিনসাতেক পরে আবার একদিন চেষ্টা করলাম ওর সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু না, চয়ন আর কোন সাড়াশব্দ দিল না। স্থির করলাম ওকে কোনভাবে বিরক্ত করব না। ও যা চায় তা অনুমান করে সরবরাহ করতে হবে। রোগীর মনটা প্রফুল্ল রাখার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। চয়ন যে কোন কারণেই হক সবচেয়ে বেশী করে চাইছে নির্জনতাকে—তাই ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিলাম। ওকে যে নজরে নজরে রেখেছি তাও যেন ও বুঝতে না পারে।

হঠাৎ ডাক্তারবাবু আমাকে বলেন : একটা মজার কথা শুনবেন ? চয়ন শর্মিলাকে একেবারেই সইতে পারে না। শর্মিলাকে দেখলেই সে ক্ষেপে যায় ! তার পাগলামির মাত্রাটা বেড়ে যায় ! কারণটা আন্দাজ করতে পারেন ?

আমি বললুম : পারি। শর্মিলা দেবী মেয়েমানুষ বলে। মেয়েমানুষ জাতটার উপরেই ও ক্ষেপে গিয়েছিল।

: শুধু তাই নয়। আরও একটা কারণ ছিল—

: জানি ! শর্মিলাদেবীর গায়ের রঙ কালো নয় বলে !

ডাক্তারবাবু রীতিমতো অবাক হয়ে যান ; বলেন : আশ্চর্য ! আপনি কেমন করে তা আন্দাজ করলেন ?

আমি হেসে বলি : ডাক্তারসাহেব, আপনি যদিও বলেননি, তবু আমি আন্দাজ করেছি চয়ন আয়েতুর বাড়ি লামহাদা খাটিতে গিয়েছিল ছোটবোনের জন্যে নয়—রঙিলা-বেলোসার পাণিপ্রার্থী হয়ে। মুরিয়ার ঘরে রঙিলা এক

আশ্চর্য বিস্ময়। রঙিলাই ওকে পাগল করেছে। আর সেই রঙিলা সাধারণ মুরিয়া মেয়ের মতো কালো নয়, সে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। রঙিলা—আগুন-বরণ কন্যা মেয়ে!

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে ডাক্তার পিল্লাই বলেন : হ্যাঁ হ্যাঁ আগুনবরণ…কিন্তু, কিন্তু আপনি তা কেমন করে জানলেন? ট্রাম্প কার্ডটাতো এখনও আমি এক্সপোস করিনি!

আমি হেসে বললুম : তাস খেলার ঐ তো মজা! লুকোবার চেষ্টা করলেও হার্টসের বিবিকে আমি আপনার হাতে ঠিকই প্রেস করেছি!

ডাক্তারবাবু বলেন : সারেণ্ডার করলুম। বলুন এবার কেমন করে আন্দাজ করলেন সেটা?

: আন্দাজ নয়। রঙিলাকে আমি দেখেছি।

: দেখেছেন? কোথায়? কেমন করে?

বললুম : কারাংমেটার দল যেদিন কাবোঙ্গার আসে সে রাত্রে আমিও ছিলাম কাবোঙ্গা ঘটুলে।

কোথাও কিছু নেই ডাক্তারসাহেব লাফ দিয়ে পড়েন আমার খাটিয়ার উপর। আমার হাত দুটি ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলেন : ছিলেন! ছিলেন! হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! আপনি সে রাত্রে ছিলেন কাবোঙ্গায়! বলুন তাহলে কি দেখে-ছিলেন—সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করুন!

আমি তো হতভম্ভ!

ডাক্তারসাহেব এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন যে পাশের ঘরে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল শর্মিলা দেবীর। তিনিও দ্বারপ্রান্তে উঠে এসেছেন লণ্ঠন হাতে : কি হয়েছে?

ধমক দিয়ে ওঠেন ডাক্তারবাবু : কিছু হয়নি! ডোণ্ট বি সিলি! যাও শোও-গে যাও।

আমি মরমে মরে গেলাম এ কথায়। মিসেস পিল্লাইয়ের সঙ্গে মাত্র কয়েক-ঘণ্টা আগে পরিচয় হয়েছে। ডাক্তার পিল্লাইয়ের মতো শিক্ষিত সজ্জন যে আমার মতো অর্ধপরিচিতের সামনে মধ্যরাত্রিতে এভাবে স্ত্রীকে ধমক দিতে পারেন তা ছিল আমার স্বপ্নেরও অগোচর। অপ্রস্তুতের একশেষ। মিসেস পিল্লাই নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হলেন ঘর থেকে। পিল্লাইসাহেব

আবার আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলেন : কই কি দেখেছিলেন বলুন ?

ভাবলাম—পাগল কে ? চয়ন, আমি না ডাক্তার পিল্লাই ?

গল্প শোনা মাথায় উঠল। গল্প বলে চলি এরপর। কাবাঙ্গো পৌছানো থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত। জীপের হেড লাইটে দেখা সাবুগাছতলায় চয়নের নিঃসঙ্গ মূর্তি পর্যন্ত। নারানপুরের ঘটনাটা আর বললাম না। সেটা চয়নের কাহিনীতে অপ্রাসঙ্গিক। সেটা বেলোসার উপাখ্যান। তাই বলিনি।

আজ বুঝতে পারি বেলোসার কাহিনীটা অনুল্লেখ করার পিছনে আমার নিজের একটা অপরাধবোধ ছিল। গুপ্তেজীর কাছে ধমক খেয়ে বুঝেছি সেদিন ওভাবে মোহনকে ছেড়ে দেওয়া আমার অন্যায় হয়েছিল। সেই ভীরুতার লজ্জা গোপন করতে ও-কাহিনী উহ্য রেখেছিলাম ডাক্তার সাহেবের কাছে। সেদিন যদি রঙিলার উপাখ্যান ডাক্তারবাবুকে বলে ফেলতে পারতাম, আজ বুঝতে পারি, তাহলে এ গল্প হয়তো অন্য খাতে বইত।

ডাক্তারবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন : ধরেছি ঠিকই। এনি পোর্ট ইন দ স্টর্ম। ঝড়ের মুখে জাহাজের অবস্থা। নির্দিষ্ট বন্দরে যদি পৌছাতে না পার, তাহলে যেখানে পার নোঙর গাড়।

যেন একটা মহা আবিষ্কার করেছেন। হা-হা করে হাসলেন খানিক। এ মন্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা ধরতে পারিনি। বললুম : তারপর ?

ডাক্তারসাহেবের মেজাজ তখন খুশ। বললেন : তারপর ? তারপর 'কুকুর্সনা পোহার !'

: অস্যার্থ ?

: অস্যার্থ কোঁকর কোঁ, ভেলরে বিহান। ঐ শুনুন মোরগ ডাকছে রাত শেষ।

সকাল সাতটার মধ্যেই এসে পড়লেন মৌলানা সাহেব : একি, আপনি এখনও তৈরী হয়ে নেননি ?

সবিনয়ে নিবেদন করি : আজ্ঞে না। এ-যাত্রার আমি আর পারলকোট যাচ্ছিনা। আপনি ফেরার পথে আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবেন।

আশ্চর্য বিস্ময়। রঙিলাই ওকে পাগল করেছে। আর সেই রঙিলা সাধারণ মুরিয়া মেয়ের মতো কালো নয়, সে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। রঙিলা—আগুন-বরণ ফর্সা মেয়ে!

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে ডাক্তার পিল্লাই বলেন : হ্যাঁ হ্যাঁ আগুনবরণ···কিন্তু, কিন্তু আপনি তা কেমন করে জানলেন? ট্রাম্প কার্ডটাতো এখনও আমি এক্সপোস করিনি!

আমি হেসে বললুম : তাস খেলার ঐ তো মজা! লুকোবার চেষ্টা করলেও হার্টসের বিবিকে আমি আপনার হাতে ঠিকই প্লেস করেছি!

ডাক্তারবাবু বলেন : সারেণ্ডার করলুম। বলুন এবার কেমন করে আন্দাজ করলেন সেটা?

: আন্দাজ নয়। রঙিলাকে আমি দেখেছি।

: দেখেছেন? কোথায়? কেমন করে?

বললুম : কারাংমেটার দল যেদিন কাবোঙ্গার আসে সে রাত্রে আমিও ছিলাম কাবোঙ্গা ঘটুলে।

কোথাও কিছু নেই ডাক্তারসাহেব লাফ দিয়ে পড়েন আমার খাটিয়ার উপর। আমার হাত দুটি ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলেন : ছিলেন! ছিলেন! হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! আপনি সে রাত্রে ছিলেন কাবোঙ্গায়! বলুন তাহলে কি দেখে-ছিলেন—সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করুন!

আমি তো হতভম্ভ!

ডাক্তারসাহেব এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন যে পাশের ঘরে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল শর্মিলা দেবীর। তিনিও দ্বারপ্রান্তে উঠে এসেছেন লণ্ঠন হাতে : কি হয়েছে?

ধমক দিয়ে ওঠেন ডাক্তারবাবু : কিছু হয়নি! ডোণ্ট বি সিলি! যাও শোও-গে যাও।

আমি মরমে মরে গেলাম এ কথায়। মিসেস পিল্লাইয়ের সঙ্গে মাত্র কয়েক-ঘণ্টা আগে পরিচয় হয়েছে। ডাক্তার পিল্লাইয়ের মতো শিক্ষিত সজ্জন যে আমার মতো অর্ধপরিচিতের সামনে মধ্যরাত্রিতে এভাবে স্ত্রীকে ধমক দিতে পারেন তা ছিল আমার স্বপ্নেরও অগোচর। অপ্রস্তুতের একশেষ। মিসেস পিল্লাই নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হলেন ঘর থেকে। পিল্লাইসাহেব

আবার আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলেন: কই কি দেখেছিলেন বলুন?

ভাবলাম—পাগল কে? চয়ন, আমি না ডাক্তার পিল্লাই?

গল্প শোনা মাথায় উঠল। গল্প বলে চলি এরপর। কাবাঙ্গো পৌছানো থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত। জীপের হেড লাইটে দেখা সাবুগাছতলায় চয়নের নিঃসঙ্গ মূর্তি পর্যন্ত। নারানপুরের ঘটনাটা আর বললাম না। সেটা চয়নের কাহিনীতে অপ্রাসঙ্গিক। সেটা বেলোসার উপাখ্যান। তাই বলিনি।

আজ বুঝতে পারি বেলোসার কাহিনীটা অনুল্লেখ করার পিছনে আমার নিজের একটা অপরাধবোধ ছিল। গুপ্তেজীর কাছে ধমক খেয়ে বুঝেছি সেদিন ওভাবে মোহনকে ছেড়ে দেওয়া আমার অন্যায় হয়েছিল। সেই ভীরুতার লজ্জা গোপন করতে ও-কাহিনী উহ্য রেখেছিলাম ডাক্তার সাহেবের কাছে। সেদিন যদি রঙিলার উপাখ্যান ডাক্তারবাবুকে বলে ফেলতে পারতাম, আজ বুঝতে পারি, তাহলে এ গল্প হয়তো অন্য খাতে বইত।

ডাক্তারবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন: ধরেছি ঠিকই। এনি পোর্ট ইন দ স্টর্ম। ঝড়ের মুখে জাহাজের অবস্থা। নির্দিষ্ট বন্দরে যদি পৌছাতে না পার, তাহলে যেখানে পার নোঙর গাড়।

যেন একটা মহা আবিষ্কার করেছেন। হা-হা করে হাসলেন খানিক। এ মন্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা ধরতে পারিনি। বললুম: তারপর?

ডাক্তারসাহেবের মেজাজ তখন খুশ। বললেন: তারপর? তারপর 'কুকুর্সনা পোহার!'

: অস্যার্থ?

: অস্যার্থ কোঁকর কোঁ, ভেলরে বিহান। ঐ শুনুন মোরগ ডাকছে রাত শেষ।

সকাল সাতটার মধ্যেই এসে পড়লেন মৌলানা সাহেব: একি, আপনি এখনও তৈরী হয়ে নেননি?

সবিনয়ে নিবেদন করি: আজ্ঞে না। এ-যাত্রার আমি আর পারলকোট যাচ্ছিনা। আপনি ফেরার পথে আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবেন।

: রাত্রের মধ্যেই মত বদলালেন যে ?

: যা বৃষ্টি হয়েছে, তাতে আপনিও যে পারালকোট পৌঁছতে পারবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে আমার ; কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। কালরাত্রে একটা গল্প আধখানা শুনেছি, বাকিটা না শুনে পাদমেকং ন গচ্ছামি !

: বুঝেছি। হাসলেন মৌলানা ;—বেশ সেই কথাই রইল। আগামীকাল সন্ধ্যা নাগাদ ফিরব। দেখবেন, একাধিক সহস্র রজনীর গল্প না-হয় শেষ পর্যন্ত।

মৌলানাকে বিদায় করে আমরা এসে বসলাম। প্রাতরাশের পর বলি : কই মশাই, আপনার গল্পের শেষটুকু বলুন।

ডাক্তার সাহেব হাসেন : শেষটুকু তো বলতে পারব না। তবে আরও কয়েকটি চ্যাপটার শোনাতে পারি।

: শেষটা শুনব কবে ?

: মহাকাল যেদিন লিখবেন শেষ চ্যাপটার। চয়ন এখনও আমার হেপাজতেই আছে। এখনও সে ভাল হয়ে ওঠেনি।

: বেশ তাহলে যতটা মহাকাল লিখেছেন, ততটাই বলুন।

: তারও সবটা শোনাতে পারব না। এতো আপনাদের সাপ্তাহিক-মাসিকে প্রকাশিত ধারাবাহিক গল্প নয়। এর উপাদান আমাকে রীতিমতো খুঁজে খুঁজে বার করতে হয়েছে। একবার ছুটেছি কাবোঙ্গা, একবার ছুটেছি কারাংমেটা। এর জবানীতে, ওর জবানীতে শুনেছি এক-একটা খণ্ড কাহিনী। জোড়াতালি দিয়ে গোটা গল্পটা কেমনভাবে খাড়া করব বুঝে উঠতে পারছি না। আমার কাছে সংবাদগুলো যেমনভাবে এসেছিল সেই কালানুক্রমিকভাবেই বলে যাই :

দিন কয়েক পরের কথা। দুপুর বেলা। হাতে কাজ ছিল না। বসে বসে একটা গল্পের বই পড়ছি। হঠাৎ চাকরটা ছুটে এল—সর্বনাশ হয়েছে। চয়নের ঘরে কে একটা মেয়ে উঁকি দিচ্ছিল, চয়ন তাকে এমন ধাক্কা মেরেছে যে, মেয়েটি উল্টে পড়ে গেছে। মাথাটা কেটে গেছে তার। রক্তারক্তি কাণ্ড।

ছুটে গেলাম চয়নের ছাপরায়। কম্পাউণ্ডারটাও নেই। দুপুর বেলা। জনমানব নেই ধারে কাছে। ওর ঘরের সামনে গাছতলায় মুখ-থুবড়ে পড়ে আছে মেয়েটি। মাথার পিছনের দিকে আঘাত লেগেছে। তখনও জ্ঞান

ফেরেনি। চাকরটা একটা জলের ঘটি নিয়ে এসেছিল। মুখে বার দুই ঝাপটা দিতেই উঠে বসল। সামলে উঠল অল্পক্ষণেই।

বছর সতেরো আঠারো বয়স। মুরিয়া ঘরের মেয়ে। নিটোল স্বাস্থ্য, শান্ত মুখশ্রী—বেশ একটু বিষণ্ণ। বিহ্বলভাবে চারিদিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসল একটা গাছে ঠেস্ দিয়ে। তাকে চাকরটার জিম্মায় রেখে চয়নের ঘরে গেলাম। গুম মেরে বসে আছে এক কোণায়। আমি ধমক দিয়ে উঠলাম: ওকে মেরেছ কেন?

কোন জবাব নেই।

ভীষণ রাগ হয়ে গেল। ওর কাঁধ দুটি ধরে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে বললাম: তোমার পাগল সেজে থাকা বার করছি আমি! কেন মেরেছিস ওকে, বল্! উত্তর দে!

চয়ন উঠে দাঁড়াল। ঘোলাটে চোখ দুটো হঠাৎ ধ্বক করে জ্বলে উঠল। বললে: ছেড়ে দে!

গলার স্বর চড়িয়ে বললুম: না! কেন মেরেছিস ওকে বল্!

ও-ও চটে উঠে বললে: বেশ করেছি, মেরেছি!

আমার মাথার মধ্যে যেন দাবানল জ্বলে উঠল। ঠাস্ করে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিলাম ওর গালে: বদমায়েস, শয়তান কোথাকার! খুন করে ফেললি মেয়েটাকে!

রাগের মাথায় চড়টা মেরেই বুঝলাম ভুল করেছি। চয়ন আমার চেয়ে শক্তিশালী। হয়তো ও সত্যিই পাগল। আমাকে যদি এ নির্জন ঘরে ও আক্রমণ করে বসে তাহলে সর্বনাশ! কিন্তু সে-সব কিছুই করল না! চড়টা খেয়ে কেমন যেন সম্বিত ফিরে এল তার, বোকার মতো বললে: খুন! কে খুন হয়েছে? মাল্‌কো?

মেয়েটির পরিচয় পেলাম ওর প্রশ্নের ভিতর থেকে। এই তাহলে আয়েতু গোণ্ডের মেয়ে মাল্‌কো? কিন্তু আমি কোন জবাব দেবার আগেই আমাকে ও একটা প্রচণ্ড ধাক্কা মারল। আমি উল্টে পড়লাম। নক্ষত্রবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। পড়ে গিয়ে আঘাত লেগেছিল, তবু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম। হাতের কাছে পড়েছিল চয়নের কুঠারখানা! তুলে নিলাম ক্ষিপ্রগতিতে। চয়ন ক্ষেপে গেছে। ঘরের বাইরেই রয়েছে মাল্‌কো—তখনও দুর্বল! তাকে

আক্রমণ করতেই গেল বোধহয়। বুঝলাম প্রচণ্ড ভুল করেছি ওকে এভাবে মেরে বসায়। পাগলটা এখন কি করবে কে জানে! ওর পাগলামি প্রতিহত করতে গিয়ে কুঠারকে যে কোনমতেই ব্যবহার করা যাবে না—তাতে যে একটা বীভৎস রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেতে পারে সেকথাও তখন খেয়াল ছিল না আমার। শুধু প্রাণধর্মের তাগিদে কাজ। কুঠারটা হাতে নিয়েই ছুটে বেরিয়ে এলাম ওর পিছনে পিছনে।

বাইরে এসে দেখি চয়ন উপুড় হয়ে পড়েছে মাল্‌কোর বুকের উপর। চাকরটা বাধা দেবার চেষ্টা করছে বৃথাই। না ভয় নেই কিছু; চয়ন ওকে আক্রমণ করেনি। এ শুধু অনুশোচনার আবেগে উচ্ছ্বসিত বিলাপ। চাকরটা লোকজন ডাকতে ছুটছিল বোধহয়। বাধা দিলাম তাকে। চয়নের বাহুমূল ধরে বললাম: ওকে ছেড়ে দাও চয়ন। ওর মাথায় আঘাত লেগেছে। ওকে বিশ্রাম নিতে দাও!

চয়ন স্থির হল। ছেড়ে দিল ভূলুণ্ঠিতা মেয়েটিকে। দ্রুতপদে উঠে গেল ঘরে। তারপর উবুড় হয়ে পড়ল ভূশয্যায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে ছেলেমানুষের মতো।

মাল্‌কোকে নিয়ে এলাম আমার তাঁবুতে।

একটু ব্র্যাণ্ডি-মেশানো গরম দুধ খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলো মেয়েটি। ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে। রহস্যের যখন কোন কিনারাই করতে পারছিলাম না, তখন নূতন একটা আলোকের সন্ধান পাওয়া গেল মাল্‌কোর জবানবন্দিতে।

আদিবাসিদের মধ্যে চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখেছি, সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এই যে, রোগীর কি কষ্ট, তা ওরা ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারে না। আর সবচেয়ে সুবিধা এই যে লজ্জায়, সঙ্কোচে কোন কথা ওরা গোপন করে না। সভ্যজগতের মানুষ যেটা লজ্জাজনক মনে করে, সেই তথাকথিত গোপন কথাও ওরা অকপটে বলতে দ্বিধা করে না। মাল্‌কো তার পূর্বরাগের যে বিবৃতি দিল, তাতে রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এল। আমি নিশ্চিত বলতে পারি, অমন অকপট স্বীকারোক্তি কোন শিক্ষিতা আধুনিকমনা অনূঢ়ার কাছে আমি আশা করি না।

মাল্‌কো হচ্ছে কারাংমেটা গাঁয়ের গাইতা আয়েতু গোণ্ডের ছোট মেয়ে। কারাংমেটা ঘটুলের মাল্‌কো। ঘটুলে সে এসেছিল মাত্র ছয় বছর বয়সে। রঙিলার হাত ধরে। রঙিলা তখনও বেলোসা হয়নি। ঘটুলের প্রত্যেকটি কোণা তার অতি পরিচিত, গাঁয়ের সবকয়টি চেলিক-মোটিয়ারীকেই সে খুব ভালভাবে জানে। ওর সতের বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনের অধিকাংশ সন্ধ্যাই কেটেছে এই ঘটুল-ঘরে। সবাই ভালবাসতো মাল্‌কোকে তার মিষ্টি লাজুক স্বভাবের জন্যে। আর মাল্‌কো সবচেয়ে ভালবাসতো তার দিদি রঙিলাকে। রঙিলার চেয়ে সে বছর তিনেকের ছোট। তাই দু' বোনের সম্পর্কটা প্রায় সখীত্বের পর্যায়ে পড়ে। তবে রঙিলার সাংসারিক জ্ঞান খুব বেশী, চালাক-চতুর সে—মাল্‌কো সরলা। দিদির কাছেই মাল্‌কো নিয়েছে জীবনের প্রথম পাঠ। মনের মধ্যে যখন যা প্রশ্ন জেগেছে, তার সমাধান জানতে ছুটে গেছে দিদির কাছে। রঙিলার চোখের তারা নীল আর গায়ের রঙ সুচিক্কণ নিকষ কালো নয় বলে কেউ যদি তাকে ঠাট্টা করত, বিদ্রূপ করত, অমনি ফোঁস করে রুখে দাঁড়াতো মাল্‌কো। কারাংমেটা ঘটুলের সবাই ওদের দুজনকে তখন ঠাট্টা করে বলত মানিক-জোড়। রঙিলা যদি বনের মধ্যে খুঁজে পেত একটি কন্দ-মূল তাহলে সেটা নিয়ে এসে দিত মাল্‌কোর হাতে। মাল্‌কো তাতে এক-কামড় মেরে আধখানা আবার ফিরিয়ে দিত দিদিকেই। মাল্‌কো যদি খুঁজে পেত নারাঙ্গীর ধারে নতুন ধরনের ঘষা-পাথর—তাহলে এক কোঁচড় নুড়ি পাথর কুড়িয়ে এনে তার অর্ধেক দিয়ে দিত রঙিলাকে। দিদির সঙ্গে তার প্রথম বিবাদ বাধল এই দান-প্রতিদান নিয়েই। কতই বা তখন বয়স ওদের? মাল্‌কো দশের কোঠায়—রঙিলা ত্রয়োদশী। পর পর দু রাত্রে দুটি কাঁকুই পেয়ে সে দিদির কাছে ছুটে এল: দিদি! একটা তুই নে।

কোথাও কিছু নেই, ঠাস্ করে এক চড় মেরে বসল রঙিলা। কাঁকুইয়ের মূল্য বুঝবার বয়স তখন হয়েছে রঙিলার। ততদিনে সে বেলোসা হয়েছে। অভিমানী মাল্‌কো গিয়ে লাগালো মায়ের কাছে। আখালী শুনে হাসল না। গম্ভীর হয়ে গেল। সে জানতো, সুন্দর রঙ নেই বলে, অর্থাৎ সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ নয় বলে, বেলোসাকে কারও নজরে ধরে না। বেলোসার একখানিও কাঁকুই জোটেনি তখনও।

সেদিন থেকে মাল্‌কো সামলে নিল নিজেকে। সব কথা সেও বুঝতে

পারেনি সে বয়সে ; কিন্তু নারীর সহজাত প্রবৃত্তি থেকে এটুকু বুঝল যে, কোথায় কি যেন একটা ঘটেছে। রঙিলার রূপহীনতার প্রতি চেলিকের দল উদাসীন—টকটকে সাদা রঙ, নীল চোখ, পিঙ্গল কোঁকড়ানো চুল দেখে ওরা সরে যায়—কিন্তু নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাটা যেন রঙিলার রক্তে। তাই সঙ্গী না জুটলেও অল্প বয়সে সে হয়ে উঠলো ঘটুলের বেলোসা। যতই পদোন্নতি হতে থাকে রঙিলার, যতই দু-বোন পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে যৌব-রাজ্যের তোরণ-দ্বারের দিকে, ততই দু-বোনের মিতালীটা হয়ে আসে ক্ষীণ—সম্পর্কটা হয়ে ওঠে প্রতিদ্বন্দ্বীর। শেষ পর্যন্ত ঐ নীলনয়না পিঙ্গলকেশা মেয়েটিকে রীতিমত ভয় করতে লাগলো মাল্‌কো। শুধু মাল্‌কো নয়, মনে মনে সবাই তাকে ভয় করে। শুধু গ্রামের গাইতার প্রতাপে কথাটা প্রকাশ্য রূপ নেয়নি। নাহলে সকলেই মনে মনে জানে, রঙিলা অপার্থিব ক্ষমতার অধিকারী—অনেক মন্ত্রতন্ত্র, ঝাঁড়ফুঁক জানে সে। কে জানে, হয়তো সে ডাইনীই! পাংনাহিন! মাল্‌কো লক্ষ্য করেছে, দিনে দিনে ওর দিদির স্বভাব যাচ্ছে বদলে। ক্রমশ রুক্ষ বদ্‌মেজাজী হয়ে উঠছে যেন। আখালীও তাকে শাসন করতে সাহস পায় না। কথায় কথায় রঙিলা ছোট বোনের ত্রুটি ধরে। কঠিন শাস্তি দেয়। শুধু দিদি হিসাবে নয়, ঘটুলের বেলোসা হিসাবে। সে আদেশ অমোঘ। মাল্‌কোর নিকট-বান্ধবীরা সহানুভূতি জানায়, কিন্তু বেলোসার আদেশ অমান্য করার স্পর্ধা নেই কারও। মাল্‌কো শাস্তি ভোগ করে আর ওরা নেচে চলে 'রেলো রেলো' নাচ! দিদি যে কেন এমন বিদ্বেষ-দৃষ্টিতে তাকে দেখতে শুরু করেছে তা এতদিনে অনুমান করতে পারছে মাল্‌কো —সেও বড় হয়ে উঠেছে।

একদিন সবাই দেখল রঙিলার মাথায় উঠেছে একটা নতুন কাঠের চিরুনী! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো মাল্‌কোর। যাক তাহলে দিদির একটা হিল্লে হল। শুধু মাল্‌কো নয়, সকলেরই কৌতূহল হল জানতে, কে দিয়েছে ওটা। বেলোসাকে এ প্রশ্নটা করতে কারও সাহসে কুলালো না। কুলাবে না জানতো রঙিলা, আর তাই সে সাহস করে পরেছিল সেটা। জাতে উঠবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অপর সম্ভাবনাটা সে ভেবে দেখেনি। ওরা বেলোসার সামনে আসার সাহস সঞ্চয় করতে না পারলেও পিছনে মিলিত হয়েছিল। সব ক'টি চেলিক যখন টাঙ্গি স্পর্শ করে লিঙ্গোপেনের নামে শপথ নিয়ে বলল যে, কেউ-ই সেটা দেয়নি বেলোসাকে, তখন রহস্যটা ফাঁস হয়ে গেল জনান্তিকে!

গোপন হাসির বন্যা বয়ে গেল সেদিন রঙিলার অনুপস্থিতিতে। সে-হাসি রঙিলা শুনতে পায়নি; কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়েটি আন্দাজ করল ঠিক। লজ্জায়, অনুশোচনায় সে ফেলে দিয়ে এল কাঁকুইটা নারাঙ্গীর জলে।

বেলোসার প্রতাপ তা বলে ক্ষুণ্ণ হল না একতিল। সবাইকে সে হুকুম করে, চালায়। কে কার সাথে শোবে, তা সেই ঠিক করে দেয়। কোতোয়ার শুধু সায় দিয়ে যায় ভয়ে ভয়ে। কোন মেয়ে ঘটুলে আসতে দেরি করলে, অপরিষ্কার থাকলে, ঘটুলের রীতিনীতি না মানলে কঠোর শাস্তি দেয় সে। সবাই তাকে ভয় করে চলে।

কিন্তু রঙিলা বুঝতে শিখেছে—জীবনে এমন কিছু আছে, যা ঠিক হুকুম দিয়ে পাওয়া যায় না। ঘটুলে সকলেরই সমান অধিকার, কিন্তু অধিকার তোমাকে কতটুকু দেয়? এমন জিনিস আছে দুনিয়ায়, যা দাবি করে আদায় করা চলে না—যা স্বতঃস্ফূর্ত। রঙিলা সব পেয়েছে, পায়নি শুধু ঐ স্বতঃস্ফূর্ত জিনিসটা। রঙিলা দেখেছে চেলিক-মোটিয়ারীর দল তাকে দেখলেই কেমন যেন সংযত হয়ে ওঠে। উদ্দাম হাসির উৎস হঠাৎ ঊষর হয়ে যায় সে ঘটুলে এলেই। রঙিলা দু চোখ মেলে দেখেছে মোটিয়ারীদের বাহুবন্ধনে বেঁধে চেলিকের দল কেমন করে মাতোয়াবা হয়ে যায়। সে অভিজ্ঞতাটা ওর হয়নি। ও আসার আগে তারা ফিসফিস করে কথা বলে, অশ্লীল হাসি-মস্করা করে, মুখ লুকিয়ে হাসে—অথচ আশ্চর্য, রঙিলা এসে পড়লেই সবাই সংযত হয়ে যায়। এমনকি শিরদার পর্যন্ত তাকে সমীহ করে চলে। ঘটুলের নিয়ম কেউ লঙ্ঘন করে না, যেদিন যার মাসানিতে বেলোসার আসন নির্দিষ্ট হয়, সেদিন সেই তাকে নিয়ে শোয়, আপত্তি করে না। আলগোছে একটা হাতও ফেলে রাখে ওর পিঠে, আর বোধহয় ভাবে, ভাবে রঙিলা, কখন ভোর হবে রাত।

আরও লক্ষ্য করল রঙিলা, ওর ছোট বোন মাল্‌কো যদিও সাধারণ মোটিয়ারী, তবু তাকেই শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে পাওয়ার লোভে সব ক'টা চেলিকের চোখের তারা যেন নাচতে থাকে। কোতোয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে বেলোসাই তিন দিন অন্তর স্থির করে মাল্‌কো কার সাথে জোড় বাঁধবে। শিরদার হয়তো বলে: জান্‌কি তাহলে আজ শুচ্ছে আথার সাথে, ছুলোসা কোতোয়ারের সঙ্গে, আর মাল্‌কো? মাল্‌কো কার মাসানিতে শোবে?

রঙিলা লক্ষ্য করে, সব কয়টি চেলিকের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এমনকি স্বয়ং শিরদারের চোখেও ফুটে উঠেছে একটা মুগ্ধ-লোলুপতা।

কোতোয়ার হয়তো বলে: মাল্‌কোর কথা ঠিক করিনি—ও নিজেই বেছে নিক।

বাকি সব ক'টা চেলিক একসাথে চেঁচিয়ে ওঠে: মাল্‌কো, আমি! আমি!

মাল্‌কো লাজনম্র মুখটা আর তুলতে পারে না। বুকটা টিপটিপ করে।

রঙিলা গম্ভীর হয়ে বলে: না মাল্‌কোর আজ শরীর খারাপ—ও বাড়ি যাবে।

শিরদার বলে: কেন? আস্‌কালোন্?

রঙিলা ধমক দিয়ে ওঠে: সে খোঁজে তোমার কি দরকার?

শরীর সুস্থ থাকা সত্ত্বেও মাল্‌কো নিঃশব্দে বাড়িতেই ফিরে যায়।

কোতোয়ার বলে: আর তুমি? বেলোসা? আমাদের রাণী কোথায় শোবে?

রঙিলা চোখ তুলে তাকায়। দেখে সব ক'টা চেলিক অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যেন এ-আপদ না ঘাড়ে চড়ে বসে। শিরদারও মাথা নিচু করে মাটিতে কি একটা খুঁজছে।

চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে রঙিলার। চায় না, কেউ চায় না তাকে! কেন? তার গায়ের রঙ আর পাঁচটা মোটিয়ারীর মতো নিকষ কালো নয় বলে? সে কি সত্যিই ডাইনী?

রঙিলা দাঁতে দাঁত চেপে বলে: আমারও শরীরটা খারাপ—আমিও আজ বাড়ি গিয়েই শোব।

এমনিভাবেই চলছিল নগণ্য কারাংমেটা গাঁয়ের ঘটুলের জীবনযাত্রা।

ডাক্তারবাবু বলেন, নাটকটা মোড় ফিরল গত বছর, ওরা দল বেঁধে যখন গেল কাবোঙ্গায়—নারানপুর মেলায় যাওয়ার পথে সেখানে কি ঘটেছিল, আপনি তার প্রত্যক্ষদর্শী, সুতরাং সে-সব কথা বিস্তারিত বলার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু মাল্‌কোর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কয়েকটা কথা বলতে হবে, যা নাকি আপনার অজানা। মাল্‌কো তার জবানবন্দিতে সে-কথা স্বীকার করেছিল অকপটে।

কাবোঙ: ঘটুলের ছেলেমেয়েদের পরিচয় দিতে উঠে দাঁড়াবার আগেই চয়নকে চিনতে পেরেছিল মাল্‌কো। চিনতে পেরেছিল স্থানীয় দলের শিরদার বলে। এমন ছেলে ঘটুলে থাকতে আর কারও পক্ষে শিরদার হওয়া সম্ভব নয়। এমন রূপ আগে মাল্‌কো কখনও কোন চেলিকের দেখেনি। নিজের গাঁয়ে তো নয়ই, এমনকি নারানপুর কিম্বা কোকামেটার মাড়াইতে—যেখানে দশ-বিশ গাঁয়ের শত শত চেলিক জমায়েত হয়, সেখানেও নয়। লিঙ্গোপেনের গল্প শোনা ছিল। লোকগাথা বলে, লিঙ্গোপেনকে যে দেখেছে, সেই ভালবেসেছে। এমনকি, দেবী তাল্লুর-মুট্টাই পর্যন্ত একসময়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন দেব লিঙ্গোপেনের রূপে। মাল্‌কো মনে মনে লিঙ্গোপেনের ছবি আঁকতো—কি রকম দেখতে ছিলেন তিনি? সারা দুনিয়ার যত মোটিয়ারী যাঁকে দেখবামাত্র গীর্দা আতোরের জ্বালা অনুভব করে? আজ এই ছেলেটিকে দেখে সে কৌতূহল চরিতার্থ হল যেন।

আচমকা রঙিলা যখন তাকে ঠেলে দিলে আর চয়ন লুফে নিল তাকে, তখন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল মাল্‌কো। ওর বুকে ক্ষণিক আশ্রয় নেবার অনুভূতিটা আজও সে ভুলতে পারেনি। চয়ন প্রশ্ন করেছিল: লাগলো নাকি?

মাল্‌কোর সারা শরীর তখন থর থর করে কাঁপছে।

রঙিলার প্রগলভতা তার সহ্য হয়নি। ও বুঝতে পেরেছিল ঐ দরাজ-বুক মানুষটার দেহে যত শক্তিই থাক খরজিহ্ব রঙিলার তীব্র তীক্ষ্ম বাক্যবান প্রতিহত করবার ক্ষমতা তার নেই। আর সেজন্যই মনে মনে ফুঁসছিল সে।

কথা ছিল কারাংমেটার দল প্রথম নাচবে 'বান্দা রোলা পুঙ্গার ও আয়া।' এই নাচ প্রথম নাচা হবে বলে দিনের পর দিন মহড়া দিয়ে এসেছিল যাত্রার আগে। ভারি মিষ্টি সে গান। পুষ্প আহরণের গান:

দিঘি-কালো জলে কমল ফুটেছে ঐ।
দেব চুলে ফুল তুলে আন ওলো সই।

কিন্তু রঙিলা সমস্ত পূর্বনির্দেশ অগ্রাহ্য করে হঠাৎ ধরে বসল নতুন গানের ধুয়ো: 'বাদাং সারপার্তে উদিতন সায়দার!'

শুধু মাল্‌কো নয় দলের সবাই বুঝতে পেরেছিল রঙিলার নেশা হয়েছে। পর পর কয়েক পাত্র মধুক-রস পান করেই সে মাতাল হয়নি। সে যেন আরও

কিসের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে। ঐ পাথরে-কোঁদা কবাটবক্ষ মানুষটিকে আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করবার নিষ্ঠুর খেলায় সে যেন মেতে উঠেছে। লড়াইটা যেন কাবোজা আর কারাংমেটার নয়, চয়ন আর রঙিলার। মাল্‌কোর মনে হল রঙিলার বঞ্চিত নারীত্ব যেন পৌরুষের প্রতীক ঐ ছেলেটির উপর প্রতিশোধ নিতেই উদগ্র হয়ে উঠেছে আজ। তাই মহড়ার সব নির্দেশ ধূলিসাৎ করে সে গেয়ে উঠল ব্যঙ্গের গান, আঘাত করার গান।

তবু সে সহ্য করেছিল বেলোসার এ অত্যাচার। ভিনগাঁয়ের সামনে কেউই আপত্তি করেনি। নেচেছিল অনভ্যস্ত নাচ বেলোসার খেয়ালখুশীর মূল্য মেটাতে। কিন্তু এক অপবাধ কতবার সহ্য করা যায়? কাবোঙ্গার দল যখন গাইল বর্ষা-মঙ্গল, তখনও বেলোসা নির্ধারিত কর্মসূচী মেনে চলেনি। হঠাৎ শুরু করল আবার এক নতুন গান 'ও হো ম্যয়না হো লালসাই, ব্যয়ঠো ডাণ্ডা হো!' এবার আর সহ্য হয়নি মাল্‌কোর! চেষ্টা করেছিল, পারেনি। এর আগে বহুবার সে গেয়েছে ঐ গান, নেচেছে ঐ নাচ। পরিচিত অপরিচিত চেলিকদের সুরের নিমন্ত্রণ জানিয়েছে— 'উ'ঠু ডাকু হো রাজা লালসাই।' কিন্তু সে গান ছিল নেহাৎ গান—চৈতদাণ্ডার উৎসবেব আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত। তার আভিধানিক অর্থ হযতো একটা ছিল, কিন্তু তার কোন বিশেষ নেই। আজ কিন্তু ঐ কথাগুলি সত্যি সত্যিই সে বলতে চাইছে। মাল্‌কোর অন্তরাত্মা ঐ চেলিকদলের বিশেষ একজনকে সত্যিই বলতে চায় 'ওঠো বাজপুত্র, নিষ্ঠুর লুঠেরার মতো লুট করে নাও আমার জীবন-যৌবন।' আজ তাই সে পারলে না নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় ঐ কথাকয়টা গানে গানে উচ্চারণ করতে। নিঃশব্দে পালিয়ে এল নাচের মাঝখানেই। বেরিয়ে গেল বাইবে, তারায় ভরা অন্ধকারের আশ্রয়ে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি রঙিলার নজরকে কিন্তু ফাঁকি দিতে পারেনি। কারাংমেটার বেলোসা সে—সবদিকেই তার কড়াদৃষ্টি। নাচ সমে ফিরে এলে রঙিলাও বেরিয়ে এল বাইরে। কোথায় গেল দুর্বিনীত মেয়েটা, খুঁজে বার করতে হবে। বেশী খুঁজতে হল না অবশ্য। শুক্লা অষ্টমীর ম্লান জ্যোৎস্নায় দেখতে পেল ঘটুলের অদূরে তাল্লুর-মুট্টাই মন্দির সংলগ্ন মহুয়া গাছতলায় একা বসে আছে মাল্‌কো। রঙিলা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। আন্দাজ করলে ব্যাপারটা। ডাকলে: মাল্‌কো, উঠে আয়!

মাল্‌কোকে যেন ভূতে পেয়েছে। যে রঙিলাকে সে বাঘিনীর মতো ভয় করে তাকে মুখের উপর বললে: না যাব না!

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল রঙিলা: ও! তাই বল্! গীর্দা আতোর! পীরিত।

ধমকে উঠল মাল্‌কো: চুপ কর্! লজ্জা করে না তোর!

রঙিলা তখনও হাসছে: গীর্দা আতোর হয়েছে তোর, আর লজ্জা পাব আমি?

মাল্‌কো বললে: ডাইনি! '

একটা সাধারণ গালাগাল! কথার মাত্রা। কিন্তু রঙিলার কাছে ঐ কথাটির একটা বিশেষ অর্থ আছে। এ গাল এর আগে কেউ তাকে দেয়নি। এর চেয়ে অশ্লীলতর গাল দিয়েছে। যা নাকি অম্লানবদনে ওরা বলে সর্বসমক্ষে, অথচ যা ছাপার হরফে লেখা বে-আইনি! কিন্তু কেউ কখনও তাকে ডাইনী বলেনি! চোখ দুটো জ্বলে উঠল রঙিলার: তুই নিয়ম ভেঙেছিস। নাচের মাঝখানে চলে এসেছিস। ফিরে চল ঘটুলে! তোকে কী শাস্তি দিই দেখ্! তোর পীরিতের মানুষ দাঁড়িয়ে দেখবে শুধু, কিছু বলতে পারবে না!

মুখটা শুকিয়ে যায় মাল্‌কোর। স্বরটা বদলে যায়। ভয়ে ভয়ে বলে: বা রে! তুই তো নিয়ম আগে ভাঙলি? এ নাচ নাচলি কেন? আমার অভ্যাস ছিল না তাই উঠে এসেছি!

রঙিলা শুধু বললে: উঠে আয় ওখান থেকে!

মাল্‌কোর মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। তবু দাঁতে দাঁত চেপে বললে: না, আমি যাব না!

: যাবি না?—রঙিলার হাতে ছিল চৈতদাওার! বসিয়ে দিলে এক ঘা! —আয় বল্‌ছি!

বন্যজন্তুর মতো আর্তনাদ করে উঠল মালকো: না, না, না!

: এখনও না!—খুন চেপে গেছে রঙিলার! দ্বিগুণ বেগে উদ্যত করে হাতের লাঠি! শিউরে ওঠে মাল্‌কো! আর্ত চিৎকার করে ওঠে! কিন্তু সে নিষ্ঠুর আঘাত প্রতিহত হল মাঝখানে। পিছন থেকে কে যেন চেপে ধরেছে রঙিলার উদ্যত মুষ্ঠি!

চমকে ওঠে ওরা দুজনেই। কখন অতর্কিতে রঙিলার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সেই মানুষটা। চয়ন শিরদার।

রঙিলা বললে : হাত ছাড়!

: ছাড়ছি, কিন্তু কথা দাও ওকে মারবে না আর!

রঙিলা বলে : শিরদার, তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি ভিনগাঁয়ের বেলোসা! আমার ঘটুলের মোটিয়ারীকে শাসন করবার অধিকার আমারই। তোমার মোড়লি করবার ইচ্ছে থাকে নিজের দলে যাও!

চয়ন হাসলে। হাতখানা সে ছাড়েনি কিন্তু। বললে : বেলোসা, তোমার চেহারা মুরিয়া মেয়ের মত নয়; কিন্তু একটা ঘটুলের বেলোসা হয়েও ঘটুলের কানুন তুমি শেখনি?

আহত সর্পিনীর মতো রঙিলা বললে : এত বড় কথা বললে তুমি?

: বলতে বাধ্য করলে যে! তুমি কি জান না আজকে একরাতের জন্য তোমার দলের সব কয়টি মোটিয়ারীর উপর তুমি অধিকার হারিয়েছ? এরা আজ এক রাতের জন্য আমার সম্পত্তি! রাত পোহালে তুমি তোমার অধিকার ফিরে পাবে।

রঙিলা চুপ করে থাকে। যুক্তিটা অকাট্য। চয়ন ছেড়ে দেয় ওর হাত। বাঁ-হাতে মাল্‌কোকে টেনে নেয় বুকে। ডান হাতখানা প্রসারিত করে দেয় ঘটুলঘরের দিকে। মুহূর্ত পূর্বেকার রঙিলার কথাগুলিই প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে ওর কণ্ঠে : বেলোসা! ঘটুলে ফিরে যাও!

রঙিলার সর্বাঙ্গে যেন আগুন ধরে গেছে! কিন্তু না, সংযম সে হারায়নি! দ্রুতপদে নিঃশব্দেই ফিরে যায় একা। কলকণ্ঠে হেসে উঠে চয়ন। তারপর তার খেয়াল হয় —ওর বাহুবন্ধে নির্জীবের মতো পড়ে আছে মাল্‌কো, যেন অজ্ঞান হয়ে গেছে সে!

: মাল্‌কো! মাল্‌কো!

না, অজ্ঞান সে হয়নি। আবেশে মুদে এসেছে তার দুটি কাজলকালো চোখ। ওর তনুদেহের প্রতিটি জীবকোষ অপ্রত্যাশিত মিলনসুখে নিস্পন্দ! উল্কি-আঁকা মুখটা তুলে ধরে সে প্রতীক্ষা করে একটা প্রত্যাশিত স্পর্শ। "পোড়ো ভূমের" দিকে মুখ তুলে যেমন ফুটে ওঠে স্থলপদ্ম! কাবোঙ্গা গাঁয়ের নিঃসঙ্গ নায়কের হিসাবে কেমন যেন ভুল হয়ে যায়। যা কোনদিন করেনি, যার প্রেরণা কোনদিন জাগেনি অন্তরে, তাই করে বসে হঠাৎ। তার কবাট-বক্ষে মাদ্রি-ঢোলের দ্রুত বোল—সে কার বুকের স্পন্দন? নত হয়ে আসে চয়নের মুখ,

দিকচক্রবালের দিকে বর্ষণক্লান্ত বৈকালে যেমন বেঁকে নেমে আসে সপ্তবর্ণা 'ভীমুল-উইল'!

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠি : কিন্তু একটা কথা ডাক্তারসাহেব। সে রাত্রে এমন কি ঘটেছিল যাতে ধ্যান ভাঙলো কাবোঙ্গার নিঃসঙ্গ নায়কের? পূর্ণযৌবনা নারীকে বাহুবন্ধে বাঁধবার অভিজ্ঞতা তো এর আগেও হয়েছিল তার।

ডাক্তারসাহেব বলেন : আমার মনে হয় বেলোসাকে দেখেই ওর ধ্যান ভেঙেছিল। চয়ন সৃষ্টি ছাড়া জীব। রঙিলার রূপটাও সৃষ্টিছাড়া, মুরিয়া দৃষ্টি-ভঙ্গি থেকে। যে কোন কারণেই হ'ক রঙিলার ঐ অদ্ভুত চেহারায় মুগ্ধ হয়েছিল চয়ন। ধ্যান ভেঙেছিল তার। কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে বেলোসা ধরা দিল না, সে হল প্রতিপক্ষ। চয়নের অন্তরে তখন ঝড়ের সঙ্কেত—তাই এনি পোর্ট ইন স্ব স্টর্মের আইনে মাল্‌কোর বন্দরে নোঙর গাড়ল চয়ন।

আমি বলি : তাহলেও প্রশ্ন থাকে। এক্ষুনি যে ঘটনার বর্ণনা দিলেন আপনি, সেটা কি আমরা কাবোঙ্গা ত্যাগ করার আগের ঘটনা, না পরের? আমি যে স্পষ্ট দেখেছিলাম একা বসে আছে চয়ন তালাওয়ের ধারে, সাবু গাছ তলায়।

ডাক্তার পিল্লাই বলেন : তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রঙিলার প্রতি চয়ন আকৃষ্ট হয়েছিল কেন? শুধু তার অদ্ভুত চেহারার জন্যই? রঙিলাই বা তাকে প্রত্যাখ্যান করে কোতোয়ারকে বরণ করে নিল কেন? কিন্তু সে মীমাংসা আপাততঃ বন্ধ থাক। নটা বাজলো। আমাকে এবার বের হতে হবে। যাব পাশের একটা গাঁয়ে ভ্যান নিয়ে। যাবেন?

: কাবোঙ্গো অথবা কারাংমেটায়?

ডাক্তারসাহেব হেসে বললেন : না অন্য একটা গাঁয়ে।

বললুম : তবে একাই যান। কালরাত্রে ঘুম হয়নি। একটু ঘুমিয়ে নিই।

ডাক্তার বাবু টেবিল থেকে একখানা বই এগিয়ে দিয়ে বলেন : ঘুম না এলে এ বইখানা পড়তে পারেন! বেশ ইণ্টারেষ্টিং।

বইখানার নাম 'সাইকোলজিক্যাল এ্যাবনর্মালিটিস্ এমংস্ট এ্যাবরিজিনালস্!'

বইটা নিয়ে সবে শুরু করতে যাব, ঘরে এলেন মিসেস পিল্লাই। রান্নাঘর থেকে সরাসরি আসছেন বোঝা যায়। হাতে তাঁর স্টেনলেস স্টিলের একটা ছাতা। কালরাত্রের ব্যাপারে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। মিসেস পিল্লাই কিন্তু সেদিক দিয়েই গেলেন না। হাসি মুখেই বললেন : কি ? থার্ড এডিসন এক কাপ হবে নাকি এবার ?

আমি ক্যাম্প চেয়ারটা ওঁর দিকে ঠেলে দিয়ে কপট বিস্ময় প্রকাশ করে বলি : থার্ড এডিসন ? আমি তো প্রথম সংস্করণের জন্য একটা আবেদন পেশ করব ভাবছিলাম।

শর্মিলা দেবীর তরফে বিস্ময় প্রকাশের মধ্যে কপটতা ছিল না। বলেন : আপনি তো সাংঘাতিক লোক। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এক কাপ, ব্রেকফাস্টের সঙ্গে এককাপ—একুনে দু-কাপ ইতিপূর্বেই শেষ করেননি ?

: আমি যখন নিরস্ত্র, আর আপনার হাতে হাতিয়ার তখন আপনার যুক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি ?

: মানে ? আপনি বলতে চান সকাল থেকে দু-কাপ কফি খান নি ?

: ও হরি ! আপনি কফির কথা বলছেন। আমি দুঃখিত। আমি চায়ের কথা ভাবছিলাম। সকাল থেকে চায়ের নেশাটা ছোটেনি কিনা !

: সে কথা বললেই হত। আপনি তো আর শর্বরীর জন্যে নামহাদা খাটতে আসেননি। তাহলে নতুন জামাইয়ের মতো অত লজ্জা কেন ? চায়ের তেষ্টায় কফি গিলে মরছেন কি জন্যে ?

বুঝলাম কালরাত্রের গল্প তাহলে আরও একজন শুনেছেন। সে কথার কিন্তু ইঙ্গিত দিলাম না। বলি : মাদ্রাজী বাড়িতে চায়ের ব্যবস্থা আছে কিনা সেটাই যে বুঝে উঠতে পারছিলাম না এতক্ষণ।

: আপনি ভুলে গেছেন এটা গোটা মাদ্রাজী বাড়ি নয়। অর্ধেক তার রচিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী ! আপনি লক্ষ্য করে দেখেননি আপনাদের সঙ্গেই আমি যে পানীয়টি গ্রহণ করেছি তার রঙ মালকোর মতো নয়, মণ্ডিলা বেলেসার মতো।

একই প্রসঙ্গ দ্বিতীয়বার উত্থাপন করায় বুঝলাম মিসেস পিল্লাই চাইছেন কালরাত্রের গল্পটার বিষয়ে আলাপটা মোড় ফিরুক। কারণটা আন্দাজ করতে পারি না। আমার অনুমান সত্য কিনা বুঝবার জন্যে সে পথেই একপা

বাড়িয়ে দিয়ে বলি : না, তা অবশ্য লক্ষ্য করিনি। আমি বুঝতে পারিনি আপনিও চয়ন শিরদারের দলে। কফি-কালো মালকোকে ছেড়ে সোনালী বেলোসার জন্যে লামহাদা খাটতে ছুটবেন।

শর্মিলা দেবী বল্লেন : সেখানেও ভুল হল আপনার। চয়ন শিরদারকে ভুল বুঝেছেন আপনি।

: ভুল বুঝেছি ? কেমন করে ?

: বলছি ; কিন্তু তার আগে চায়ের জলটা বসিয়ে দিয়ে আসি।

চায়ের জলটা বসিয়ে দিয়ে উনি যখন ফিরে এলেন তখন আমি কোন প্রশ্ন না করে জিজ্ঞাসু নেত্রে শুধু তাকালাম ওঁর দিকে। বললেন : আমি কিন্তু এই সুযোগে আপনাকে অন্য একটা কথা বলে নিতে চাই।

: বলুন।

: সত্যি কথা বলতে কি, কথাটা আপনাকে বলা শোভন হবে কিনা তাই এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

চুপ করেন উনি। হয়তো জবাবের প্রত্যাশায়। কিন্তু কি বলি ? সে কথাই বললুম : আপনি কি বিষয়ে কথা বলতে চান, সঙ্কোচই বা কিসের তা না জেনে কেমন করে বলি ?

: বিষয়টা আপনার বন্ধুর সম্বন্ধে আর সঙ্কোচটা স্বল্প পরিচয়ের।

আমার দুটো প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন উনি এক নিঃশ্বাসে। তবু আমার কথা ফুটলো না। সঙ্কোচটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলেন : ভাবছিলাম আপনার পক্ষে মনে করা স্বাভাবিক, এত অল্প পরিচয়ে এত ঘনিষ্ট কথা কেন বলতে চাইছি আমি। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, যে সমস্যার মধ্যে আমি পড়েছি তার সম্বন্ধে আলোচনা করার মতো মানুষ আমার কাছে পিঠে নেই। আপনি বাঙ্গালী, ডাক্তারবাবুর ঘনিষ্ঠ না হলেও বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী—তাই মনে হচ্ছে আপনার পরামর্শ নিতে সঙ্কোচ করা আমার পক্ষে বোকামিই হবে।

আমি গাঢ়স্বরে বলি : শর্মিলা দেবী, আপনি আমাকে অসঙ্কোচে সব কথা বলতে পারেন। আমার ছোটবোন থাকলে তাকে যেভাবে পরামর্শ দিতাম, আপনাকেও তাই দেব।

শর্মিলা দেবী একটু ভেবে নিয়ে বলেন : আপনি কি ডাক্তারবাবুর পূর্বকথা সব জানেন ?

: ওঁর বাবা একজন বড় সার্জেন ছিলেন, আপনার শাশুড়ী বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে, ডাক্তারসাহেব প্রথমে শান্তিনিকেতনে এবং পরে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে পড়েন এটুকুই মাত্র জানি।

: আমাদের বিয়েতে ওঁর বাবার সম্মতি ছিল না, তা জানতেন না?

: না।

: তাহলে একটু গোড়া থেকে বলতে হবে।

ডাক্তার পিল্লাইয়ের সঙ্গে শর্মিলা দেবীর প্রথম আলাপ শান্তিনিকেতনে। শর্মিলা আর্টসের ছাত্রী, পিল্লাই বিজ্ঞানের। তবু ইণ্টারমিডিয়েটে বাংলা-ইংরাজির যুক্ত ক্লাসে ওঁরা একসাথে লেকচার শুনেছেন। গড়ে উঠেছে বন্ধুত্ব। পিল্লাই আই-এস-সি পাশ করে কলকাতায় এলেন—শর্মিলা রয়ে গেলেন সেখানেই। ছাড়াছাড়ি হওয়াতেই প্রথমে দুজনে উপলব্ধি করতে পারলেন যে বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝা যায় তার চেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হয়েছেন ওঁরা। ডাক-বিভাগের আয় বাড়ল। কাটলো আরও দু-বছর। বি এ পাশ করে শর্মিলা এলেন কলকাতায়। দেখা হত কফি হাউসে। তারপর যা হয়ে থাকে। দুজনেই অনুভব করলেন কফি হাউসে বড় ভীড়। রমানাথন বলতেন: কোন নিরালা চায়ের দোকানে যাওয়া যাক বরং। শর্মিলা জবাব দিতেন: তার চেয়ে আমাদের বাড়িতে চল, কফিই খাওয়াব তোমাকে। কিন্তু আসলে তো ওঁরা কফি-চায়ের প্রত্যাশী নন—তাই সমাধান হত না সমস্যার! আসলে ওঁরা যে খুঁজছেন একটি দুর্লভ জিনিস, নির্জনতা, নাগরিক সভ্যতায় যা নাকি দুষ্প্রাপ্য। প্রায় একই সঙ্গে দুজনে আবিষ্কার করলেন একটা সত্য—ভীড়ের এ্যাণ্টোনিম হচ্ছে 'নীড়'! একটা নীড় না বাঁধতে পারলে এ ভীড়ের হাত থেকে মুক্তি নেই। রমানাথন শর্মিলার মায়ের কাছে প্রস্তাবটি পেশ করলেন। শর্মিলার বাবা নেই। মা সম্মতি দিলেন, কিন্তু গোল বাধল সার্জেন সাহেবকে নিয়ে। তিনি আপত্তি করলেন শর্মিলা বাঙ্গালী বলে। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও যুক্তিটা প্রবল। তিনি নিজেও একটি বাঙ্গালী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, ভালবেসে। কিন্তু তাঁর দাম্পত্যজীবন নাকি সুখের হয় নি। আর সার্জেন-সাহেবের মত তাঁদের বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতার কারণ রমানাথনের মা মাদ্রাজী নন! যে ভুল তিনি করেছেন, সেই ভুল ছেলেকে করতে দেবেন না। এই তাঁর পণ।

বাপের অমতেই বিবাহ করলেন রমানাথন। থিসিস্ পেপার প্রায় তৈরি!

ডক্টরেট নিয়ে বিলেত যাবেন সব ঠিক্। সব ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসতে হল। যা হয় একটা রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে অবিলম্বে। শর্মিলা দেবী বারে বারে আপত্তি করেছিলেন। সংসারের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন যতদিন না থিসিসটা তৈরি হয়। কিন্তু রমানাথন কর্ণপাত করেননি। চাকরি নিয়ে চলে এলেন দণ্ডকারণ্যে। এই পটভূমিকা সংক্ষেপে সেরে শর্মিলা দেবী বললেন : ওঁর যিনি অধ্যাপক, যাঁর তত্ত্বাবধানে উনি রিসার্চ করছিলেন, তাঁর ধারণা ওঁর অসমাপ্ত গবেষণার প্রচণ্ড সম্ভাবনা আছে। শুধু ডিগ্রি নয়, একটা মৌলিক গবেষণার অধিকারী হতে পারতেন পিল্লাই। গত চার বছর ধরে তিনি ক্রমাগত লিখছেন ওঁকে ফিরে যেতে। অসমাপ্ত কাজটা শেষ করতে! গত সপ্তাহে তিনি লিখেছেন, দাঁড়ান দেখাই আপনাকে—

চিঠিখানা নিয়ে এলেন। তার প্রতি ছত্রে ছাত্রের প্রতি অধ্যাপকের অন্ধ আবেগ অনুভব করা যায়। বৃদ্ধ অধ্যাপক ব্যক্তিগত পত্রে শেষবারের মতো অনুরোধ করেছেন। লিখেছেন, তিনি বে-আইনী কাজ করেছেন, জ্ঞাতসারে। রমানাথনের অসমাপ্ত কাগজ চার বছর ধরে গোপন রাখার কোন অধিকার তাঁর নেই! তবু তিনি প্রাণধরে সে কাগজ কোন উত্তরসূরীকেও দিতে পারেননি। লিখেছেন, তাঁর নিজের চাকরির মেয়াদও শেষ হয়ে এসেছে। তিনি যাবার আগে দেখে যেতে চান রমানাথন আবার ফিরে গেছে তার আরব্ধ কাজ শেষ করতে। রমানাথনের রেকর্ড মার্ক তাকে সাহায্য করবে এ স্কলারসিপ দ্বিতীয়বার লাভ করতে। তিনি সে ব্যবস্থা করবেন। রমানাথনের মুখ চেয়ে যে কাগজ এতদিন লুকিয়ে রেখেছেন তিনি, এই শেষ সুযোগ যদি সে না নেয়, তাহলে বিজ্ঞানের মুখ চেয়ে তা এবার অন্য কোন রিসার্চ-স্কলারকে দেওয়ার সময় হয়েছে।

চিঠিখানা পড়ে ফেরত দিলাম শর্মিলা দেবীর হাতে, বলি : ডাক্তারসাহেব কি বলেন ?

: ওর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ও যখন যা ধরে তার মধ্যেই ডুবে যায়। আর কোন কিছুর কথা তখন ওর খেয়াল থাকে না। একদিন এই রিসার্চের কাগজগুলো বাঁচাতে ও নিজের একখানা হাত কেটে ফেলতে পারত। যে মুহূর্তে স্থির করল আমাকে বিয়ে করবে সেই মুহূর্তেই ওর সারা মন অধিকার করলাম আমি। কাগজগুলো তখন ছেঁড়া-কাগজের ঝুলিতেই গেল,

না ওজনদরে বিক্রি করে দেওয়া হল তার খোঁজও করেনি। তখন পাগলের মত ছোটাছুটি করেছে রোজগারের সন্ধানে। এখন ওর আর্থিক অসচ্ছলতা নেই। দণ্ডকারণ্যে ইচ্ছে থাকলেও টাকা খরচ করা যায় না। চার বছরে যা জমেছে তাতে অনায়াসে এ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রিসার্চ-ওয়ার্কে যোগ দিতে পারে এখন।

: তাহলে আর আপত্তি কি?

: ঐ যে বললাম। ওর মাথায় ঢুকেছে এখন অন্য এক চিন্তা। ও এখন রিসার্চের কথাও ভাবে না, আমার কথাও নয়, ও ডুবে আছে নতুন নেশায়।

: কি সেটা?

: চয়নকে ভাল করে তুলতে হবে। চয়নের বিয়ে দিতে হবে। উইচ-ক্রাফট ভার্সেস চিকিৎসা-বিজ্ঞান। লড়াইয়ে নেমেছে ও। আর কোন কিছু ওর সামনে নেই।

অবাক হয়ে গেলাম শুনে, বলি: বলেন কি? এতদূর?

: দেখলেন না কালরাত্রে? চয়নের সমস্যার বিষয়ে একটা নূতন ক্লু পাওয়া মাত্র আমাকে কেমন ধমকে তাড়িয়ে দিল ঘর থেকে?

শর্মিলা দেবীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি বৃথাই লজ্জা পেয়েছি কালরাত্রে। স্বামীর রূঢ় ব্যবহারে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হননি মিসেস পিল্লাই। বরং, হ্যাঁ ঠিকই বলছি, কেমন যেন গর্ববোধ করেছেন তিনি।

শিল্পী, সাধক, লেখক বৈজ্ঞানিকদের প্রতি মেয়ে-মনের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। যারা সাবধানী পথিক তারা তাদের ভালবেসেই ক্ষান্ত হয়, তাদের সঙ্গে নীড় রচনা করে না। কিন্তু একজাতের মেয়ে আছে যারা আবার ওদের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে নেবার দুঃসাহসী খেলায় বেপরোয়া। ওরা সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত বলেই তাদের গর্ব। শর্মিলা দেবী হচ্ছেন সেই জাতের মেয়ে। তাঁর স্বামী যে একজন একনিষ্ঠ সাধক এটাই ওঁর আত্মতৃপ্তির মূলধন। সে একনিষ্ঠ সাধনার মূল্য মেটাতে যদি খেয়ালী মানুষটা স্বল্পপরিচিতের সামনে স্ত্রীকে অপমান করেই বসে তবে সে অপমানও কি গৌরবের নয়?

বললুম: কিন্তু আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে?

: ওকে বোঝাতে হবে—এসব ছেলেমানুষি ছেড়ে দিয়ে ও যাতে ফিরে যায়। ওর রিসার্চ-ওয়ার্কে যাতে আবার যোগ দেয়।

একটু চুপ করে ভাবি। তারপর বলি: দেখুন শর্মিলা দেবী আপনি আমার চেয়ে ডাক্তারসাহেবকে বেশী ভাল করে চেনেন। স্বল্প পরিচয়ে আমি যেটুকু বুঝেছি সেটুকু আপনার অন্তত বোঝা উচিত। আমার বিশ্বাস আমার মৌখিক অনুরোধে কোন কাজ হবে না। ছেলেমানুষিই বলুন, আর পাগলামিই বলুন, চয়নের একটা এস্পার-ওস্পার না দেখে তিনি মাঝপথে রণে ভঙ্গ দিয়ে সরে দাঁড়াতে রাজি হবেন না।

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিসেস পিল্লাইয়ের। হাসলেন অদ্ভুত ভাবে। সে হাসি বেদনার, সে হাসি সার্থকতার। শর্মিলা দেবী যে রমানাথনকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন সে রমানাথন স্বাভাবিক নয়। সে ব্যতিক্রম। আর ঐ ব্যতিক্রম টুকুকেই তিনি ভালবাসেন। মনে হল শর্মিলা দেবীর মধ্যে দুটি ব্যক্তিসত্তা যেন একসঙ্গে রয়েছে। এক শর্মিলা প্র্যা গ ম্যা টি ক—সে শাড়ি-গাড়ি-বাড়ির প্রত্যাশী, সে স্বল্প-পরিচিত স্বামীর বন্ধুর কাছে ছুটে আসে সাহায্য চাইতে—কেমন করে স্বামীকে সাধারণ স্বাভাবিক পথে নিয়ে আসা যায়! আর এক শর্মিলা আইডিয়ালিস্ট—সে তার প্রেমিকের সাধনার মূল্য মেটাতে সব বঞ্চনা সহ্য করতে রাজি। ত্যাগের মহিমায় সে মহান হবার ব্রতে দীক্ষা নিয়েছে।

: চয়ন কি কোনদিন ভাল হয়ে উঠবে? মুক্তি পাবেন উনি?

: তা আমি কেমন করে বলব বলুন।

: আচ্ছা পাগলরা অনেকদিন বাঁচে, নয়?

হেসে বলি: চয়নের মৃত্যু কামনা করছেন আপনি।

কোন সঙ্কোচ নেই এ কথাতেও। অম্লানবদনে উনি স্বীকার করেন: করছি। সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেছি আমি চয়নের মৃত্যু কামনা করি। পাগল হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে কি মৃত্যু ভাল নয়? চয়নও মরে বাঁচে, ডাক্তারসাহেবও মুক্তি পান। আর বাঁচি আমরাও। আমি আর খুকু!

মনে মনে হাসি—মানুষ কী স্বার্থপর। মিসেস পিল্লাই জীবনে প্রতিষ্ঠা চান—তাই তিনি মৃত্যু কামনা করছেন নগণ্য চয়ন শিরদারের, যে চয়ন শিরদারের জীবনের বিনিময়ে তার মা অম্লানবদনে প্রাণ-হরণ করতে চেয়েছিল নগণ্যতর দুটো শুয়োর ছানার!

পরের দিন ফিরে এলাম নারানপুর থেকে। মৌলানাসাহেব পারালকোট থেকে ফেরার পথে তুলে নিয়েছিলেন আমাকে। এই দুটো দিন সময় ও সুযোগমত শুধু চয়ন শিরদারের কথা শুনেছি। চয়ন শিরদার, মালকো, রঙিলা আখালী কোণ্ডার জগতে বিচরণ করেছি। শুধু ডাক্তার পিল্লাইয়ের হাত ধরে নয়, মিসেস পিল্লাইয়ের কাছ থেকেও সংগ্রহ করেছি অনেক খণ্ড কাহিনী। রহস্যের কিনারা করা যায়নি। দেখলাম ওঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই মেতে আছেন এই নিয়ে। যদিও অস্বীকার করলেন শর্মিলা দেবী এ অভিযোগ। গল্পটার কোন অংশ কখন কার কাছে শুনেছি আজ আর তা মনে নেই। এবার তাই নিজের ভাষাতেই শুরু করতে হচ্ছে :

চৈতদাণ্ডার উৎসবের মাসখানেক পরের কথা। কাবোঙ্গা গাঁয়ের কোণ্ডা সদলবলে বার হল 'পুঙ্গার মিছানায়'। কোণ্ডা হচ্ছে চয়নের বাপ। ওরা যাবে কারাংমেটার গাইতা আয়েতু গোণ্ডের বাড়ি। চৈত-দাণ্ডার উৎসবের পরেই চয়ন তার মাকে বলেছে আয়েতুর মেয়েকে সে বিয়ে করতে চায়। চয়নের মা বলেছে কোণ্ডাকে। বুড়ো-বুড়ি দুজনেই খুশী হয়েছিল চয়নের এ প্রস্তাবে। আয়েতু ওদের আকোমামা শ্রেণীর, সে একটা গাঁয়ের সর্দার। এ বিবাহ সবদিক থেকেই কাম্য। কোণ্ডা কথাটা প্রথমে গিয়ে জানালো নিজ গ্রামের গাইতার কাছে, গাদরুর কাছে। কাবোঙ্গা গাঁয়ের গাইতা গুণিয়া আর কোণ্ডা তিনজনে পরামর্শ করল। সবার আগে সিয়ারি পাতার ঠোঙায় করে একপাত্র মধুক নিবেদন করা হল পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে। সকলে সাগ্রহে লক্ষ্য করতে থাকে। না মহুয়ার ঠোঙাটা হাওয়ায় উল্টে গেল না। তিল তিল করে ঠোঙা থেকে মধুকরস বেরিয়ে এল মাটিতে। মাতা ধরিত্রী—মাটি-মাল—শোষণ করে নিলেন অর্ঘ্য। অর্থাৎ এ প্রস্তাব অনুমোদন করলেন পূর্বপুরুষগণ। বিবাহে কোন বাধা নেই। ফলে, এক চৈতালী প্রভাতে গাদরু গুণিয়া আর বিণ্ডোকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল কোণ্ডা। বিণ্ডো হচ্ছে চয়নের বন্ধু, কাবোঙ্গার কোতোয়ার। ঘটুলের বাইরে গুরুজনদের কাছে তার পরিচয় বিণ্ডো -- কোতোয়ার নয়। যেমন ঘটুল-বন্ধুরা ওকে ভুলেও 'বিণ্ডো' নামে ডাকবে না; তাদের কাছে সে কোতোয়ার। ওরা চারজনে কারাংমেটায় চলেছে পুঙ্গার মিছানায়। 'পুঙ্গার' মানে ফুল, আর 'মিছানা' শব্দের অর্থ চয়ন, আহরণ।

সুতরাং 'পুঙ্গার মিছানা' মানে পুষ্প আহরণ। বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে কন্যাপক্ষের দ্বারস্থ হওয়া পুষ্প চয়নের প্রয়াস ছাড়া আর কি ?

ওদের ভাগ্য ভাল। অমঙ্গলসূচক কিছু ওদের নজরে পড়ল না। কাক, সাপ, ময়ূর, গিরগিটির দল ত্রিসীমানায় নেই। মনে মনে আশ্বস্ত হল কোণ্ডা। বিবাহ সুখের হবে নিশ্চিত। পূর্বপুরুষেরা পথ থেকে সব কিছু অযাত্রাকে সরিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কোণ্ডা লক্ষ্য করেছে ওরা যখন গাঁয়ের বাইরের তেঁতুলতলা দিয়ে আসছিল তখন তেঁতুল গাছের মগডালে বসে একটা উশীর পাখী 'উইং উইং' করে ডাকছিল। পাখীটা ছিল পথের বাঁদিকে। ফলে যাত্রা শুভ।

বেলা দ্বিপ্রহরে ওরা এসে পৌছালো কারাংমেটায়। আয়েতু বাড়ি ছিল না। আয়েতুর মেয়ে রঙিলা ছিল বাডিতে। আপ্যায়ন করে বসতে দিল অতিথিদের। ঘরের ভিতর থেকে বার করে আনল 'কাটুল।' বন্যলতায় বোনা চারপায়া জলচৌকি। কোণ্ডা গাদরু আর গুণিয়া বসল জুত করে। বিণ্ডো বয়োঃজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে এক আসনে বসতে পারে না। ভিনগাঁয়ে এসে তাকে কাবোঙ্গার শিষ্টাচারের পবিচয় দিতে হবে। দাওয়ার উপর ছিল একখানা মাডাং ঘাসের বোনা মাসনি। তাই পেতে বসল সে।

কোণ্ডা বলে : তুই আয়েতুর বেটি ?

মেয়েটি সলজ্জে নাথা নেডে বললে : হ্যাঁ।

অবাক হয়ে গেল কোণ্ডা। এমন মেয়ে মুরিয়া মায়ের কোলে আসে নাকি ? শহব থেকে মাডাই দেখতে আসে যেসব সাহেব তাদের ঘরের মেয়েদের মতো দেখতে। গায়ের রঙ সাদা, মাথায় চুলও কটা, চোখের তারা বেডালের মতো! গা-টা ছমছম করে ওঠে কোণ্ডার। এ কেমন মেয়ে ? এমন মেয়েকে পছন্দ কবে বসেছে তার চয়ন ? যে চয়ন কখনও কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকায় না ? মেয়েটি 'ইয়ে' নয়তো ? ভাবী পুত্রবধূ সম্বন্ধে 'পাংনাহিন' কথাটা মনে মনেও সে ভাবতে পারলে না।

অবাক হয়েছিল বিণ্ডোও। দিনের আলোয় মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছিল—আশ্চর্য, কেমন করে ঐ মেয়েটিকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করেছিল সেদিন ? রাত্রের অন্ধকারে পূর্ণযৌবনা একটি নারীর যৌবন ছাড়া আর কিছু নজরে পড়েনি বলেই ?

পাঁদক বলে : তোর নাম কি ?

: রঙিলা।

: তোর বাপকে খবর দে। বল্ কাবোঙ্গা থেকে গাইতা আর গুণিয়া এসেছে।

মেয়েটি ভিতরে চলে গেল। কোণ্ডা তখন বিণ্ডোর দিকে ফিরে চুপি চুপি বলে : এই মেয়েই তো ?

চোখ দুটো পিট্ পিট্ করে বিণ্ডো বলে : হয় !

আড়ালে অপেক্ষা করছিল মাল্‌কো আর তার মা আখালী। আর আয়েতুর বুড়ি পিসি—কিরিংগো। বুড়ি ফিস্ ফিস্ করে বলে : ওরা কি পুঙ্গার মিছানায় এসেছে নাকি রে নাতিন ?

ঠোঁট উল্‌টিয়ে রঙিলা বলে : আমি কি জানি ? টাপ্পিকে ওরা ডাকছে।

কিরিংগো রঙিলার থুতনিতে নাড়া দিয়ে একটা অশ্লীল গালাগাল ছাড়ে। গালটা আদরের, যদিও কানে আঙুল দিতে হয়! বলে : ওলো আর ন্যাকা সাজিস না। বুঝেছিস ঠিকই। তোর জন্যে ওরা মিছানায় এসেছে আর তুই জানিস না ? কিন্তু কে ওরা ? আসছে কোথা থেকে ?

: কাবোঙ্গা থেকে। কাবোঙ্গার গুণিয়া আর গাইতা ওরা।

কাবোঙ্গা! নামটা শুনেই চমকে ওঠে মাল্‌কো। ওরা কাবোঙ্গা থেকে আসছে ? সেখানেই তো বাস করে সেই আশ্চর্য ছেলেটি, যে বেরিয়ে এসেছিল ঘটুল থেকে। এরা নিশ্চয় চয়নকে চেনে। একই গাঁয়ের লোক, চিনবে না ? জিজ্ঞাসা করলে ওরা বলতে পারেনা—চয়ন কেমন আছে, সে এখন কি করে, কি ভাবে—ভিন গাঁয়ের একটি মেয়ের কথা তার এখনও মনে আছে কিনা। হ্যাঁ, ঠিক তো—কোণায় ঐতো বসে আছে সেই ছেলেটি যে "মাকৃস্থ"র ধাঁধাটা জিজ্ঞাসা করেছিল। শুধু তাই নয়—রঙিলাকে ঐ ছেলেটির কণ্ঠলগ্নাও হতে দেখেছিল সে রাত্রে। ঐ ছেলেটিই তাহলে পাত্র। কিন্তু কী নির্লজ্জ ছেলেটা। নিজেই এসেছে পুঙ্গার-মিছানায়! এ তো নিয়ম নয়। তা যে যাই হোক ঐ ছেলেটির সঙ্গে একবার নির্জনে দেখা করা যায়না ? জানা যায়না ওর কাছ থেকে চয়নের কথা ?

মাল্‌কোর চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। বুড়ি কিড়িংগো ওকে ঠেলা মারছে : যা যা, শিগ্‌গির ডেকে নিয়ে আয় তোর টাপ্পিকে।

মাল্‌কো ছুটলো মাঠপানে। দিদির একটা বিয়ে হল তাহলে!

আয়েতু এলে দুপক্ষের সৌজন্য বিনিময় হল। কোণ্ডা যে মধুকের পাত্রটা এনেছিল উপহারস্বরূপ সেটা দিল আয়েতুর হাতে। আয়েতু আন্দাজ করেছে ব্যাপারটা। তবু অনাসক্তের ভাব দেখিয়ে বলে: তারপর এদিকে কি মনে করে?

কোণ্ডা বললে: বিশেষ কিছুই নয়, এ পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম আমরা। হঠাৎ তোমার ঘর থেকে মিষ্টি একটা ফুলের গন্ধ পেলাম পথ থেকে। ভাবছি ফুলটা তুলে নিয়ে গেলে কেমন হয়।

আয়েতু মুখ টিপে হেসে বলে: আমিও সেই রকম আন্দাজ করেছি। এই তো দুনিয়ার নিয়ম ভাই। একজন ফুলগাছ পোঁতে, জল দেয়, সেবা যত্ন করে—আর যেই সে গাছে কুঁড়ি দেখা দেয় অমনি ছুটে আসে প্রতিবেশী। ফুল তুলে নিয়ে চলে যায়।

কোণ্ডা বললে: দুনিয়াদারির এ দস্তুরীর মধ্যে নতুন কথা কি আছে? তুমি তো আমাদের আকোমামা শ্রেণীর। তোমার ঘরনীটি কি একদিন আমাদের গোত্রেই ফুল হয়ে ফোটেনি? লুটেরার মতো তাকে লুট করে আননি আমাদের গোত্র থেকে? এ শিক্ষা যে তোমার কাছেই শিখেছি ভাই।

মুখের মতো জবাব। হাহা করে হেসে ওঠে সবাই। এ আলাপচারি শুনে মনে হতে পারে দুজনেই শিক্ষিত, ভাষার উপর দুই বৈবাহিকেরই যথেষ্ট দখল আছে। আসলে তা কিন্তু নয়। পুঙ্গার মিছানার এ বাঁধি গৎ বহুদিন থেকেই চলে আসছে। নতুন জামাইয়ের হাতে মাকু দিয়ে তাকে জীববিশেষের স্বর অনুকরণ করতে যিনি অনুরোধ করেন তিনি কবি-প্রতিভাশালিনী না হলেও যেমন ছড়া কাটেন এরাও তেমনি অনায়াসে বাঁধি-গৎ গেয়ে গেল। অবশ্য স্বীকার করতে হবে আদি রচয়িতার নিশ্চয় ছিল কাব্যজ্ঞান।*

---

* মনে আছে এখানেও আমার সঙ্গে ডাক্তারসাহেবের কিছু অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা হয়েছিল।

আমি বললুম: আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ওদের ভাষায় "আপনি-তুমি"র ভেদ আছে?

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, না নেই। কিন্তু বঙ্গানুবাদের সময় সে ভেদ রেখেই বলছি আমি। ইংরাজী ভাষায় মাস্টার ছাত্রকে বলে "য়ু", ছাত্রও শিক্ষককে বলে "য়ু"। আমরা অনুবাদ করবার সময় একটাকে তুমি, আর একটাকে আপনি বলি। মুরিয়াদের ভাষায় মধ্যম-পুরুষে "তুই"টাই বহুল প্রচলিত—কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে বাচনভঙ্গিতে যে শ্রদ্ধা সম্মান প্রকাশ পায় তাতে সে "তুই"কে বাঙ্গালায় কখনও "তুমি" কখনও "আপনি" বলতে ইচ্ছে করে।

যাই হোক আয়েতু এবার কাব্য ছেড়ে কাজের কথায় নামে। আগন্তুকদল যথারীতি পূর্বপুরুষদের সিয়ারি পাতায় মধুক উৎসর্গ করেছে কিনা—তার ফলাফল কি হয়েছে—পথে কি কি সুলক্ষণ অথবা দুর্লক্ষণ দেখা গেছে তার সন্ধান-সুলুক জেনে নেয়। সব শুনে সে রাজি হয়, বলে: আমার মেয়েকে দেখেছ তো?

: দেখেছি বই কি। সেই তো কাটুল পেতে বসতে দিল আমাদের। কিন্তু একটা কথা গাইতা, তোমার গায়ের রঙ তো ভুঁইযের মতো, তোমার গৃহিনীটিও আমাদের গোত্রের, তাহলে…

বাধা দিয়ে আয়েতু বললে: হ্যাঁ, সব কথাই খুলে বলা দরকার। আমার মেয়েকে তোমরা আদর করে ঘরে নিয়ে যেতে চাইছ। তাই সব কথা তোমাদের জানাতে হবে। সব শুনে, সব জেনে যদি আমার মেয়েকে ঘরে নিতে চাও তবেই আমি সম্মতি দেব।

ঘরের ভিতর দিকের দেওয়ালে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে রঙিলা, মাল্‌কো, তাদের মা আর বুড়ি কিরিংগো। রঙিলার জন্মবৃত্তান্ত আজ ওরা নতুন শুনছে না। সে কাহিনী ওদের জানা। রঙিলা নিজেও জানতো যে সে আয়েতুর নিজের মেয়ে নয়, পালিতা কন্যা। ওরা শুধু জানতে চায় সব কথা শুনে পাত্রপক্ষ কি বলে।

আদ্যপ্রান্ত সব কথা শুনে কোণ্ডা বললে: এত কথা আমি জানতাম না। চৈত-দাণ্ডারে তোমাদের গ্রাম এবার এসেছিল আমাদের ঘটুলে। সেখানেই আমার ছেলে তোমার মেয়েকে প্রথম দেখে। পরে তার মাকে বলে তাকে সে বিয়ে করতে চায়। তাই আমি এসেছিলাম। এখন যা শুনছি তাতে…

কাবোঙ্গার গাইতা গাদরু বাধা দিয়ে বলে ওঠে: কিন্তু এখন যা শুনছ তাতেই বা তোমার মত বদলাচ্ছে কেন? তোমার ছেলে এ মেয়েকে দেখেছে, পছন্দ হয়েছে তার। রঙিলা আয়েতুর নিজের মেয়ে না হলেও সে তাকে

: কিন্তু ওদের ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করলেই গল্পের মেজাজটা ঠিক ফুটে উঠবে না কি?

: আক্ষরিক অনুবাদ করলে আপনি কানে আঙুল দিয়ে উঠে পড়বেন। প্রতি কথার মাত্রায় ওরা যে খিস্তির লেজুর জোড়ে তার কাছে বাঙলার 'শ-কার', 'ব-কার' পূজার মন্ত্র। মানুষের দেহের অঙ্গবিশেষের কথা, জৈবিক বৃত্তির কথা এমন ভাষায় ওরা উল্লেখ করে যার বঙ্গানুবাদ চলে না। সুতরাং সে চেষ্টা না করাই ভাল।

কন্যার মতো পালন করেছে। কারাংমেটার মুরিয়া সমাজ তাকে মেনে নিয়েছে আয়েতুর মেয়ে বলেই। রঙিলা শুনেছি এ ঘটুলের বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিতা। তাহলে তোমার ভাবনা করার কি আছে?

কোণ্ডা বলে: বারে! ভাবনা করার নেই? আমাদের সমাজপতিদের জিজ্ঞাসা করতে হবেনা? ও তো আসলে মুরিয়া নয়। মুরিয়ার রক্ত তো ওর দেহে নেই।

: ও মুরিয়াই!—দৃঢ়স্বরে বল্লে গাদরু।

: কিন্তু সমাজ? কাবোঙ্গার পঞ্চায়েত?

গাদরুর অভিমানে লাগল। বললে: আমিই সমাজ! আমিই পঞ্চায়েত! তবে শোন বলি। অনেক বছর আগের কথা। আল্‌হোর গাঁয়ের নাম শুনেছ? আল্‌হোর ঘটুলে কুহ্‌রামি গোত্রের একটি চেলিকের সঙ্গে সগোত্র একটি মোটিয়ারীর গীর্দা-আতোর হয়। ওরা দুজনেই কুহ্‌রামি। দাদাভাই গোত্রের। বিবাহ অসম্ভব। ঘটুলের শিরদার ওদের দুজনকে বারে বারে সাবধান করে দিল, তবু তোমরা জান 'আতোরে' পড়লে মানুষ ছুঁচোর মতো কানা হয়ে যায়। ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করতে থাকে। শেষে শিরদার নিরুপায় হয়ে আল্‌হোরের গাইতার কাছে অভিযোগ আনল। পঞ্চায়েতের বিচার সভা বসল। ডেকে পাঠানো হল অপরাধী দুটি তরুণ-তরুণীকে। কিন্তু কোথায় তারা? খবর পেয়ে ওরা দুজনে ভেগে পড়েছে। খোঁজ খোঁজ। শেষে সন্ধান পাওয়া গেল হিরৃরি গাঁয়ে গিয়ে ওরা ঘর বেঁধেছে। হিরৃরির সমাজপতিরা সব শুনে ওদের একঘরে করল। গাঁয়ের বাইরে একটা ছাপরা তুলে ওরা দুজনে থাকত। মুরিয়া সমাজ তাদের বিবাহ স্বীকার করে নেয়নি। কোন মুরিয়া ওদের সাথে একসঙ্গে বসে খায়নি। গাঁয়ে শূয়োর বলি হলে ওদের প্রসাদী মাংস পাঠানো হয়নি। কোন উৎসবে ওদের নাচতে দেওয়া হয়নি। কালে ওদের একটি 'ভুলা-হুয়া' হয়েছিল। মেয়ে নয় ছেলে। ওরা দুজনে যখন মারা যায়, কোন মুরিয়া ওদের পোড়ায়নি। সেই ভুলা-হুয়া একাই বাপমায়ের সৎকার করেছিল। কিন্তু সেই ভুলা-হুয়াকে সমাজ ত্যাগ করেনি। যদিও সে আইন মাফিক অবৈধ সন্তান তবু তাকে স্বীকার করে নিয়েছিল সমাজ। যদিও তার বাপ-মা দুজনেই কুহ্‌রামি গোত্রের তবু তাকেও কুহ্‌রামি গোত্রের বলে ধরা হল। সে ছিল হিরৃরি গাঁয়ের ঘটুলের কোতোয়ার। মুরিয়া সমাজে সে বিয়েও করেছিল।

কোঙা বলে : কিন্তু তা কেমন করে হল ?

গাদরু গম্ভীর হয়ে বলে : হল এইজন্যে যে আমরা শহুরে হিন্দুদের মতো অসভ্য নই। বাপ-মায়ের অপরাধে আমরা বাপ-মাকেই শাস্তি দিই। সন্তান তো কোন পাপ করেনি। তাকে শাস্তি দেব কেন ?

আয়েতু বললে : ন্যায্য কথা। আমরা শহুরেদের মত অসভ্য নই !

কোঙার মনের সংশয়ও কেটে গেল এতে। বললে : বেশ আমি রাজি !

অস্ফুটে একটা গুঞ্জন উঠল ভিতরমহলে। বুড়ি কিরিংগো রঙিলার গালটা টিপে দিয়ে বললে : কি গো মেয়ে ? এত ফূর্তি কিসের ?—বলেই একটা অশ্লীল রসিকতা যোগ করল সাথে।

রঙিলা একছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। মালকো হি হি করে হেসে ওঠে : দিদিটা লজ্জা পেয়েছে !

আয়েতু বললে : তা হলে তোমার ছেলেকে একবার দেখতে হয়। শিকার করতে শিখেছে ? তীর ছুঁড়তে ?

হাহা করে হেসে ওঠে কোঙা। বলে আমার ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন ছেলে এ তল্লাটে নেই।

আয়েতু বললে : বটে ? কি নাম তোমার ছেলের ?

পুত্রগর্বে গম্ভীর হয়ে কোঙা বললে : আমার ছেলে সাধারণ চেলিক নয়, সে হচ্ছে কাবোঙ্গা ঘটুলের শিরদার। চয়ন শিরদার।

গাদরু ধমক দিয়ে ওঠে : কোঙা !

সন্তান ঘটুলে কোন পদে অধিষ্ঠিত বাপ-মায়ের তা জানাব কথা নয়। অর্থাৎ না জানাটাই নিয়ম। অবশ্য অধিকাংশ লোকেই তা জানে—স্বীকার করে না প্রকাশ্যে। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সেই কথাটাই বলে ফেলেছে কোঙা। তাই ধমক দিয়ে ওঠে গাদরু।

কিন্তু ঘরের মধ্যে ওটা কিসের শব্দ ? আয়েতু উঠে গেল ভিতর বাড়িতে। মালকোকে বুঝি কিছুতে কামড়েছে। দরজার ফাঁকে কান পেতে সে শুনছিল এতক্ষণ পুঙ্গার মিছানার কথোপকথন। হঠাৎ বসে পড়েছে মাথা ঘুরে। দু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে উবুড় হয়ে পড়েছে। দেওয়ালের ফাটলে সাপ-বিছে কিছু ছিল না কি ?

ডাক্তারবাবুর কাছে রঙিলায় জন্মবৃত্তান্তের কথা শুনে মনে পড়ল মুনিস্নাগাঁও গ্রামের সেই প্রকাণ্ড কৌয়া-ডোলের কথা। কোটা-মালকানগিরি সড়কের উপর ক্ষুদ্র গ্রাম মুনিস্নাগাঁও। পথের ধারে প্রকাণ্ড একটা খাড়া পাহাড়। আর তার মাথায় বিরাটাকার একটা পার্চিং-স্টোন। পাঁচ-সাত শ' মন ওজন হবে হয়তো। পাহাড়ের মাথায় চড়েছে কেমন করে ভাবলে অবাক লাগে। শুধু তাই নয় সেখানে বসে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে। মুনিস্নাগাঁওয়ের লোকেরা ঐ পাথরটার ভারি মজার নামকরণ করেছিল—কৌয়া-ডোল। ভাবখানা, যদি কাক বসে ঐ পাথরের উপর তাহলে তার ভারে পাথরটা দুলবে। আসলে কিন্তু বিশজন লোকে ঠেলেও পাথরটাকে এতটুকু নড়াতে পারে না। কে জানে কবে কেমন করে ঐ পাথরটা উঠে বসেছে ওখানে। কত সহস্র বছর ধরে অমনি ঝুঁকে পড়ে দেখছে নীচের দিকে তাই বা কে বলতে পারে? এই বন্যাসড়ক ধবে ত্রেতা যুগে যখন অত্রি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, স্বরভঙ্গের দল যাতায়াত করতেন তখনও কি কৌয়াডোল ছিল ওখানে? রাবণের অস্ত্রাঘাতে পক্ষীরাজ জটায়ু ঘুরতে ঘুরতে যে পাথরটার উপর আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন তারই কি আধুনিক নাম কৌয়াডোল? তারপর যুগ যুগ ধরে এই পথে গিয়েছে রাক্ষসসেনা, কপিসেনা, ক্রমে চোল হয়শোল রাজাদের সেনাবাহিনী। আজ ক'বছর ধরে ওর তলা দিয়ে যাচ্ছে ডজস্বার্বন, স্টেশন-ওয়াগন, জীপ, ট্রাক, ক্যাটারপিলার বুলডোজার। মানব সভ্যতার উত্থান পতনের প্রতি উদাসীন কৌয়া-ডোলের কিন্তু ধ্যান ভাঙ্গেনি। তারপর এলাম আমি। আমার আদেশে ঠিকাদার। ছোট ছোট এক সারি তাঁবু পড়ল পথের উপর। গড়ে উঠল ছাপরা। রাস্তায় বোল্ডার সাপ্লাইয়ের ঠিকা নিয়েছে ওরা। সহস্র বৎসরের উদাসীনতায় অভ্যস্ত কৌয়াডোল ভ্রূক্ষেপ করেও দেখল না আমার ঠিকাদারের দিকে। দেখল না তার হাতের লাল-লেবেল-আঁটা ছোট্ট কৌটাটির দিকে। প্রকাণ্ড ছায়া বিস্তার করে আশ্রয়দান করল আমার ঠিকাদারকে। তারপর একদিন প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে থর থর করে কেঁপে উঠল পাহাড়।

আর্তনাদ করে হুড়মুড়িয়ে গড়িয়ে পড়ল কৌয়াডোল পাহাড়ের নীচে। সহস্রাব্দির উদাসীন স্তব্ধতা দীর্ণ করে বুক ফাটানো হাহাকার করল কৌয়াডোল শেষবারের মতো। ছুটে এল পাথুরে কুলির দল ধারালো গাঁইতা হাতে। আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করে ফেলল কৌয়া-ডোলকে। শেষ হয়ে গেল কৌয়াডোলের ইতিকথা।

সভ্যজগতের প্রতি উদাসীন কারাংমেটা গাঁয়েরও সেই অবস্থা হয়েছিল প্রায় বিশ বছর আগে। দণ্ডকারণ্যের বাইরের যে জগত সে জগতে এসেছে শক-হুণদল, পাঠান-মোঘল, এসেছে ইংরাজ—তাতে কারাংমেটার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয়নি। বিংশ শতাব্দীর দু দুটো মহাযুদ্ধ তিলমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি কারাংমেটার জীবনযাত্রায়। উনিশ শ সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্ট তারিখটা সে গাঁয়ে সহস্রাব্দির আর যে কোন একটা দিনের মতো সূর্যোদয়ের পথ ধরে এসে সূর্যাস্তের পথে শেষ হয়েছে! এ হেন কারাংমেটায় এসে একদিন ছাউনি ফেলল একদল অদ্ভুত মানুষ। ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-বাচ্চার দল। সঙ্গে তাদের গোটা কয়েক টাট্টু ঘোড়া, ছাগল আর কুকুর। অদ্ভুত ফর্সা রঙ তাদের। নীল চোখ, পিঙ্গল চুল, টকটকে গায়ের রঙ। কোথা থেকে এল, কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না। আয়েতু তখনও গাঁয়ের গাইতা হয়নি। ওর কাকা বুড়ো গাইতা রেণো তখনও জীবিত। আয়েতুর বয়স তখন বছর ত্রিশেক—বিয়ে করেছে বছর পাঁচেক—ছেলেপিলে নেই। রেণো গাঁয়ের মানুষকে সাবধান হয়ে থাকতে বললে। চুপি চুপি জানালে—এরা জিপসি, যাযাবর। পাঁচ-দশ বছর বাদে বাদে ওরা এ পথে আসে। কেন আসে, কোথায় যায় কেউ জানে না। কিন্তু ওরা এলেই গাঁয়ের মানুষের জিনিষপত্র চুরি যায়। কারাংমেটার মানুষ মুরগী, শূয়ার, গরু মোষ সামলে রাতটা প্রায় জেগেই কাটাল। আয়েতুর বউ আখালী বলে: ওগো জান', ওদের একটা মেয়ের বাচ্চা হয়েছে, এই এ্যাত্তটুকুন! কী সুন্দর দেখতে তাকে।

আয়েতু বলে: দেখেছি; কিন্তু তাতে তোর কি?

আখালী লজ্জা পেয়ে বলে: না, তাই বলছিলাম।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে আয়েতুর। এতদিন বিয়ে হয়েছে ওদের—কোন সন্তান হয়নি আজও। ছোট ছেলেমেয়ে দেখলেই আখালী লোভাতুর দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখে—সুযোগ পেলেই বুকে চেপে ধরে; চুমায় চুমায় অস্থির করে

তোলে তাকে। আয়েতু অনেক পূজো দিয়েছে, অনেক মুরগী বলি দিয়েছে গুণিয়ার নির্দেশে—কিন্তু কিছুই হয়নি ফল। আথালীর তৃষিত মাতৃত্ব তৃপ্ত হয়নি।

সন্ধ্যাবেলায় আয়েতু বসেছিল বাড়ির সামনের আলগিতে। সামনেই উজ্জাওয়েতা উৎসব—অর্থাৎ ধানকাটার আগের রাত্রের আহেরিয়া উৎসব। বছরের সবচেয়ে বড় শিকার অভিযান। আয়েতু বসে বসে পাথরে শান দিয়ে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছিল তীরের ফলা। সূর্যের আলো নিভে যাওয়ার আগে দিনের শেষ কাজগুলো সেরে নিচ্ছে আথালী। শূয়োরগুলো খোঁয়াড়ে ঢুকেছে, মুরগীগুলো খাঁচায়। বাকি আছে উঁচু মাচাং ঘরে এবার ছাগল দুটোকে তুলে দেওয়া। তাহলে নিশ্চিন্ত। হঠাৎ পড়ন্ত রৌদ্রে দীর্ঘ ছায়া পড়ল যেন কার—সামনের উঠানে। আয়েতু মুখ তুলে দেখে একটি জিপসি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে। তার কোলে একটি সদ্যোজাত শিশু। মেয়েটির বয়স বছর পঁচিশেক, পরনে ঘাঘরা আর উড়ানি। সীমন্তে রূপোর একটা মস্ত ঝুমঝুমি—হাতে একসার কাঁচের চুড়ি। মেয়েটি হাত পা নেড়ে কি যেন বলছে। আয়েতু বুঝতে পারে না তার ভাষা। কিন্তু ভঙ্গিটা আন্দাজ করতে পারে। একবার মুখে একবার বুকে-পেটে হাত দিয়ে সে যা বলতে চাইছে তাতে বোঝা যায় সে ক্ষুধার্ত। আয়েতু নিঃশব্দে উঠে গেল ঘরের ভিতরে, নিয়ে এল মাণ্ডিয়া-ভরা শুকনো লাউয়ের পাত্রটা। ইঙ্গিতে আদেশ করলে মেয়েটিকে হাত পাততে। তরল খাদ্যটা সে ঢেলে দেবে। মেয়েটি রাজী হল না। না-য়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। নারানপুরের হাটে-বাজারে যাতায়াত ছিল আয়েতুর। সে আন্দাজ করলে মেয়েটি এ জাতীয় খাদ্যে অভ্যস্ত নয়। এবার সে নিয়ে এল একটা পাকা পেঁপে। আশ্চর্য, তাও নিল না মেয়েটি। বারবার বাচ্চাটাকে দেখায় আর বুকে করাঘাত করে। বুঝতে পারে না, সে কি বলতে চাইছে। আথালীও বেরিয়ে এসেছিল ঘর ছেড়ে। দাঁড়িয়ে দেখছিল মেয়েটার কাণ্ড। কেমন করে কে জানে সে বুঝতে পারে মেয়েটির বক্তব্য। হঠাৎ ছুটে এসে কেড়ে নিল বাচ্চাটাকে। দু হাতে চেপে ধরল তাকে নিজের নগ্ন বুকে। জিপসি মেয়েটি কোন আপত্তি করল না। ক্ষুধার্ত সে নয়, ক্ষুধার্ত তার শিশুকন্যাটি! মুরিয়ার ঘরে দুধ থাকে না। গরু ওরা পোষে; কিন্তু দুধ দোয় না। গরু-বলদ গাড়ি টানে, ক্ষেতে লাঙ্গল টানে, আর মাংস সরবরাহ করে। দুধ দেয় না।

আখালী বাচ্ছাটাকে নিয়ে গেল পাশের বাড়ি। মোরাঙ বউয়ের কাছে। মোরাঙ বউ সদ্যোজাত সন্তানের জননী। জিপসি মেয়েটিও গেল ওর পিছন পিছন। বাচ্ছাটাকে দুধ খাইয়ে ফেরত দিতে হাত কাঁপছিল আখালীর।

রাত্রে ঘুমন্ত আয়েতুকে আখালী বললে : ঐ বাচ্ছাটা• কখনও ওর মেয়ে নয়, বুঝলে? বাচ্ছাটার মা মরে গেছে।

ঘুমে জড়ানো চোখ না খুলেই আয়েতু বলে : কেমন করে বুঝলি?

: কী বোকা তুমি! যদি ওর মেয়েই হবে তবে ওর বুকে দুধ নেই কেন?

আয়েতু বলে : তা বটে।—পাশ ফিরে জুত করে শোয় ফের।

কিন্তু আখালীর চোখে ঘুম নেই। আবার খানিক পরে বলে :—শুনছ?

: কী?

: আচ্ছা ওর যখন মা নেই, তখন চাইলে বাচ্ছাটাকে দেবেনা আমায়?

আধো ঘুমের মধ্যে আযেতু বলে : তা দেবে।

: দেবে?—উৎসাহে উঠে বসে আখালী—তাহলে চল নিয়ে আসি।

এবার ঘুম ভেঙ্গে যায় আযেতুব। বলে : কি নিয়ে আসবি?

: কেন—ঐ বাচ্ছাটাকে। তুমি যে বললে চাইলে দিয়ে দেবে।

আয়েতু ধমক লাগায : দূর পাগলি। অতটুকু বাচ্ছাকে পুষবে কি করে? ও যে এখনও বুকেব দুধ খায়। তোর বুকে কি দুধ আছে? আর তাছাড়া—

কিন্তু সে 'তাছাডা' শুনবাব মতো মনের অবস্থা আখালীর নেই। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে। আযেতু বেচারি আব কী সান্তনা দেবে। ওব মাথায হাত বুলিযে দেয় ধীরে ধীরে। আবার কখন ঐ ভাবেই আযেতুব বাহুবন্ধনে অতৃপ্ত মাতৃত্বের বাসনা বুকে চেপে ঘুমিযে পডল আখালী।

রাত তখনও ভোব হয়নি। কুঁকডো ডাকেনি ভোরের। আয়েতুকে ঠেলে তুললো আখালী : এই শোন। বাচ্ছাটা এসেছে, জানলে। ঐ শোন আস্কালোন ঘবে বাচ্ছাটা কাঁদছে।

এবার বিবক্ত বোধ কবে আযেতু। এ কী পাগলামি। কিন্তু না, সত্যিই যেন একটা সদ্যোজাত শিশুব কান্না শোনা যায় পাশের ঘরে। তারপর নিজের মনেই হেসে ফেলে আয়েতু। সেও কি আখালীর মতো পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি। জিপসির বাচ্ছা এ বাডিতে কেমন করে আসবে। এ নিশ্চয় মোরাঙ-বউয়ের বাচ্ছার কান্না। কিন্তু আখালীর উৎসাহে ওকে উঠতে হল।

তখনও ভোরের আলো ভালো করে ফোটেনি। আস্‌কালোন ঘরটা বাড়ির পিছনে। জানালা নেই ঘরে। ছোট্ট ঘর, একটি মাত্র দরজা। সে ঘরে পুরুষমানুষের ঢোকা বারণ। বাড়ির বয়স্কা মেয়েরা বিশেষ কারণে মাসে তিন চার দিন মাত্র ঐ ঘরটায় কাটিয়ে আসে। প্রতি বাড়িতেই থাকে একটা করে আসকালোন ঘর। ঘরটার সামনে এসে ওরা দুজনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আশ্চর্য, ঘরের ভিতর থেকে সত্যিই একটা সদ্যোজাত শিশুর কান্না শোনা যায়। অন্ধকারের মধ্যে ছুটে গেল আখালী, বঞ্চিতা বন্ধ্যা নারী—ফিরে এল মুহূর্তে সন্তান ক্রোড়ে; তৃপ্ত মাতৃত্বের পরিপূর্ণ হাসিটি মুখে ফুটিয়ে।

দিনের আলো ফুটলে দেখা গেল জিপসির দল যেখানে তাঁবু গেড়েছিল সেখানে জনপ্রাণী নেই।

কৌয়াডোল পাথরটা যেমন উদাসীন দৃষ্টি মেলে দেখেছিল আমার ঠিকাদারের ছোট্ট ডিনামাইটের কৌটাটাকে, তেমনি উপেক্ষা ভরেই আয়েতু সেদিন দেখেছিল জিপসির পরিত্যক্ত শিশুকন্যাটিকে। আন্দাজ করতে পারেনি বিষকন্যার বিস্ফোরণী শক্তি।

আখালী ওকে বুকে করে মানুষ করতে থাকে—সাত রাজার ধন মানিক এসেছে সংসারে। অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি—যদিও সৌন্দর্যের যে সংজ্ঞা মুরিয়া সমাজে স্বীকৃত তাতে ওকে সুন্দরী বলা চলে না আদৌ! আখালী ওর নাম রাখল রঙিলা।

জিপসি মেয়েটি মানুষ হল মুরিয়া পরিবারে। ওরা কেউ জানতো না রঙিলা বিষকন্যা!

রঙিলার যখন তিন বছর বয়স তখন আখালীর কোলে এল তার প্রথম এবং একমাত্র সন্তান—মাল্‌কো। সাদা আর কালো দুটি সন্তানকে মানুষ করতে থাকে আখালী। ক্রমে মেয়ে দুটি বড় হয়ে ওঠে! আর ঘরে রাখা যায় না। আখালী ওদের একে একে ঘটুলে পাঠালো। সারাদিন মায়ের হাতে হাতে কাজ করে দুই বোন—তারপর সন্ধ্যায় চলে যায় ঘটুলে—ফেরে ভোর বেলা।

রঙিলাকে মেনে নিল কারাংমেটার সমাজ, কিন্তু কারাংমেটার ঘটুলে ক্রমশ বুঝতে শিখল রঙিলা—পুরোপুরি তাকে গ্রহণ করেনি কেউ।

কাবোঙ্গা থেকে পুঙ্গার মিছানা আসার পর অদ্ভুত পরিবর্তন হ'ল যেন রঙিলার। কিদ্দারি পাখির হালকা পালকের মতো মন নিয়ে রঙিলা যেন নেচে

বেড়ায় সারা পাড়া। কারাংমেটার কোন চেলিক তার মূল্য বোঝেনি, এজন্যে দুরন্ত ক্ষোভ ছিল রঙিলার। ঘট্‌লে তার প্রেমিক ছিলনা, জীবনে একটিও কাঁকুই উপহার পায়নি সে, এজন্যে মরমে মরে ছিল এতদিন। আজ তার দিন এসেছে। কাবোঙ্গা গাঁয়ের কোণ্ডা সর্দারের ছেলে চয়ন-শিরদার তার মূল্য বুঝেছে। তোমরা দেখে নাও যাকে তোমাদের নজরে পড়েনি—তারই জন্যে ভিনগাঁয়ের সেরা ছেলে লামহাদা খাটতে আসছে। রাজপুত্রের মতো তার চেহারা, স্বয়ং লিঙ্গোপেনের মতো সুদর্শন। খবরটা রটে গেল মুখে মুখে। চয়নকে অনেকেই দেখেছে। ঘটুলের সবাই তাকে চেনে। চোখে পড়বার মতো ছেলেই যে। রঙিলাকে সবাই ঠাট্টা করে, মশ্‌করা করে। রঙিলা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে তা। কখনও ছদ্ম তাড়না করে বান্ধবীদের, কখনও হেসে স্বীকার করে নেয়। উশীর পাখি যেমন জোড়া পায়ে নেচে নেচে বেড়ায় রঙিলার ভাবখানাও তেমনি। কারাংমেটার ঘট্‌লে সাড়া পড়ে গেছে। চয়ন-শিরদার এ গাঁয়ে লামহাদা খাটতে এলে এ ঘট্‌লের সভ্য হতে হবে তাকে। কারাংমেটায় নয়া-ঘট্‌ল, জোড়িদার-ঘট্‌ল নয়। অর্থাৎ প্রতি তিন দিন অন্তর এখানে জোড় ভাঙে, জোড় গড়ে। কারাংমেটার সব মোটিয়ারীর মুখেই তাই হাসি ফুটেছে।

আর ঠিক সেই কারণেই মরমে মরে আছে মাল্‌কো। চয়নকে আর একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে তার কী আকুলতাই না ছিল। এ এক মাসে সে যে কতবার জোড়ি-মায়ের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানিয়েছে তা সেই জানে। সেই চয়নই আসছে কারাংমেটায়, সেই চয়নই এ ঘটুলের সভ্য হতে চলেছে। এ খবরে কোথায় মালকোর অন্তরাত্মা ধুশীরের তারের মতো রিম্‌ঝিম করে বেজে উঠবে, না তার কান্না আসছে বুক ফেটে। ছি ছি ছি! এ লজ্জা সে রাখবে কোথায়। এই যদি চয়নের মনে ছিল তা হলে সে রাত্রে কেন সে অমন মিথ্যার কুহক সৃষ্টি করেছিল?

কিন্তু! না, মাল্‌কো অন্যায় কথা ভাবছে। চয়ন তো কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি। মাল্‌কোকে সে বুকে টেনে নিয়েছিল, আদর-সোহাগ করেছিল,—কিন্তু কই একবারও তো সে বলেনি মাল্‌কোকে সে জীবনসঙ্গিনী করতে চায়। একথা যে মালকোর স্বপ্নেরও অগোচর। এ স্বপ্ন তো সে দেখেনি। মালকোও মুখ ফুটে বলেনি কোন কথা। চয়নকে দেখেই কিজানি কেন তার বুকের মধ্যে দুলে উঠেছিল। অরণ্যচারী পাহাড়ি মেয়েটির যৌবন হঠাৎ চিত্রকোট জল-

প্রপাতের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চেয়েছিল ওর তারুণ্যের পায়ে। নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেবার উদগ্র বাসনা জেগেছিল মনে। কিন্তু সে কথাও তো লাজুক মেয়েটা মুখ ফুটে বলেনি। চয়নও কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি সে রাত্রে। তা হলে মালকো এতটা মর্মাহত হল কেন? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে। তবু কেন জানি মালকোর মনে হয়েছিল চয়নের ব্যবহারে একটা আন্তরিকতা ছিল—সাধারণ চেলিকের মতো তার আলিঙ্গন শুধু জৈবপ্রেরণার বশে নয়। নিজের অজান্তেই মালকো কিছু একটা আশা করে বসেছিল নিশ্চয়।

পাহাড়ি মেয়েরা এমন ক্ষেত্রে যা করে থাকে মালকো সে পথে গেল না। রঙিলার গাত্রবর্ণ যদি হয় মুরিয়া-ঘরের ব্যতিক্রম—চয়নের উদাসীনতা যদি হয় অ-সাধারণ তা হলে মালকোও পাহাড়ি মেয়ে হিসাবে একটু অন্য জাতের। প্রতিহিংসার কথা তার মনের কোণে জাগেনি। কোথায় মুখখানা লুকাবে সেই চিন্তাতেই লাজুক মেয়েটা ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

চয়ন আসছে। পাশের গাঁয়ের ঘটুলের সে শিরদার—রাজা। তাকে এখানেও উপযুক্ত একটা পদমর্যাদা দিতে হয়। কারাংমেটার কোতোয়ার সম্প্রতি বিয়ে করেছে। কোতোয়ারের পদ শূন্য। সুতরাং স্থির হল চয়ন এ গাঁয়ে এলে তাকেই করা হবে কারাংমেটার কোতোয়ার। আপত্তি করল রঙিলা নিজেই। কোতোয়ারের কাজ হচ্ছে মোটিয়ারীদের দেখ-ভাল্ করা। ফলে বেলোসা আর কোতোয়ারকে ক্রমাগত আলাপ আলোচনা পরমর্শ করতে হয়। মুরিয়া সমাজের নিয়ম অনুযায়ী ভাবী বধূ তার লামহাদার সঙ্গে কথা বলতে পারে না। তাই রঙিলা বললে : চয়ন কোতোয়ার হলে আমাকে তোমরা নিষ্কৃতি দাও।

শিরদার বলে : তা যেন দিলাম, কিন্তু বেলোসা হবে কে?

রঙিলা মুখ টিপে বলে : কেন মাল্‌কো! তার সঙ্গে চয়নের খুব ভাব যে!

: তাই নাকি, তাই নাকি? তা তো জানতাম না! তাই নাকি রে মালকো?

মাল্‌কোর মনে হল তার বেদনার স্থানটা ইচ্ছে করেই মাড়িয়ে দিয়েছে দিদি। কোন জবাব দিল না। উঠে চলে গেল বাইরে। হেসে উঠল সবাই আর সবচেয়ে বেশী হাসল রঙিলা-বেলোসা!

চয়ন কারাংমেটায় এসে পৌছালো বিকালে। প্রথমেই সে গিয়েছিল

আয়েন্তুর বাড়ি। খবর পেয়ে ঘটুল থেকে দল বেঁধে এল চেলিকেরা। চয়নকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ঘটুলে নিয়ে যাবে। ওদের ঘটুলের মর্যাদা বৃদ্ধি হল আজ। চয়ন বিখ্যাত তীরন্দাজ, নির্ভীক শিকারী। তার আগমন উপলক্ষ্যে আজ ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে ঘটুলে।

চয়নকে নিয়ে চেলিকের দল যখন ঘটুলে এসে পৌছালো তখনও সন্ধ্যা লাগেনি। শুধু কামদার বেলদার এসে ঝাঁটপাট দেওয়ার ব্যবস্থাপনা দেখে গেছে। ওরা এসে বসল গোল হয়ে। বাচ্চা ছেলের দল, যারা এখনও ঘটুল-নাম পায়নি তারা একে একে আসছে এক এক টুক্‌রো কাঠ হাতে নিয়ে। শুক্‌নো কাঠখানা শিলেদার অথবা কাজাঙ্কিকে দেখিয়ে জমা দিচ্ছে ভাঁড়ারে। তারপর ফিরে এসে হাত তুলে জোহার করছে সবাইকে, জোহার শিরদার, জোহার বেলদার, জোহার কোতোয়ার······

শিরদার একবার চারিদিক ঘুরে দেখে এল। কোথাও কারও কর্তব্যে কোন শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায় কি না। তারপর সেও এসে বসে পড়ে চয়নের পাশে। এই সময় হঠাৎ দল বেঁধে হুড়মুড় করে ঘটুলে ঢোকে মোটিয়ারীর দল। চয়ন আড়চোখে একবার দেখে নেয়। এতক্ষণ তারা অপেক্ষা করছিল গ্রামদেবী জোড়িমাইয়ের ছাপরার কাছে। ওবা কখনও একা একা আসে না। অনেকগুলি মেয়ে আগে মন্দিরের কাছে জড়ো হয়—সেখানে চলে কিছুক্ষণ ফিসির ফিসির। তারপর দল বেঁধে ঘটুলে আসে হুড়মুড়িয়ে। আজ ওদের দেরী হবার আরও কারণ আছে। চয়নের কি কি পরীক্ষা নেওয়া হবে তারই পরামর্শ আঁটছিল এতক্ষণ।

ঘটুলে কোন নতুন চেলিক এলে তাকে সহ্য শক্তির পরীক্ষা দিতে হয়। মোটিয়ারীরা যখন চুল আঁচড়ে দেয় তখন চিরুণীটা মাথার খুলিটাকেও আঁচড়ে তুলে ফেলার উপক্রম করে। যখন গা-হাতপা টিপে দেয় তখন নখ বসিয়ে দেয় চামড়ায়। এসব পরীক্ষায় যদি নির্বিকার থাকতে পারে নতুন চেলিক তবেই তো সে জাতে উঠবে?

মেয়েরা বসে পড়ল এখানে ওখানে, কেউ ছেলেদের কাছে, কেউ একা, মেয়েদের ছোট দলে। এবার শুরু হল কাজের কথা। শিরদার বললে: সবাই এসেছে?

শিলেদারের গুন্‌তি শেষ হয়েছিল, বললে: দুজন মোটিয়ারী আসেনি।

: বেলোসা কি বলছে ? কেন আসেনি ওরা দুজন ?

: বেলোসা নিজেই আসেনি। আর আসেনি মালকো।

: হুম ?—গম্ভীর হয়ে যায় শিরদার। তারপর নিম্নকণ্ঠে চয়নকে বলে : এই হয়েছে এক মহা মুশ্‌কিল। আমাদের ঘটুলের কোতোয়ার মাস দুয়েক আগে বিয়ে করে ইস্তফা দিয়েছে। আর আমাদের বেলোসাও কারও শাসন মানে না। ফলে মোটিয়ারীদের ঠিকমতো দেখ্‌-ভাল হচ্ছে না। ভাবছি তোমাকে আমাদের কোতোয়ার করব। আপত্তি নেই তো ?

চয়ন বললে : না আপত্তি কিসের, সবাই যদি চায়······

: তা তো বটেই। সবাইকার মত নিয়েই এটা স্থির করেছি আমরা। তারপর শিলেদারকে হুকুম করে : দুজন মোটিয়ারীকে পাঠিয়ে দাও। ডেকে নিয়ে আসুক বেলোসা আর মাল্‌কোকে। যদি আস্‌কালোনে থাকে তবে অন্য কথা—না হলে বলবে আমার হুকুম। না এলে শাস্তি পাবে।

মনে আছে এইখানে ডাক্তারবাবুকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম : কিন্তু শিরদার কি বেলোসাকে শাস্তি দিতে পারে ?

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন : শুধু শিরদার কেন, ঘটুলের নিয়ম না মেনে চললে ঘটুলের তরফ থেকে অন্য কেউও তাকে শাস্তি দিতে পারে। একমাত্র শিরদারকে কোন শাস্তি ভোগ করতে হয় না। ঘটুলের আইন-কানুন কতদূর অমোঘ হতে পারে তার একটা উদাহরণ দিই। সত্য ঘটনা। মাশোরা ঘটুলের কথা। ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাস। ঘটুলের বড় বড় ছেলেরা সবাই ক্ষেত-খামারের কাজে ব্যস্ত। ফসল ঘরে না ওঠা পর্যন্ত রাত্রে ওদের মাঠে পাহারা দিতে হয়। ক্ষেতের মাঝখানে উঁচু মাচাঙ বানায়। ওরা বলে 'কেতুল'। তার উপর বসে গোগা ঢোল পিটে অথবা পিটার্কো বাজিয়ে বুনো শুয়োর তাড়ায়। সুতরাং বয়স্ক চেলিকেরা আর কেউ ঘটুলে আসছে না। মোটিয়ারীদের মধ্যে পাঁচজন ছিল বয়সে বেশ বড়। পূর্ণ যুবতী। আঠারো-বিশের কোঠায়। বেলোসা, তিলোকা, পিওসা, জানকি আর আলোসা। তরুণ চেলিকদের কেউ ঘটুলে আসছে না—ওদের পাঁচজনের কাছে ঘটুলের সান্ধ্য-আসরকে মনে হল লবণহীন মাণ্ডিয়ার মতো বিস্বাদ। শিরদার ঘটুলের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল চালানের উপর। পদমর্যাদায় সে শিরদার, কোতোয়ার, শিলেদার, এমনকি কাজাঙ্কিরও নিচে। ছেলেটির বয়সও অল্প—বছর বারো।

অবশ্য বড় ছেলেদের অনুপস্থিতিতে বাকি যে বালখিল্যদল ঘটুলে আসছে তাদের মধ্যে সেই ছিল বয়োঃজ্যেষ্ঠ। বেলোসা-তিলোকার দল নিজেদের মধ্যে গোপনে পরামর্শ আঁটল। ওরা চালানকে খবর পাঠালো যে তাদেরও ক্ষেতে যেতে হচ্ছে। রাত্রে সেখানেই থাকতে হচ্ছে। তাই তারা ঘটুলে আসতে পারবে না কদিন। অনেক পরিবারে বয়স্থ ছেলে না থাকলে বড় মেয়েরাও ক্ষেতে পাহারা দিতে যায়, তাই এদের কোন সন্দেহ হয়নি প্রথমটা। কিন্তু ঘটুলের পুঁচকে সিপাহীর সন্দেহ জাগলো। বছর দশেক বয়স তার। সন্ধান নিয়ে এসে চালানকে বললে: ওরা মোটেই পাহারা দিতে মাঠে যায় না। বাড়িতে পড়ে পড়ে ঘুমায়!

অপরাধ গুরুতর। আত্মসম্মানে আঘাত জাগল বালখিল্য বাহিনীর। সাত থেকে বারো বছরের ঘটুল-সভ্যদের অপমান বোধ হল। চালান দুটি বাচ্ছাকে পাঠালো মেয়েদের গ্রেপ্তার করে আনতে। সে দুটি সেপাইয়ের তখন ল্যাঙট আঁটার বয়সও হয়নি। বেলোসা হচ্ছে ঘটুলের রানী, সে হাঁকিয়ে দিল বাচ্ছা দুটোকে, বললে: বেশ করেছি, মিথ্যা কথা বলেছি। এবার সত্যি কথা বলছি। তোমাদের চালানকে বল, যতদিন না তোমাদের দাদারা মাঠ থেকে ফেরে, আমরা ঘটুলে যাব না।

চালান মাঠে খবর পাঠাল স্বয়ং শিরদারকে। শিরদার কিন্তু এল না, বলে পাঠালো: ঘটুলের দায়িত্ব তোমাদের উপর দিয়ে এসেছি, যদি কেউ অন্যায় করে তবে তার শাস্তির ব্যবস্থা তোমরাই করবে।

খবরটা পৌছাল বেলোসা-তিলোকার কানে। ভয় পেল তারা। পরদিন সন্ধ্যায় গুটি গুটি হাজিরা দিল ঘটুলে। । কিন্তু তাদের ঢুকতে দিল না সেই বাচ্ছা ছেলেটি—দ্বাদশবর্ষীয় চালান। বললে: তোমরা ঘটুলের ভিতরে এস না, বাইরে দাঁড়িয়ে থাক। আগে সবাই আসুক, তোমাদের বিচার হবে।

ষোড়শী অষ্টাদশীর দল বাইরে দাঁড়িয়ে রইল—শীতের রাত্রে।

বিচারে বালখিল্য বাহিনী স্থির করল—কান ধরে ওদের দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে থাকতে হবে। শাস্তির মেয়াদ দুই 'রেলো'।

রায় শুনে কেঁদে ফেললে বেলোসা। সে হচ্ছে ঘটুলের মক্ষিরানী—সবার সামনে তাকে দেওয়ালের দিকে মুখ করে কান ধরে বসে থাকতে হবে! ক্ষমা চাইলে জোড় হাতে। কিন্তু বিচারক নড়লেও বিচার নড়ে না। অগত্যা

যুবতীর দল দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসল কান ধরে। আর ন্যাংটো ছেলের দল নেচে চলে তুই প্রস্থ য়েলো য়েলো নাচ!

মনে আছে উপসংহারে ডাক্তার পিল্লাই বলেছিলেন: এঞ্জিনীয়ার সাহেব, সংবিধান আমাদেরও অনেক মৌলিক অধিকার দিয়েছে। সে অধিকার যারা ক্ষমতার দম্ভে বুটের তলায় মাড়িয়ে যায় তাদের নিকটতম ল্যাম্পপোস্টে না হক ফাঁসী কাঠে ঝোলানোর বিধান আছে আপনাদের সভ্য জগতের আইনে—কিন্তু স্বেচ্ছাচারী এ্যাডমিনিস্ট্রেসনের দর্প জুডিসিয়ারির কাছে এমনভাবে চূর্ণ হতে সেখানে দেখেছেন কোনদিন?

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। বলি: কিন্তু মালকো আর রঙিলা কি এখনও ঘটুলে ফিরে আসেনি?

ডাক্তারবাবু চটে ওঠেন: আপনি তো বেশ লোক মশাই। নানান ফ্যাকড়া তুলে গল্পে বাধা দেবেন—আর যেই আমি অন্য প্রসঙ্গে আসব অমনি ধমক লাগাবেন?

আমি নিরীহের মতো বলি: সে কি কথা? ধমক দেব কেন? আমি শুধু বলতে চাইছি কারাংমেটা ঘটুলে এতক্ষণে বোধহয় মাল্‌কো আর রঙিলা পৌঁছে গেছে।

: না, পৌঁছায়নি।—প্রতিবাদ করেন ডাক্তারবাবু: তার আগেই অন্যদিকে মোড় ঘুরল ঘটনাচক্র। ওরা সবাই মিলে অপেক্ষা করছে। রাত্রে ভালো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে। মাল্‌কো আর রঙিলা এলেই সান্ধ্য-আসর শুরু হবে। শিরদার চয়নকে বলে: আমরা ঠিক করেছি মাল্‌কোকে এবার বেলোসা করে দেব।

চয়ন অবাক হয়ে বলে: কেন? রঙিলা কি দোষ করল?

শিরদার হেসে বলে: রঙিলা বেলোসা থাকলে তোমাকে কোতোয়ার করব কেমন করে?

চয়ন আরও অবাক হয়ে বলে: কেন তাতে কী অসুবিধা? ওরা হেসে ওঠে একসাথে। শিরদার বললে: কী বোকা হে তুমি। তুমি কোতোয়ার হলে রঙিলা কখনও বেলোসা থাকতে পারে?

: কেন পারে না তাই তো জিজ্ঞাসা করছি এতক্ষণ।

: সে যে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। তুমি যে তার লামহাদা।

অনেকক্ষণ বাক্য-স্ফূর্তি হয়নি চয়নের। তারপর বলে : কে বললে ?

: কে আবার বলবে। সবাই বলছে। গাইতা নিজেই বলছে। আর তাই যদি না হবে তাহলে তুমি কাবোঙ্গা থেকে এলে কেন ?

চয়ন বুঝতে পারে কোথাও একটা প্রচণ্ড ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। সে বলে : তোমাদের রঙিলা বেলোসা কি আয়েতু গাইতার মেয়ে ?

: তুমি জানতে না ?

: আর মাল্‌কো ? মাল্‌কো কার মেয়ে ?

: মাল্‌কো বেলোসার ছোট বোন। আয়েতুরই ছোট মেয়ে।

চয়ন উঠে পড়ে। বলে : দাঁড়াও শুধিয়ে আসি গাইতাকে।

তখনই বেরিয়ে পড়ে সে। একটু পরেই রঙিলা আর মাল্‌কোকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে দুজন মোটিয়ারী। কিন্তু চয়ন আর ফেরে না। রাত বাড়তে থাকে। ব্যাপার কি ? তার পর পাঁচ 'রেলো' কেটে গেছে মনে লাগে। (এক দফা 'রেলো রেলো' নাচে মিনিট পনের সময় লাগে। সময়ের মাপ-কাঠিও ওদের নাচের ছন্দে বাঁধা।) চিন্তিত হল শিরদার। এত দেরী হচ্ছে কেন ? শেষে ওরা ক'জনে নিজেরাই খোঁজ নিতে গেল আয়েতুর কাছে। আয়েতু বলে : হ্যাঁ চয়ন এসেছিল তো, কথাবার্তা বলে আবার ঘটুলেই ফিরে গেল। সে তো অনেকক্ষণ !

: ঘটুলে ফিরে গেছে ! কই না তো !

খোঁজ খোঁজ। ছোট্ট গ্রাম কারাংমেটা। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা গাঁয়ের সব কটা ঘরই খোঁজা শেষ হয়ে গেল। নেই, কোথাও নেই চয়ন। কোথায় গেল একটা জলজ্যান্ত মানুষ ? চিতাবাঘে ধরল না তো ? বহু রাত্রি পর্যন্ত ওরা খোঁজা-খুঁজি করতে থাকে। মশাল জ্বেলে আয়েতুও বের হল সন্ধানে। ভিনগাঁয়ের ছেলেটা প্রথম রাত্রেই গেল বাঘের পেটে ! এই ছিল বড়া-দেওয়ের মনে ?

রঙিলা আর মাল্‌কো দুজনেই স্তব্ধ। কারাংমেটা গাঁয়ের কেউ আর সে রাত্রে ঘুমালো না। নিশ্চয় বাঘে খেয়েছে ছেলেটাকে ! রাত্রি প্রভাত হলে দেখা যাবে, তার রক্তাক্ত মৃতদেহ গাঁয়ের প্রান্তে পড়ে আছে কোন ঝোপের ধারে। কি জবাবদিহি করবে আয়েতু—যখন কাবোঙ্গা থেকে কোণ্ডা আসবে খবর পেয়ে ?

রাত্রি প্রভাত হল। দিনের আলোয় আবার নতুন করে খোঁজার পালা শুরু হয়। আশ্চর্য, মানুষটা যেন হাওয়ায় উবে গেছে। বাঘে খেলে রক্তের দাগ তো দেখতে পাওয়া যেত—তাও পাওয়া গেলনা কোথাও।

সন্ধ্যার দিকে সকল সন্দেহের নিরসন হল। কাবোঙ্গা থেকে এল কোণ্ডা আর গাদরু। তাদের দেখে মুখ শুকিয়ে গেল আয়েতুর। কিন্তু তাদের কথা শুনে হো হো করে হেসে ওঠে শেষ পর্যন্ত।

ক্ষমা চাইতে এসেছে ওরা। রঙিলা নয় মালকোর জন্যে লামহাদা খাটতে চায় চয়ন।

আয়েতু বলে: সে তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার ছেলে কোথায়?

: পাগলাটে ছেলে! ভুলটা বুঝতে পেরেই সে তৎক্ষণাৎ রওনা দেয় কাবোঙ্গার দিকে। রাত যখন 'ভঁয়ষা হিকৎ'—মোষের মতো কালো, তখন সে গিয়ে পৌঁছায় কাবোঙ্গাতে। মাঝরাতে আমরা তো তাজ্জব।

আয়েতু বলে: পাগলাটে নয়, বদ্ধ উন্মাদ তোমার ছেলে! এদিকে আমরা তো ভেবে সারা। একটা মানুষ একা এমনভাবে রাতের বেলা জঙ্গল পাড়ি দেবে তা কি করে আন্দাজ করব? পথে যদি বাঘ ভালুকের দেখা পেত?

পুত্রগর্বে গম্ভীর কোণ্ডা বলে: তাহলে বাড়ি পৌঁছাতো ভঁয়ষা হিকতে নয়, সেই যার নাম 'কর্কুসানা-পোহার'। জানোয়ারটা মেরে তো আর জঙ্গলে ফেলে রেখে যেত না—টানতে টানতে নিয়ে যেত কাবোঙ্গায়!

আবার খানা-পিনার আসর বসল। আয়েতু এ নতুন প্রস্তাবেও রাজি। রঙিলাই হোক আর মালকোই হোক এমন ছেলেকে জামাই করতেই হবে। আপত্তি হল কিরিংগোর। ব্যবস্থাটা বুড়ি কিরিংগোর পছন্দ হয়নি, বললে—রঙিলা হল 'আকোইন',—বড় বোন, তার বিয়ে না দিয়ে মাল্‌কোর বিয়ে দিবি কিরে?

আয়েতু চুপি চুপি পিসিকে বলে: সেটাই তো হবে অজুহাত। রঙিলার বিয়ে ঠিক না হলে তো আর মালকোর বিয়ে দিতে পারিনা। সুতরাং ছেলেটা বছরের পর বছর লামহাদা খাটবে আমার ক্ষেতে। বিয়ের কথা তুললেই বলব—আগে রঙিলার বিয়েটা হ'য়ে যাক্!

কিরিংগো পিচুটি ভরা চোখ দুটো পিট পিট করে বলে: তাই বল! তোর পেটে পেটে এত বুদ্ধি!

মালকোর মা আখালী বলে : কিন্তু রঙিলার কথাটা ভেবে দেখেছ কি? সে কেমন করে পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাবে?

আয়েতু বিরক্ত হয়ে বলে : যেমন করে আর পাঁচজনে মুখ দেখায়। ভুল ভুলই। আর রঙিলার সঙ্গে তো ওর গির্দা-আত্তোর হয়নি, হয়েছে মালকোর সঙ্গে।

আখালী বলে : তুমি কেমন করে জানলে?

: আমাকে জানতে হয়। আমি হচ্ছি গাঁয়ের গাইতা। সব খবর জানতে হয় আমাকে। রঙিলার সঙ্গে আত্তোর হয়েছিল ওদের কোতোয়ারের।

মালকোর মায়ের কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়—তা কেমন করে হবে? তাহলে রঙিলার মুখখানা অমন হয়ে গেল কেন?

আয়েতু তাকে সান্ত্বনা দেয় : রঙিলার বিয়ের ব্যবস্থাও করে ফেলছি। দেখ্‌না তুই।

যে নিষ্ঠাভরে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের আশ্রমে বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন দেবশিশু কচ তেমনি একনিষ্ঠ আন্তরিকতায় চয়ন খাটতে থাকে আয়েতুর খামারে। সেই কুঁকড়ো-ডাকা ভোরে উঠে বেবিয়ে যায় মাঠে, বলদ জোড়া নিয়ে। লেগে যায় ক্ষেতের কাজে। লাঙ্গল দেয়, বীজ ছড়ায়, নাড়া তুলে ফেলে, মই দেয়। ধান কাটে। আয়েতু যখন মাঠে আসে ততক্ষণে সূর্যদেব উঠে পড়েন তেঁতুল-গাছের মাথায়। এতদিন আয়েতু নিজেই সব কাজ করত। ওদের ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা আমাদেব মতো নয়। ও দেশে ভাগচাষী নেই, মজুর-চাষী নেই। জমির অভাব কি? বলে, লাঙ্গল যার জমি তার। তাই দিনমজুব পাওয়া ভার। এতদিনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে বুড়ো। সব কাজেব দায়িত্ব এখন চয়নের ঘাড়ে। জওয়া-উগুানায়, অর্থাৎ জল-খাবার বেলায় ওর জন্যে শুক্‌নো লাউয়ের খোলায় জওযা অথবা মাণ্ডিয়া নিয়ে মাঠে আসে—না মালকো নয়, রঙিলা। মালকোর সঙ্গে চয়নের সাক্ষাৎই হয় না। এ গাঁয়ে এসে পর্যন্ত একটি লহমার জন্যও সে সাক্ষাৎ পায়নি মালকোর। এ দিক থেকে দেবশিশু কচের সাধনাকে সে ম্লান করে দিয়েছে। সে শুধু দূর থেকে দেখেছে মালকোর ছায়া, নেপথ্য থেকে শুনেছে তার কণ্ঠস্বর। লামহাদার সঙ্গে তার ভাবী পত্নীর দেখা সাক্ষাৎ হওয়া, কথাবার্তা বলা নিয়মবিরুদ্ধ। তাতে সমাজে বদনাম হয়।

ঘটুলের ভিতরে বা বাইরে ভাবী বধূ লামহাদার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেনা, তাকে জোহার পর্যন্ত করতে পারে না। আইন তাই বলে বটে কিন্তু ব্যতিক্রমটাই এ ক্ষেত্রে আইন। জীবনযাত্রার নানান প্রয়োজনে একই গৃহবাসী দুটি মানুষের প্রতিদিন বারেবারে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়। আর সে সাক্ষাৎ যে প্রতিবারেই তৃতীয় ব্যক্তির সামনে হবে এমন কথা স্বীকার করে নিলে অতনুর মহিমা থাকে কোথায়? লামহাদার পক্ষে কাজের মরুভূমিতে ঐ তো একটিমাত্র মরুদ্যান। ভাবী পত্নীর পক্ষেও লামহাদার প্রতি অনুকম্পা জাগা স্বাভাবিক। যে মানুষটি ভিন গাঁ থেকে এসেছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার জীবন-যৌবনের মূল্য মেটাচ্ছে, তার প্রতি অনুকম্পা জাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু শুধুই কি অনুকম্পা? নিশ্চয়ই নয়। সচরাচর মেয়ের মা সামাজিক বিধি-নিষেধের কথাটা মাঝে মাঝে ভুলে যায়, অন্তত ভুলে গেছে বলে ভান করে। আহা ছেলেটি উদয়াস্ত খাটছে ওর সংসারে—দিনান্তের একটিমাত্র মুহূর্ত যদি ওর ক্ষণিক মাধুর্যে ভরে ওঠে তবে তাতে কার ক্ষতি। শুধু লক্ষ্য রাখে যেন গোপন সাক্ষাতকালে ওরা বাড়াবাড়ি না করে।

চয়নের দুর্ভাগ্য। ব্যতিক্রমটা তার ক্ষেত্রে নিয়ম হল না, হল ব্যতিক্রমের ব্যতিক্রমটাই। মুরিয়া সমাজের আইনের মর্যাদা ঠিক মতো রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা দেখে নেবার জন্য যেন উঠে পড়ে লাগল রঙিলা। বাঘিনীর মতো পিঙ্গল চোখ তার। সেই দুটি চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড শক্ত। কুঠার হাতে থাকলে যে চয়ন চিতাবাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পডতে ভয় পায়না, কারাংমেটা থেকে নিশাসমাগমে যে একা রওনা হতে পারে জঙ্গলের পথে সেই তারুণ্যের মূর্ত-প্রতীক চয়ন-সর্দার পর্যন্ত কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, ঐ পিঙ্গলনয়না মেয়েটির সান্নিধ্যে। রঙিলা যেন কোন মায়াবী, যেন মন্ত্রতন্ত্রেব অধিকারিণী ডাইনী সে। মালকোকে সে দিবারাত্র আগলে রাখে। মাল্‌কো এমনিতেই লাজুক, তারপর রঙিলার প্রতিবন্ধকতায় চয়ন মাল্‌কোর ছায়া পর্যন্ত দেখতে পায়না। মাঝে মাঝে একবার চকিত দৃষ্টিপাত ভিন্ন নগদ কিছুই পায়নি বেচারি। কিন্তু সেই ক্ষণিক চাহনিতেই অনুভব করেছে মাল্‌কোর মনোভাব। সে দৃষ্টি প্রেমে উজ্জ্বল, মমতায় কোমল। আখালী মাঝে মাঝে সুযোগেব সৃষ্টি করে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সতর্ক প্রহবী রঙিলার চোখ এড়িয়ে কিছুই

হবার উপায় নেই। অনাচার সে সইবে না কিছুতেই। 'জওয়া-উওানা'র দায়িত্ব সেজন্যে রঙিলা নিজেই গ্রহণ করেছে।

'জওয়া-উওানা'র ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। আমাদের গ্রাম্য জীবনেও এ নাটিকার অভিনয় হয়ে থাকে। আমাদের দেশের চাষীভাইও মাঠে যায় সেই কাক-ডাকা ভোরে। দেড় প্রহর বেলায় কৃষকবধূ আসে মাঠে। গামছা দিয়ে মাথা-মুখ মুছে গাছতলায় একটু জিরিয়ে নিতে বসে কৃষক। চাষীবধূ সযত্নে খাবারের পুঁটুলির মুখ খুলে বার করতে থাকে খাবার। চাষীভাই ততক্ষণে পুকুরের জলে মুখ-হাত ধুয়ে এসে বসে। ঘুঘুর একটানা ঐক্যতানে তাপদগ্ধ পৃথিবীর দেহটা কেঁপে কেঁপে ওঠে কিসের শিহরণে। কৃষক-জীবনের এই মধ্যাহ্ন-নাটকের বিষয়বস্তু যে শুধু জান্তব আহার তা হলফ করে বলতে পারিনা। ওরই ফাঁকে ফাঁকে চলে দাম্পত্য বিশ্রম্ভালাপ। মুড়কির মিষ্টরসেও যদি চাষীভাইয়ের পরিতৃপ্তি না হয়, জনবিরল আলের আড়ালে হঠাৎ যদি এক চুমুক মিষ্টতর মধুর সন্ধানে উন্মুখ হয়ে পড়ে—তবে দোষ দেব কাকে? আর তাতে যদি কৃষকবধূ চারিদিকে ভীত-চকিত দৃষ্টিপাত করে আঁচল সামনে উঠে পড়ে বলে: এমন করলি কাল থিকে আমি আসঁবনি বাপু, পুঁটিরে খাবার দে' পাঠায়ে দেবনে!—তাহলে সেটাকেও নাটকের পালাবদল বলতে পারিনা।

মুরিয়া কৃষকের জীবনেও 'জওয়া উওানা'র সময়টা অমনি মাধুর্যরসে ভরা। কৃষকের বধূ অথবা চেলিকের মোটিয়ারী লাউয়ের শুক্‌নো খোলায় নিয়ে আসে 'জওয়া' কিংবা 'ঘাটো' অথবা 'মাণ্ডিয়া'। তরল-ভাত। বিরলপত্র বাবলাগাছের ছায়ায় মধুর রসের পরিবেশন ঘটে। সচরাচর লামহাদার জীবনে এই মুহূর্তটিই সবচেয়ে মধুর। ভাবী শ্বাশুড়ীর এই এক অজুহাত। বাড়িতে আর কে আছে যে খাবার নিয়ে যাবে? চয়নের ক্ষেত্রে এখানেও ব্যতিক্রম। ওর জওয়া নিয়ে আসে রঙিলা। মাল্‌কো নয়।

চয়নও প্রতিশোধ নিয়েছে। মুরিয়া সমাজ শুধু লামহাদা আর ভাবী বধূর সম্পর্কেই বিধিনিষেধের বেড়া তোলেনি। স্ত্রীর বড় বোনের সঙ্গেও, অর্থাৎ 'আকোইনের' সঙ্গেও সম্পর্কটা নিষেধের। স্ত্রীর ছোট বোনের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি চলতে পারে—বড় বোনের সঙ্গে চলে না। আমাদের সমাজে যেমন বৌদির সঙ্গে একটা কৌতুকের সম্বন্ধ পাতানো চলে, ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে কথা-বার্তাই বলা চলে না, ওদেরও এক্ষেত্রে ব্যবস্থাটা ঐ রকম। স্ত্রীর বড় বোনের

সঙ্গে, আকোইনের সঙ্গে সম্পর্কটার নাম, ওদের ভাষায় 'মুরিয়াল নেহানা', অর্থাৎ 'নিষেধের সম্বন্ধ'—ভাশুর ভাদ্রবৌয়ের সম্পর্ক। অবশ্য আকোইনের সঙ্গে কথা বলায় আপত্তি নেই—তাকে স্পর্শ করা বারণ। তাছাড়া বিয়ে হলে তবেই এসব বিধিনিষেধ প্রযোজ্য, তার আগে নয়। কিন্তু চয়ন অতি-কঠোরভাবে এ নিয়ম মানতে শুরু করল—বিয়ের আগেই। রঙিলার সঙ্গে বাক্যালাপও বন্ধ করে দিল ঐ অজুহাতে। সে লক্ষ্য করেছে রঙিলার চোখ দুটো ওর উপর পড়লেই জ্বলতে থাকে।

আগেই বলেছি কারাংমেটা ঘটুল নয়া-ঘটুল, জোড়িদার ঘটুল নয়। চয়ন এ গ্রামে আসার কিছুদিন পরেই পর্যায়ক্রমে একদিন রঙিলার দান পড়ল চয়নের মাসানিতে রাত্রিযাপনের। চেলিক-মোটিয়ারীর সম-অধিকার বিষয়ে ঘটুলের দৃষ্টি সদাজাগ্রত। কোন চেলিক বলতে পারে না অমুক মোটিয়ারীকে নিয়ে আমি শোব না। ওদের ঝগড়া হলে, আড়ি হলে সেটার স্থায়িত্ব দান-ফিরে-আসা পর্যন্ত। চয়ন কিন্তু দৃঢ়ভাবে আপত্তি করল। রঙিলা মাল্‌কোর বড় বোন; দুদিন পরেই সে হবে চয়নের 'আকোইন'—তাই তার আপত্তি। রঙিলা জ্বলে উঠেছিল এ অপমানে—কিন্তু ঘটুলের বিচারসভায় রায় দেওয়া হল চয়নের স্বপক্ষে। দিল শিরদার।

সে কথা কিছুতেই ভুলতে পারেনি রঙিলা। এই ছেলেটির সঙ্গে তার ঠোকাঠুকির একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল প্রথম দর্শনের অশুভ মুহূর্ত থেকেই। রঙিলা হলপ করে বলতে পারে প্রথম সাক্ষাতে সে চয়নের দৃষ্টিতে দেখেছিল একটা মুগ্ধ আর্তি! এমনভাবে কেউ তার দিকে তাকায়নি মুরিয়া সমাজে। নারানপুরে অথবা কোকামেটায় অনেকবার অনেক পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে ধারাস্নান করেছে—কিন্তু তারা কেউই মুরিয়া নয়। রঙিলা বুঝতে শিখেছিল তার পিঙ্গল চুল, কটা রঙ, নীলচে চোখ দেখে মুগ্ধ হবার মতো পুরুষ মানুষও আছে দুনিয়ায়। তারা মুরিয়া জাতির জানা দুনিয়ার বাইরের মানুষ। তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় হাটে-বাজারে, মাড়াইয়ে। শহুরে মানুষের সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয়নি ওর। হৃদপিণ্ডে দোল দিয়ে উঠেছে জিপ্‌সী মায়ের রক্ত। নিজেকে সামলাতে পারেনি রঙিলা। সবার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে সে প্রতিশোধ নিয়েছে ঘটুলের চেলিকদলের উপর। ঘটুলের অলিখিত লাইন বলে—মোটিয়ারী নিজস্ব ঘটুলের বাইরের কোন

পুরুষের মাসানিতে বলবে না। রঙিলা কিন্তু সে আইনের মর্যাদা রাখেনি। কেন রাখবে? ওর নারীত্বকেই কি তারা প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছে? রঙিলা জানে, বার বার মাড়াইতে এসে সে বুঝেছে, ওর চির-উপেক্ষিত রূপের দিকেই শহুরে মানুষগুলো বারে বারে ফিরে ফিরে চোরা চাহনি হানে। হাজারটা মুরিয়া মেয়ের মধ্যে তার একটা বিশিষ্ট আসন আছে শহুরে মানুষের বিবেচনায়। রঙিলা জানে তার নিজের দেহে মুরিয়া রক্ত নেই। ঐ শহুরে মানুষদের রক্তের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে। তাই সেই মেলার মানুষদের পূজার নৈবেদ্যকে সে সব সময় প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। বিদ্রোহী মেয়েটি তাই সবার দৃষ্টির অগোচরে গোপনে এভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে সমাজের অবিবেচনার বিরুদ্ধে।

চয়নই রঙিলার জীবনে প্রথম আদিবাসী পুরুষ যার চোখে সে দেখেছিল তেমনি মুগ্ধ দৃষ্টি। ভেবেছিল, যত বাধার সৃষ্টি করতে পারবে, ততই উদগ্র হয়ে উঠবে চয়ন। কাবোঙ্গা শিরদারের দুর্বার তারুণ্যের প্রতি বেশী আস্থা স্থাপন করেছিল রঙিলা। তাই চয়নকে এড়িয়ে কাবোঙ্গার কোতোয়ারের বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছিল। আশা করেছিল চয়ন তা সইবে না, চয়ন তাকে ছিনিয়ে নেবে। আঘাতে আঘাতে মানুষটাকে জর্জরিত করতে চেয়েছিল। বিশ্বাস করেছিল খরজিহ্ব ভিন্‌গাঁয়ের মেয়েটির কাছে বাক্‌যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে চয়ন চাইবে প্রতিশোধ নিতে—বাহুযুদ্ধে। বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনে সে পলাতকা রঙিলাকে বন্দী করে ফেলবে, কঠিন আলিঙ্গনের নিষ্পেষণে গুঁড়িয়ে দিতে চাইবে রঙিলার বুকের পাঁজরা!

সে সব কিছুই হয়নি। দুরন্ত চয়ন শিরদার রঙিলাকে হতাশ করেছে। ভেড়ুয়ার মতো সে গিয়ে মুখ লুকিয়েছে মেনীমুখো মাল্‌কোর আঁচলের তলায়। চয়নের সে কাপুরুষতাকে রঙিলা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। তার উপর পুঙ্গারে মিছানার ভুল বোঝাবুঝি! চৈতদাণ্ডার উৎসব-শেষে চয়ন জানাল কারাংমেটার গাইতা আয়েতুর মেয়েকে সে বিয়ে করতে চায়। কোণ্ডা ডেকে পাঠিয়েছিল বিণ্ডোকে। বিণ্ডো-কোতোয়ার। বিণ্ডো চেনে গাইতার মেয়েকে, বললে—হ্যাঁ দেখেছি। তারপর মুখটা কানের কাছে এনে বলেছিল আয়েতুর মেয়ে হচ্ছে কারাংমেটার বেলোসা। কোণ্ডা খুশী হয়েছিল। পাশাপাশি গাঁয়ের শিরদার বেলোসার বিয়ে! রাজযোটক!

এসব ভিতরের কথা রঙিলা জানে না। তার ধারণা, তাকে অপমান করতেই চয়ন এমনটা করেছে। তাকে রসাতলে আছড়ে ফেলবে বলেই তুলেছে 'পোড়ো-তৃমে'র উর্ধ্বলোকে! অরণ্য-পর্বতের আদিম নারী! ওদের হৃদয়-বৃত্তি ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়। প্রেমে পড়লে ভালও বাসতে পারে নিবিড়ভাবে—গীর্দা-আতোরের পথে যদি কোন বাধা এসে দাঁড়ায় তাকে সরিয়ে দিতে হাত রক্তাক্ত করে বসতে দ্বিধা করে না। আবার প্রেম প্রত্যাখ্যাত হলে প্রতি-আঘাত করবার জন্য উদ্যত হয়ে ওঠে আচমকা। বন্য ওদের প্রকৃতি। চয়ন সতর্ক হয়, সাবধান হয়। শরাহত বাঘিনী জঙ্গলে গা-ঢাকা দিলে যেমন সজাগ দৃষ্টি মেলে জঙ্গলে ঘোরা-ফেরা করতে হয় চয়নের ভাবখানাও তেমনি। রঙিলা এখন আহত ব্যাঘ্রী। নখ-বিস্তার করে শীকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজছে সে এখন।

চয়ন ভাবে আর ভাবে। রঙিলা এতটা আহত হল কেন? সে কি সত্যিই ভালবেসেছিল চয়নকে? না কি এ শুধুই লালসার দাহ, কামনার দহন? সে কি সত্যিই আশা করেছিল চয়ন তারই জন্য লামহাদা খাটতে আসছে? সেই আশাতে ছাই পড়াতেই কি সে এমনভাবে ক্ষেপে উঠেছে? কিন্তু অমন অদ্ভুত প্রত্যাশাই বা করল কেমন করে রঙিলা? হ্যাঁ চয়ন নিজের কাছে স্বীকার করে—ঐ মেয়েটাকে দেখে তার কেমন যেন ঘুলিয়ে গিয়েছিল সব। ওর পিঙ্গল চুল, নীল চোখ আর সাদা চামড়া দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল আর একটি প্রায়-ভুলে-যাওয়া মেয়েকে। যার জন্য ওকে চাবুক খেতে হয়েছিল একদিন।

চয়নের কৈশোর-কালের এ অভিজ্ঞতার কথা অবশ্য আমি জানতে পেরেছিলাম অনেকদিন পরে, গুপ্তেজীর কাছ থেকে। ডাক্তার পিল্লাই জেনেছিলেন আমার কাছ থেকে। গুপ্তেজী কিন্তু আমাকে সব কথা বলতে পারেন নি। কারণ তিনি নিজেও জানতেন না সবটা। শুধু তিনি কেন চয়ন নিজেও জানতে পারেনি তার অপরাধটা কি, কেন তাকে চাবুক খেতে হয়েছিল।

চয়নের বয়স তখন অল্প। ওদের গাঁয়ের সামনে একদিন অদ্ভুত-দর্শন একদল মানুষ এসে তাঁবু গাড়ল। তাদের গায়ের রঙ উস্তালা ফুলের মতো লালচে সাদা। যবের শীষের মতো সোনালী চুল, বর্ষণ শেষের

নির্বোধ পোড়োভূমের মতো নীল চোখের তারা। অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি নিয়ে তারা বনে-জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করত। সরকারী লোক এসে গাইতাকে বলে গিয়েছিল যে ওরা ভাল লোক। এসেছে ছবি তুলতে, কারও কোন ক্ষতি ওরা করবে না। গাইতা চয়নকে লাগিয়েছিল সেই বিদেশীদের সেবা করবার কাজে। ওদের জন্য চয়নকে জল নিয়ে আসতে হত, ওদের পিছন পিছন যন্ত্রপাতি ঘাড়ে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে হত। ঐ অদ্ভুত-দর্শন মানুষগুলির মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীলোক ছিল। কত তার বয়স তা আন্দাজ করতে পারেনি, কিন্তু প্রথম দিনেই সে দেখেছিল মেয়েটি অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে তার নিরাবরণ পাথরে কোঁদা বলিষ্ঠ দেহটার দিকে।

মেমসাহেবের খিদমৎ করতে হত। মেমসাহেবের ছিল ছবি আঁকার বাতিক। যেদিন আকাশে মেঘ থাকত সেদিন সাহেবরা যন্ত্রপাতি বার করত না। সেদিন ঐ মেয়েটি ছবি আঁকতে বের হত সারাদিনের জন্য। চয়ন বয়ে নিয়ে যেত ছবি আঁকার সরঞ্জাম, টিফিন ক্যারিয়ার, জলের বোতল, সাবান-তোয়ালে। মেমসাহেব বসে ছবি আঁকতেন, আর চয়ন বসে থাকত গাছের ছায়ায়। বেশী দূরে যেতে সাহস পেত না—দিনের বেলাতেও নারাঙ্গীব ওখানটায় ভালুক আসে জল খেতে। শুধু মেমসাহেব যখন নারাঙ্গীর ধারে কাপড়-জামা ছেড়ে স্নানে নামতেন চয়ন তখন সরে আসত একটা বড় পাথরের আড়ালে। তখনও সে অরক্ষিত মহিলাটিকে একা রেখে দূরে যেত না। নদীর ধারেই, পাথরের ও পিঠে বসে বসে শুনত জলের শব্দ।

স্নান-শেষে মেমসাহেব ওর নাম ধরে ডাকত। ও বেরিয়ে এলে ওর হাতেও দিত নানান রকম অদ্ভুত খাবার। কেউ কারও ভাষা জানে না, তবু আকারে ইঙ্গিতে বেশ কাজ চলে যেত ওদের।

একদিন চয়ন পাথরের আড়ালে বসে শুনছে জলকেলির আওয়াজ। আপন মনে বাঁশী বাজাচ্ছে সে। হঠাৎ শুনতে পেল মেমসাহেবের আর্ত-শীৎকার। মুহূর্তে টাঙ্গিটা তুলে নিয়ে ছুটে গেল চয়ন নদীর কিনারায়। নিশ্চয় কোন বন্যজন্তু।

ভুল হয়েছিল বেচারির। জন্তু নয় মানুষ। বন্য নয় সুসভ্য মানুষ। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়,—চয়নের মনে হয়েছিল তার মেমসাহেবকে

সে লোকটা আক্রমণ করেছে বুঝি। ওর মুন্দ্রিয়া রক্ত মাথায় উঠে গেল। ও আক্রমণ করে বসল আগন্তুককে।

তারপর যে কি হল চয়নের ভাল মনে নেই। অপরাধটা তার কি হল—তাও সে বুঝতে পারেনি। সে শুধু বুঝেছিল ব্যাপারটা লজ্জাকর। পারলে সে আদ্যপ্রান্ত ঘটনাটা সকলের কাছেই গোপন করে যেত—কিন্তু সাহেবের চাবুকের দাগটাকে লুকাবে কেমন করে? আর সবচেয়ে সে অবাক হয়েছিল এ কথা ভেবে যে মেমসাহেব কেন বাধা দিল না। চয়নের সাহায্য যদি সে নাই চাইবে তাহলে অমন চীৎকার করে উঠেছিল কেন?

হয়তো এই ঘটনার পর থেকেই চয়ন মেয়েমানুষ জাতটাকেই এড়িয়ে যেতে শুরু করে। কিম্বা হয়ত ওর মনের একটা আজন্ম সংস্কার—নারী জাতির প্রতি অনীহা এতে দৃঢ়মূল হল মাত্র। চয়নের মনের ভাব বোঝা অসম্ভব। তবে একথা নিশ্চিত যে কারাংমেটার বেলোসাকে দেখে ওর নিশ্চয় মনে পড়ে গিয়েছিল কৈশোরে দেখা আর একটি নারীমূর্তিকে। হয়তো তাই চয়নের অন্তরাত্মা দুর্বার বেগে ছুটে যেতে চেয়েছিল ঐ আগুনবরণ মেয়েটির দিকে। নারাঙ্গীর তীরে নিরাবরণা একটি বিদেশিনীকে রক্ষা করবার জন্যে প্রথম কৈশোরে ওর যে একটা প্রেরণা জেগেছিল—যে অতৃপ্ত বাসনা প্রতিহত হযেছিল সাহেবেব চাবুকে—তাই হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল হয়তো বেলোসার সান্নিধ্যে। কে বলতে পারে কি হয়েছিল সেই আদিম অরণ্যচারীর মনের গহনে। কিন্তু সম্বিত ফিরে পেতে দেরী হয়নি চয়নের। বিধি বাম। বেলোসা ওকে উপেক্ষা করে ধরা দিল কোতোয়ারের বাহুবন্ধনে। চয়নেব মনে হল এই আগুনবরণ মেয়েগুলি সব এক জাতের। ওর অশান্ত হৃদয় আশ্রয় খুঁজলো মাল্‌কোর কাছে—নিকষ-কালো মাল্‌কোর চেনাজানা বন্দরে নোঙর ফেলবার জন্য উৎগ্রীব হয়ে উঠল চয়ন। সেদিন থেকে রঙিলার দিকে তাকালেই ও দেখতে পায় তার পিছনে রয়েছে একটা অদৃশ্য চাবুক। সে চাবুক যখন নামবে চয়নের পিঠে, মাংস কেটে কেটে বসবে—তখন এই আগুনবরণ মেয়েটিও বাধা দিতে আসবে না।

ওরা বিশ্বাসঘাতকের জাত! ঐ উস্তালা ফুলের মতো ফর্সা মেয়েগুলি!

এতদিনে চয়ন বুঝতে পেরেছে সব কথা। রঙিলার আকর্ষণ ভালবাসার নয়—কামনার। যৌবনের ক্ষুধা। ক্ষুন্নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই রঙিলা চাবুকের ব্যবস্থা করবে। চয়ন তাই রঙিলাকে এড়িয়ে চলে। আর সেজন্যে ক্ষেপে গেছে রঙিলা। আহত সর্পিনীর মত উদ্যতফণা। সর্পিনী নয়, ডাইনী! হ্যাঁ, ডাইনী! রূপক নয়, সত্য কথা। তবে কথাটা খুব গোপন। তবু তা একদিন জানতে পারল চয়ন। জানালো কারাংমেটার শিরদার। যেদিন ও প্রত্যাখ্যান করল রঙিলা-বেলোসাকে আকোইন বলে, তারপর একদিন শিরদার ওকে জনান্তিকে ডেকে নিয়ে বললে: তুই খুব চালাক! বেলোসাকে বেশ কায়দা করে পাশ কাটালি যাহোক! বেলোসা হচ্ছে তোর আকোইন! মুরিয়াল নেহানা! কী বুদ্ধি!

চয়ন একটু অবাক হয়ে বলে: কেন, এ জন্যে আমাকে বুদ্ধিমান বলছিস কেন?

শিরদার এদিক ওদিক দেখে নিয়ে বললে: কথাটা খুব গোপন। তবে তোকে সব কথা বলব আমি। তুই হচ্ছিস কাবোঙ্গার শিরদার, আমাদের মালকোর লামহাদা। এ ঘটুলের কোতোয়ার। মালকো মাগীটা খুব লক্ষ্মী, খুব ভাল। তোর সব কথা জানা থাকা দরকার। সন্ধ্যাবেলা নারাঙ্গী নদীর ধারে মহুয়া গাছতলায় আস্‌বি, সব কথা বলব তোকে।

সন্ধ্যাবেলা পায়ে-চলা পথ ধরে চয়ন এসে পৌঁচালো নারাঙ্গী নদীর ধারে। গ্রাম থেকে অদূরেই বয়ে চলেছে স্বচ্ছতোয়া নারাঙ্গী নদী। গাঁয়ের কাছাকাছি বিরাট এক বাঁক নিয়েছে। ওপারে বালির বিস্তৃতি, এপারে শেষ বসন্তের শীর্ণা নদীর স্ফটিকস্বচ্ছ জল। চয়ন বসল একটা পাথরের উপর। বাঁশীটা রয়েছে সঙ্গে। বাজাতে ইচ্ছে করছে; কিন্তু না, বাঁশীর আওয়াজে অন্য কেউ আকৃষ্ট হয়ে এদিকে এসে পড়তে পারে। তারচেয়ে চুপচাপ বসে থাকাই ভাল। একটা বেনাঘাস নিয়ে অন্যমনস্কভাবে সে বালির উপর আঁচড় কাটতে থাকে। নদীর যেখান থেকে গাঁয়ের মেয়েরা জল নিয়ে যায় সেই প্রায়-ঘাট জায়গাটা এখান থেকে দেখা যায়। সূর্য অস্ত গেছে; আবছায়া হয়ে এসেছে চারিদিক। তবু অস্পষ্ট আলোয় লক্ষ্য করা যায় জলভরার পালা এখনও শেষ হয়নি। ম্লান গোধূলির আলো। গোধূলি তো নয় 'হির্‌রি পোড়'—সবুজ-টিয়ের সময়। সন্ধ্যাবেলায় সবুজ টিয়ের ঝাঁক ঘরে ফেরে। তাই গোধূলি লগ্নের নাম—সবুজ-

টিয়ের সময়। কিন্তু শিরদার আসছে না কেন? ভুলে গেল না তো? মহুয়া গাছটার দিকে নজর রেখেই বসেছিল চয়ন। ঘটুলে যাবার সময়ও হয়ে এল এদিকে।

মহুয়াগাছের ফাঁক দিয়ে উঠে এল শুক্লপক্ষের চাঁদ। পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন তিথি। পোড়ো-ভূম রূপালী চাদর জড়িয়েছে যেন গায়ে। বনের এখানে ওখানে ছোপধরা জ্যোৎস্না। মোহময় প্রকৃতি। মনটা উদাস হয়ে যায়।

ট্যাঁক থেকে গুডাটা বার ক'রে একটু তামাকপাতা বার করলে চয়ন। কি আর করা যায়? তামাকই চিবানো যাক খানিকটা। কিন্তু না, ঐ তো কে যেন আসছে। অবচেতন অনুপ্রেরণায় মাকৃসুটা হাতে তুলে নেয়। খুব সম্ভব শিরদার আসছে, কিন্তু এ বন্য-মানুষগুলো জঙ্গলে অদৃশ্য প্রাণীর পদশব্দ শুনলেই বাগিয়ে ধরে টাঙ্গিটা। না, কোন জানোয়ার নয়। মানুষই। কিন্তু নেমে এলো না কেন নদীগর্ভে? মহুয়া গাছতলাতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মনে হচ্ছে।

পায়ে পায়ে উঠে এলো চয়ন। আশ্চর্য! শিরদার নয়—মাল্‌কো!

চয়ন ছুটে এসে ওর হাত দুটি চেপে ধরে—মাল্‌কো, মাল্‌কো!

উত্তেজনায় ভয়ে মাল্‌কো কাঁপছে। ওর বুকে মুখ লুকিয়ে বললে—জল নিতে এসেছিলাম। দেখলাম তুই বসে আছিস চুপটি করে। তাই……

: রঙিলা? রঙিলা কোথায়?

: রঙিলা!—আশ্লেষ বন্ধন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলো মাল্‌কো। ও নাম শুনলেই সে চম্‌কে ওঠে। বললে: দিদি আসেনি। বাড়িতেই আছে। মাঠ থেকে তুই বাড়ি আসবি, তাই পাহারা দিয়ে বসে আছে!

হি হি করে হাসলে চয়ন! খুব জব্দ হয়েছে রঙিলা। মাঠ থেকে সে আজ বাড়ি যায়নি। সোজা চলে এসেছে নারাঙ্গীর ধারে। খুব খুশী হয়ে উঠল চয়ন।

মাল্‌কো বললে: একটা কথা বলব?

: কি? বল্‌না!

: তুই আমার জন্যে লামহাদা খাটতে এলি কেন?

হো হো করে হেসে ওঠে চয়ন। কী বোকার মতো প্রশ্ন! তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে: তোকে জব্দ করব বলে।

: জব্দ ? কেমন করে ? কেন ?

: তুই বলেছিলি 'ইয়ে ধান্দারি নিজান্‌বি বাইলো চো নাককি কাটি'। তা ধাঁধার জবাব তো আমি দিতে পারিনি। তাই ঠিক করেছি, তোকে বিয়ে করব ; করে বলব এবার নিজের নাক নিজেই কাট।

মাল্‌কোও হেসে ওঠে খিল্‌খিল করে।

কিন্তু ঐ আবার কার পায়ের শব্দ। নিশ্চয়ই শিরদার। চয়ন বলে : শিগ্‌গির পালা! কাল ঠিক এই সময়ে এখানে আসবি। চুপি চুপি!

চকিত কৃষ্ণসার মৃগের মতো বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল মাল্‌কো।

হ্যাঁ শিরদার।

শিরদার এগিয়ে এসে বসল আর একটা পাথরের উপর। চয়নের পাগড়ি থেকে গুডার কৌটাটা তুলে নিয়ে এক টিপ তামাকপাতা বার করে চিবাতে থাকে। চয়ন ঘনিয়ে এসে বলে : রঙিলার কথা কি বলবি বলেছিলি ?

: বল্‌ছি, কিন্তু তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—সত্যি কথা বলবি ?

: বল না, কি বলবি।

: চৈত-দাণ্ডার রাত্রে একসময় দেখেছিলাম ঘটুলঘরে আমাদের বেলোসা ছিল না, লক্ষ্য করে দেখলুম তুইও নাই—তোরা দুজন কি……

: দূর বোকা !—ধমক দিয়ে ওঠে চয়ন। না, না, সে-সব কিছু হয়নি।

: বাঁচলাম। খবরদার! তারপর মুখটা কানের কাছে এনে চুপি চুপি বলে—রঙিলা আসলে ডাইনী, মন্তর-জানা ডাইনী। পাংনাহিন। ও ধুরবান ছুঁড়তে পারে।

: কি করে জানলি ?

: বলি শোন।

রঙিলার জীবনের আদিকাণ্ডের কথা শোনাতে থাকে শিরদার। তখন সে নিজেও খুব ছোট, সব কথা জানতে বুঝতে পারেনি। পরে বড় হয়ে শুনেছে বাপ-দাদার কাছে। জানতে পেরেছে রঙিলা মুরিয়াবংশের মেয়ে নয়—আয়েতু গোণ্ডের পালিতাকন্যা। আয়েতু যখন কুড়িয়ে পাওয়া জিপসির মেয়েটিকে মানুষ করতে শুরু করে তখন প্রবল আপত্তি হয়েছিল কারাংমেটার আদিবাসী সমাজে। এমন কাণ্ড আগে কখনও হয়নি। কিন্তু আখালী

ততদিনে বঞ্চিত মাতৃত্বের সবটুকু স্নেহ দিয়ে ঘিরে ফেলেছে সদ্যোজাত শিশুটিকে —তার বুকের ভিতর থেকে বাচ্ছাটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এমন সাধ্য কারও ছিল না। শেষ পর্যন্ত সমাজপতিরা আঙ্গোপেনের দ্বারস্থ হল। তাঁর পূজা দেওয়া হল সাড়ম্বরে। গুণিয়ার উপর আঙ্গোপেনের ভর হল। ভাবাবেশে মাথা ঝাঁকিয়ে রক্তচক্ষু গুণিয়া ঘোষণা করলে—রঙিলা হচ্ছে বিষকন্যা, পাংনাহিন!

চম্‌কে উঠ্‌ল আয়েতু, শিউরে উঠল আখালী!

রঙিলার সম্বন্ধে এমন ভয়াবহ কথা শুনেও আয়েতু কিন্তু তাকে ত্যাগ করতে রাজি হল না। ততদিনে বুড়ো গাইতা রেঙোর মৃত্যু হয়েছে। আয়েতু বসেছে সেই শূন্য সিংহাসনে। ফলে গাইতার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারলে না কেউ। আয়েতুও বুদ্ধি করে একটা ভোজ লাগিয়ে দিল! দেবতার নামে একজোড়া শুয়োর বলি দেওয়া হতেই গুণিয়া ঘোষণা করলে দোষ কেটে গেছে।

আখালী বাচ্ছাটাকে বুকে জড়িয়ে বলে—হ্যাঁরে তুই নাকি পাংনাহিন হানার?

ফুলের মতো সুন্দর শিশু নিদন্ত হাসি হাসে ফ্যাক্‌ করে!

গাইতার ভয় আর অপদেবতার ভয়। দুটোই দুর্জয়। তাই কারাংমেটার মনের অন্তঃস্থলে দুর্ভাবনার বীজ রয়েই গেল লোকচক্ষুর অন্তরালে। রঙিলা ক্রমে বড় হল। ঘটুলেও ভর্তি হল। চটপটে, বুদ্ধিমতী মেয়ে। অল্পদিনেই তার ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে হল। দিন দিন পদোন্নতি হতে থাকে তার, ক্রমে হল ঘটুলের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিতা—ঘটুল-বেলোসা। কিন্তু তবু অরণ্যপর্বতের আদিম মানুষগুলির বুকের মধ্যে যে অজানা আতঙ্কের বাসা, সেখান থেকে কুসংস্কারকে কেউ তাড়াতে পারল না। রঙিলাকে তাই কেউ আপন করে নিতে পারে না। সে যে বিষকন্যা, সে যে ডাইনী—এ কথাটা মনের গভীরে রয়েই গেল। তাই সব কিছু পেয়েও রঙিলার মনে হয় কি যেন পাওয়া হয়নি। মেয়েরা আড়ালে একত্র হয়, ফিস্‌ফিসানি শুরু হয়ে যায়, গরবিনীরা সখীদের শোনায় নিরন্ধ্র অন্ধকারের বুকে ঘটুল জীবনের গোপন কথা। রঙিলা সে কাহিনীর সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিতে চায়—বোঝে ঘটুলের রানী হয়েও সে উপেক্ষিতা, ব্যর্থ তার যৌবন! মনে মনে ফুঁসতে

থাকে। তবু ওদের কাছে সে কথা স্বীকার করা চলে না। সে যে বড় লজ্জার কথা—সে যে তার নারীত্বের অপমান। তাই কোন অভিযোগও আনা চলে না। সে কথার উচ্চারণ করা মানেই নিজের যৌবনকে লজ্জা দেওয়া, নিজের নারীত্বকে ভূলুণ্ঠিত করা। তাই রঙিলাও প্রথম প্রথম মোটিয়ারীদের গোপন আসরে বানিয়ে বানিয়ে বলত তার কল্পিত অভিজ্ঞতার কাহিনী। নিজেই কাঠের কাঁকুই বানিয়ে পরত মাথায় আর বলত: কাল রাতে কি হয়েছিল জানিস,—কাল তো আমি শুয়েছিলাম কোতোয়ারের মাসানিতে, এমন অসভ্য কোতোয়ারটা করলে কি……

কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বুদ্ধিমতী রঙিলা বুঝতে শিখল, সবাই ওর চালাকিটা ধরে ফেলেছে। প্রকাশ্যে কেউ-ই সেটা স্বীকার করে না—আড়ালে হেসে লুটিয়ে পড়ে এ-ওর গায়ে। সব চেলিকই সব মোটিয়ারীকে গোপনে বলেছে, রঙিলা যেদিন তাদের মাসানিতে শুতে আসে, সে-রাত্রিটা তারা আড়ষ্ট হয়ে কাটিয়ে দেয়। ঘুমায় না, জেগে থাকে। পাশে শোওয়া ডাইনীটা যেন মাঝরাতে উঠে বুকের রক্ত না চুষতে আরম্ভ করে। রঙিলা সংযত হয়, কঠোর হয়—প্রতিশোধ নেবার জন্য নিশ্ পিশ্ করতে থাকে। কিন্তু প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে কার উপর? ওরা সবাই যে একদলে। ওরা যখন জোড়ায় জোড়ায় ঘুমাতে থাকে বাহুবন্ধের আশ্লেষ-আলিঙ্গনে, আর সে যখন বিনিদ্র নয়নে ছটফট করতে থাকে, তখন মাঝে মাঝে ওর ইচ্ছে হয়, চুপিসাবে বেরিয়ে আসে বাইরে। আগুন লাগিয়ে দেয় ঘটুলের চালায়। মরুক পুড়ে আগুনের বেড়াজালে ঐ স্বার্থপর ছেলেমেয়ের দল। কিন্তু। তারপর তাকেও যে পুড়িয়ে মারবে কারাংমেটার বিক্ষুব্ধ মানুষগুলো। মারুক তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু তার চেয়েও বড দুঃখ, তা হলে যে প্রমাণ হয়ে যাবে—সে সত্যিই ডাইনী। পাংনাহিন হানার! একঘর জ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারতে পারে কখনও কোন মানুষ? এ-কাজ করলে জিত হবে তার ভিতরে বাসা-বাঁধা ডাইনীটার, হার হবে সেই সত্তাটার, যে গান গায, যে নাচে, যে ভালবাসতে চায়, যে ভালবাসা পেতে চায়।

চয়ন বাধা দিযে বলে ওঠে: কিন্তু কথাটা কি? রঙিলা কি সত্যিই ডাইনী?

: আমি তা কেমন করে জানব?—প্রতিপ্রশ্ন করে শিরদার।

: এই যে বললি—ও তো সত্যিই ডাইনী নয় ?

: আহা! ও তো নিজে তাই ভাবে।

: ও নিজে জানে না—ও ডাইনী কিনা ?

: তাই কি কেউ কখনও জানতে পারে ?

: তা হলে ও যে ডাইনী অর কোন প্রমাণ নেই ? এক গুণিয়ার কথা ছাড়া ?

: না, আছে। সে কথা আর কেউ জানে না। আমি জানি। কাউকে বলিনি। তোকে বলি শোন।

শিরদার তখন বলতে থাকে তার অভিজ্ঞতা। গতবার নারানপুরে মাড়াইয়ের কাহিনী। কাবাঙ্গোতে যে রাত্রে ওরা আতিথ্য গ্রহণ করেছিল, ঠিক তার পরের রাত্রের ঘটনা। হাটের উত্তর দিকের মাঠে গাছতলায় ওরা আড্ডা গেড়েছিল। শিরদার বলে: লক্ষ্য করেছিলাম একজন শহুরে মানুষ প্রায় সারাদিনই ঘুরঘুর করছে আমাদের আস্তানার কাছে। লোকটার হাতে একটা ছোট্ট কালো মতন বাক্স। সেটা দিয়ে বারে বারে আমাদের টিপ করছে। টিপই করছে। তার থেকে কিছুই বের হচ্ছে না অবশ্য।

চয়ন বলে: ওকে বলে ক্যামেরা। ওতে ছবি আঁকা যায় যন্তর দিয়ে।

শিরদার বলে: হাঁ, হাঁ, ঠিক কথা। আমিও পরে শুনেছিলাম, ওটা ছবি আঁকার যন্তর। তুই কি করে জানলি ?

: কত নাড়াচাড়া করেছি ও যন্তর! যাক, তারপর কি হল বল ?

: দেখলাম সারাটা দিনই ছোকরা যন্তর হাতে ঘুরঘুর করছে। ইচ্ছে করছিল দিই ব্যাটাকে সাবড়ে একটি টাঙ্গির ঘায়ে; কিন্তু গাইতার বারণ আছে। মাড়াইয়ে এলে সংযত হয়ে থাকতে হয় আমাদের। শহুরে মানুষের সঙ্গে কোন কারণেই মেলামেশা করা বারণ, ঝগড়া-ঝাঁটি তো একেবারে নয়। খানিকটা নজর করেই বুঝতে পারলাম আমরা কেউ নয়, ওর লক্ষ্যস্থল আমাদের বেলোসা। তাই হওয়া স্বাভাবিক। আমরা যেমন মোটিয়ারীদের নিকষ-কালো গায়ের রঙ পছন্দ করি, তেমনি ওরা, মানে শহুরেরা পছন্দ করে সাদা চামড়া।

চয়ন বলে: এ রাম! তাই নাকি ?

: হ্যাঁ তাই। এ-জিনিস আমি আগেও দেখেছি। মানে আমাদের

আমের বাগের মাড়াইতে। তা সে যাই হোক, ছোকরা যে আমাদের বেলোসাকে দেখে মজেছে, সে কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। দুপুরে যখন মেয়েরা নারানপুরের বড়-তালাওয়ে স্নান করতে গেল, তখন একচোট ঝগড়াও হয়ে গেল। রঙিলা যখন স্নান করে উঠে কাপড় ছাড়ছে, ওই ছেলেটা তখন সেই যন্তরটা দিয়ে ওকে টিপ করছিল। রঙিলা ক্ষেপে গেল। একটা মাটির ঢেলা তুলে মারলে ছুঁড়ে। ঢেলাটা ওর গায়ে লাগেনি। হি-হি করে হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল ছেলেটা। তারপর শোন—বিকেলবেলা মোটিয়ারীরা যখন দল বেঁধে মেলা তলায় ঘুরছে, তখন সেই ছেলেটা আবার ওদের পিছু নেয়। রঙিলা ঘুরে দাঁড়াতেই ও তার হাতে গুঁজে দেয় একছড়া পুঁতির মালা। রঙিলা সেই মালাটাই ছুঁড়ে মারলে ছেলেটাকে। এবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। পুঁথিগুলো ছিটিয়ে পড়ল রাস্তায়।

চয়ন বলে: তুই কী রে? আমাদের কোন মোটিয়ারীকে এমন করলে ঝাড়তাম মারসুর এক কোপ! ঘাড় থেকে মাথার বোঝাটাকে নামিয়ে দিতাম।

শিরদার বলে: আরে, আমিও তাই দিতাম: কিন্তু কি হল জানিস, সারাদিন শুলপি খেয়ে খেয়ে আমার কোন হুঁশই ছিল না। কথাগুলো শুনেও মানে বুঝতে পারিনি। তারপর শোন। সন্ধ্যার দিকে বেলোসার জর মত হল। বললে নাচবে না। আমরা দল বেঁধে চলে গেলাম হাটের পুব দিকের মাঠে। বেলোসা একাই শুয়ে রইল। রাত তখন ভঁইষা হিকৎ। হঠাৎ একটা ছেলে এসে বেলোসাকে বললে—শিগগির এস, তোমাদের শিরদারকে সাপে কামড়েছে! ছেলেটাকে বেলোসা চেনে না। পরিষ্কার আমাদের ভাষায় কথা বলল সে। বেলোসার কোন সন্দেহ হয়নি। ছেলেটার পিছন পিছন চলে গেল বনের দিকে। তার একটু পরেই আমি ফিরে এলাম আস্তানায়। মেয়েটা জর গায়ে একা পড়ে আছে। আমি শিরদার, ও আমার বেলোসা। তাই নাচের আসরে মন লাগল না। ফিরে এসে দেখি. গাছতলায় কেউ নেই। এদিক-ওদিক খুঁজছি, ভানপুরীর শিরদার আমাকে দেখে বললে—কি খুঁজছ? বললুম—আমাদের বেলোসাকে দেখেছ? বললে —হ্যাঁ, এই তো এইমাত্র কে যেন এসে ডেকে নিয়ে গেল। বুকের মধ্যে কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে। বনের যেদিকে নির্দেশ করল ভানপুরীর শিরদার ছুটলাম সেদিকে—

ডাক্তারবাবুর মুখ থেকে শুনেছিলাম শিরদারের জবানিতে সে-রাত্রের দুর্ঘটনাটা। শিরদার উদ্ধার করতে পেরেছিল বেলোসাকে। অবশ্য ঘটনাস্থলে সে গিয়ে পৌছেছিল অনেক দেরিতে। গামছা নিংড়ে যেমন করে জল ঝরানো হয়, তার আগেই তেমনি করে তাকে নিংড়ে শেষ করেছিল সেই সভ্য-জগতের অসভ্য মানুষটা। বেলোসার তখন প্রবল জ্বর—বাধা দিতে পারেনি। ঘটনাচক্রে আর-একজন সভ্য-জগতের মানুষও নাকি সেখানে গিয়ে হাজির হয়। শয়তানটা তখন পালায়।

শিরদার বলে: বেলোসা চিনতে পেরেছিল লোকটাকে। সেই ছোকরাই। সারাদিন যে ঘুরঘুর করেছে তার পিছনে। বেলোসার চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল, বলে: চল! ওকে খুঁজে বার করব! আর সবাইকে ডাক!

কিন্তু গাইতার কঠিন বারণ আছে। মাড়াইয়ে গিয়ে মারামারি করলে কঠিন শাস্তি দেবে গাইতা। তাছাড়া এখনও বাইরের লোক কিছু জানে না। কথাটা চেপে যেতে পারলেই সব দিক থেকে মঙ্গল। শিরদারের নেশা ছুটে যায়, বেলোসার হাত দুটি ধরে বলে: ছেড়ে দে বেলোসা! ছেড়েদে। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ জানে না একথা। জানাজানি হলে কারাংমেটার মাথা হেঁট হয়ে যাবে!

বেলোসা ওকে ধমকে উঠে: তুই ভেড়া! তুই ভেড়া হয়ে গেছিস! তোদের বেলোসার ইজ্জত যে নিল, তাকে ছেড়ে দিবি? তা হলে টাঙ্গি কাঁধে নিয়ে ফিরিস কেন 'ঘোরিয়া মাস্কা'র বাচ্ছা!

শিরদার বলে: ওরা শহুরে মানুষ। মাথার বদলি ওরা মাথা নেয় না। ওদের কিছু বললেই হবে থানা-পুলিস। আমাদের গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে। তোর পায়ে ধরছি—এবারকার মতো ক্ষান্ত দে!

বেলোসা বললে: নিয়া মিয়ার না তিতি গুট্টা!

অশ্লীলতম গালাগালটাও হজম করে নিয়েছিল শিরদার! কেন করবে না। থানা-পুলিশ! বাঘ-সাপ, দত্যি-দানা, দস্যু-ডাকাত—এদের বিরুদ্ধে তবু লড়াই দেওয়া যায়; কিন্তু শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতিনিধিরা যে অশান্তি সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার পাবে কোথায়? গাঁয়ে একটা খুন হলে ওরা দশ-বিশজন মানুষের মাজায় দড়ি বেঁধে কোথায় যেন নিয়ে যায়! তারপর? তারপর কি হয়, কেউ তা জানে না। যারা বেঁচে ফিরে আসে,

তাদের কোন প্রশ্ন করতে ওদের সাহসে কুলায় না। তাই অসভ্যদের অসভ্যতা ওরা উপেক্ষা করে—শহুরে মানুষদের এড়িয়ে চলে শুধু। রঙিলা ক্ষেপে গিয়ে শিরদারের গায়ে থুথু দিল। বললেঃ ভেড়ার বাচ্ছা! যা যা আমার সমুখ থেকে! আমি একাই এর বদলি নেব। আমি যদি সত্যিই 'পাংনাহিন হানার' হই, তবে আমার 'ধুর-বান' ব্যর্থ হবে না! কুষ্ঠ হবে ওর মুখে।

এই বলে মটমট করে আঙুলগুলো ফোটালো রঙিলা—মানে 'চুটকি-ধূর' ছুঁড়ে মারল আন্নকি। ডাইনীরা যেমন মন্ত্রপূত ধূরবান ছোড়ে।

চয়ন বললেঃ তাতে কি প্রমাণ হয়? ধূরবান কার্যকরী হল কিনা, কে জানে?

শিরদার বলেঃ সেই কথাই তো বলছি। মাস ছয়েক পরের কথা। নারানপুরের হাটে গিয়েছিলাম নুন আনতে। সেই ছোকরাটাকে দেখলাম। মুখে কুষ্ঠ হয়েছে তার!

ডাক্তারবাবুর মুখে এ কাহিনী সেদিন নিশ্চুপ শুনে গিয়েছিলাম। তাঁকে বলিনি যে নারানপুরে রঙিলা-বেলোসার সে নির্যাতনের আমিই ছিলাম অপর সাক্ষী। মনকে তখন বুঝিয়ে ছিলাম—কী লাভ অহেতুক বাগাড়ম্বরে। আজ এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে বসে একটু আত্মবিশ্লেষণের লোভ জাগছে। কেন সেদিন সে কথা স্বীকার করিনি? আজ বুঝতে পারি। সেদিন স্বীকার করতে পারিনি লজ্জায়, সঙ্কোচে! গুপ্তেজীর কাছে ধমক খেয়ে আমি সতর্ক হয়েছিলাম। চেতন মনে স্বীকার না করলেও অবচেতন মনের গভীরে একটা অপরাধবোধ ছিল আমার। বুঝতে পেরেছিলাম ওটা নিঃসংশয়ে আমার পক্ষে ভীরুতার কথা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মেরুদণ্ড খাড়া করে প্রতিবাদ করতে পারিনি আমি। ডাক্তারবাবুও একরোখা সিধে মানুষ। তাই তাঁকে ভরসা করে বলতে পারিনি যে সে অত্যাচারের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেও চেপে গিয়েছিলাম আমি। স্বীকার করলে বেলোসার উচ্চারিত অশ্লীলতম গালাগালটা আমার গায়েও এসে লাগতো যে।

কিন্তু ডাক্তারবাবুর কাছে সে কথা স্বীকার না করায় যে কারও কোন ক্ষতি হতে পারে, তা জানা ছিল না আমার। সে কথা তখন জানলে আমি নিশ্চয় স্বীকার করতাম।

ডাক্তারবাবু অনেকদিন পরে একবার আমাকে লিখেছিলেন : ও কথা যদি সেদিন আমাকে জানাতেন তাহলে চয়নের ইতিহাস অন্য রকম হত। তখনই রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যেত আমার কাছে। হয়তো বাঁচিয়ে তুলতে পারতাম তাকে। কিছু মনে করবেন না এঞ্জিনিয়ার সাহেব—গুপ্তেজী কিন্তু ঠিকই বলেছিলেন সেদিন, ক্যালেণ্ডারখানা আপনার পক্ষে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া শোভন হত না।

স্বীকার করি, সর্বান্তঃকরণে আজ স্বীকার করি সে কথা। আর এও বুঝি কী মর্মান্তিক অভিমানে ডাক্তার পিল্লাই ও কথা বলেছিলেন আমাকে। ইংরাজিতে একটা কথা আছে—ঠাট্টা ঠাট্টাই যতক্ষণ না সেটার পুনরুক্তি হয়। একই ঠাট্টার ছলে দ্বিতীয়বার পা-টানাকে আর রসিকতা করা বলা চলে না—সেটা হচ্ছে লেঙ্গি মারা। সেটা ইচ্ছাকৃত অপমান। আমি বিশ্বাস করি, ওঁরা কেউই নিছক রসিকতা করতে আমাকে ও কথা বলেন নি। দুজনেই দুরন্ত অভিমানে ও কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। অপরাধ করায় যেটুকু পাপ, অপরাধ গোপন করার চেষ্টায় পাপ তার চেয়ে কিছু কম নয়। 'হিমালয়ান ব্লাণ্ডারের'ও ধার ক্ষয়ে যায় অপরাধের অকুণ্ঠ স্বীকৃতিতে। আমি সে সুযোগ দু'দুবার হারিয়েছি। মিষ্টার গুপ্তে অবশ্য বাংলা হরফ চেনেন না। ডাক্তার পিল্লাই এখন কোথায় জানি না—যদি ঘটনাচক্রে 'দণ্ডকশবরী'র এই পরিচ্ছেদটা তাঁর হাতে পড়ে—তবে সে পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে।

কিন্তু মনে হচ্ছে কাহিনীর পারম্পর্য হারিয়ে ফেলছি আমি। ডাক্তারবাবু আমাকে ও কথা লিখেছিলেন অনেক পরে—তার আগে পেয়েছিলাম গুপ্তেজীর চিঠি—এবং তারও আগে ঘটেছিল জয়পুরের ডাকবাংলোর সেই বিশ্রী ঘটনাটা। কিন্তু এসব কথা বলার আগে সে যাত্রায় নারানপুরে সংগ্রহ করা চয়নের কাহিনী যতটুকু শুনেছিলাম তা বলা উচিত।

চয়ন প্রায় বছর খানেক ছিল আয়েতু গোণ্ডের বাড়িতে। মাঝে মাঝে নারাঙ্গী নদীর ধারে সেই গুপ্তস্থানে সে দেখা পেত মাল্কোর। মাঠ থেকে

ফেরার পথে সেখানেই অপেক্ষা করত। মাল্‌কো সারাদিনের সব কাজ ভুললেও সাঁঝের বেলা 'জল্‌কে-চল' কর্তব্যটা ভুলত না। কিন্তু রঙিলার পিঙ্গল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে বেশীদিন ফাঁকি দেওয়া গেল না। রঙিলা ওদের চালাকিটা ধরে ফেলল। এরাও সতর্ক হয়ে গেল। হাতে-নাতে ধরতে না পেরে রঙিলা শুধু ঝাঁপিবদ্ধ সাপিনীর মতো আপনমনে ফুঁসতে থাকে।

বছর ঘুরে আবার এল 'উইজ্জা-পাওাম' মাস। চৈত-দাওার পরব এল, গেল। মহুয়া ফুল আর তেন্দুপাতা সংগ্রহের মাস এল, গেল। তারপরেই 'উইজ্জা'-উৎসব। মাঠে বীজ ছড়াবার শুভলগ্ন। বীজ বোনার আগে ওরা একটা বাৎসরিক শিকার অভিযানে বার হয়—'উইজ্জা-ওয়েতা' শিকার। চেলিকের দল শিরাহার দ্বারস্থ হয়। শিরাহা ধ্যানে বসে, তার উপর আঙ্গোপেনের ভর হয়। শিরাহার কণ্ঠে শোনা যায় দেব 'কারদেঙ্গালের' আদেশ—জঙ্গলের কোন অংশে শিকারে গেলে লাভবান হওয়া যাবে তার নির্দেশ পাওয়া যায়। উইজ্জা-ওয়েতা শিকারে কোন ভাল শিকার না পাওয়া গেলে বুঝতে হবে এবার মাঠে ভাল ফসল হবে না। সেটা ভারি দুর্লক্ষণ। শিকারের দেবতা হচ্ছেন দেব কাদরেঙ্গাল, দেবী তাল্লুর-মুট্টাইয়ের ভৈরব। শিকার পেলে প্রথমেই কাদরেঙ্গাল দেবকে কিছুটা মাংস উৎসর্গ করতে হবে। তারপর গাইতা ভাগ করে দেবে বাকি মাংসটা। যার তীর-বিদ্ধ হয়ে ধরাশায়ী হয়েছে প্রাণীটা সে নেবে চামড়াখানা।

এ বছর উইজ্জা-উৎসবে ওরা পেল দুটো খরগোশ, একটা হরিণ আর একটা বুনো-শুয়োর। বুনো-শুয়োরটা মেরেছিল চয়ন। নিজেও আহত হয়েছিল দাঁতাল শুয়োরটার আক্রমণে। বাঁ-পায়ের উরুতে হল বৃহৎ ক্ষত। ধরাধরি করে ওকে সবাই নিয়ে এল বাড়িতে। আখালী কারও কথা শুনলে না। মাল্‌কোর উপর দিল আহত মানুষটার শুশ্রূষার ভার।

রঙিলা ক্ষেপে গেল সে কথা শুনে। তেড়ে গিয়ে আখালীকে বলে: তুই নাকি গুম্‌রিকে বলেছিস্ চয়নকে দেখভাল্ করতে?

গুম্‌রি হচ্ছে মাল্‌কোর পিতৃদত্ত নাম।

আখালী গম্ভীর হয়ে বলে: হাঁ। পরদেশী ছেলেটাকে না হলে দেখভাল্ করে কে? দাঁতালে ওর পা একেবারে ফেড়ে ফেলেছে!

রঙিলা রুখে ওঠে : এরপর দেখছি তোর জ্বালায় সমাজে আর মুখ দেখানো যাবে না। চয়ন হল ওর লামহাদা...

আখালীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বললে : রঙিলা! এই হিংসের জন্তেই তোর গায়ের রঙ হয়েছে পাংনাহিনের মতো!

রঙিলা স্তম্ভিত হয়ে যায়। আখালী কখনও ওকে রূঢ় কথা বলে না।

: তুই আমাকে ডাইনী বললি?

: না পাংনাহিন বলিনি, বলেছি পাংনাহিনের মতো হিংশুটে হয়ে উঠেছিস তুই। শুমরির লামহাদা এসেছে তাতে তোর বুক ফাটে কেন? সারাদিন তুই ওদের দুজনকে আগলে আগলে রাখিস্ কেন? আমি কিছুই বুঝি না, নয়?

ঝড়ের বেগে স্থান ত্যাগ করল রঙিলা। কিন্তু সংকল্প ত্যাগ করল না। দিবারাত্র পাহারা দিতে থাকে ওদের দুজনকে।

মাস দুই ভুগল চয়ন। মনে মনে ধন্যবাদ দিল দাঁতাল শুয়োরটাকে। ভাগ্যে সে জখম হয়েছিল। তাই রোগশয্যায় শুয়ে এতদিনে সে মাল্‌কোকে পেল নাগালের মধ্যে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি পিঙ্গলনয়না বড়বোনের পাহারা এড়িয়ে বেশী কাছে যেতে অবশ্য সাহস পায় না মালকো—তবু ওরই মধ্যে দুটো চুপি চুপি কথা, একটু সোহাগ, একটু স্পর্শ—তাই বা কম কি? আর এই দুর্ঘটনার জন্তেই বোধকরি নরম হল আয়েতু। স্থির হল চয়ন ভালো হয়ে উঠলে মালকোর সঙ্গে তার শুভবিবাহ হবে। 'ইরপু্ পাওাম' মাস থেকে শুরু হয় বিয়ের মরশুম। শেষ হয় বর্ষাগমে। বর্ষাকাল এসে গেল প্রায়। অবিলম্বে বিয়ে না হলে আবার এক বছর বিবাহ নাস্তি। তাই আয়েতু সম্মতি জানাল এবার। খবর পাঠালো কোণ্ডাকে, কাবোঙ্গায়।

চয়ন আজকাল একটু ওঠা-হাঁটা করতে পারে। আজকাল ও আয়েতুর বাড়িতেই থাকে। ঘটুলে নয়। ঘটুলে দিনের বেলা কেউ থাকে না। অসুস্থ মানুষটা একা পড়ে থাকবে কেমন করে? আয়েতু সম্পন্ন গৃহস্থ। তার বাড়িতে দুখানি ঘর। সামনের ঘরে থাকে চয়ন। ভিতরের ঘরখানির নাম 'আম্বা'—মাস্টার্স-বেডরুম। মেয়েরা শোয় ঘটুলে। আয়েতুর অবিবাহিত ছেলে থাকলেও ঘটুলে রাত কাটাতে যেত। বিবাহিত ছেলে থাকলে তাকে তুলতে হত নতুন ছাপরা—বিবাহিত মেয়ে থাকলে যেত স্বামীর ঘরে।

এছাড়া মুরিয়ার বাড়িতে থাকে হাঁস-মুরগী শুয়োরের ঘর আর আলকাজোন। চয়ন অসুস্থ হয়ে পড়ার পর সেও শোয় মায়ের কাছে—আয়া-ঘরে। দেখাদেখি, রঙিলাও ঘটুলে যাওয়া বন্ধ করল। সেও শোয় ঐ ঘরে—মাল্‌কোর গা ঘেঁষে। না হলে রাতে পাহারা দেবে কেমন করে? বাইরের ঘরখানি ছোট। আলগির দিকে একটা খোপ—জানালার বিকল্প। সেই ফোকর দিয়ে তারায় ভরা আকাশের একটা ছোট্ট আভাস।

এতদিন অতটা উতলা হয়নি চয়ন। যে মুহূর্তে শুনল আয়েতু কন্যা সম্প্রদানে রাজি হয়েছে অমনি কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল সে। আর যেন তার ধৈর্য বাঁধ মানে না। খবরটা জানাজানি হয়ে যাবার পর থেকে মালকো আর এ ঘরে আসছে না। যা লাজুক মেয়ে! আথালীই নিয়ে আসে তার পথ্য, তার ওষুধ। আকোইন রঙিলার সঙ্গে সে আজও কথা বলে না।

ছোট্ট কাটুলে শুয়ে শুয়ে উশখুশ করছিল চয়ন। আর মাত্র একমাস। তারপরেই তার দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষ। ধরা দেবে মাল্‌কো। পাহাড়ী জোয়ানী! চয়ন ছোট্ট ফোকর দিয়ে তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকায়। উপত্যকাটা নিঝুম পড়ে আছে। ঝিমুচ্ছে যেন। রাত অনেক। চাঁদের আবছা আলোয় বনে পাহাড়ে মাখামাখি। ঘটুলঘরের দিক থেকে ভেসে আসা সোরগোলটা থেমে গেছে অনেকক্ষণ। জোড়ায় জোড়ায় ওরা শুয়ে পড়েছে নিশ্চয়। যৌবনপুষ্ট মাল্‌কোর দেহটা মনের চোখে ভেসে ওঠে। আর একমাস। তারপর আর বাধা থাকবে না। আর রঙিলা এসে মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে না। মাল্‌কোকে সে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে তার গাঁয়ে, কাবোঙ্গায়। ছোট্ট একটা কুটির বাঁধবে। বন-জঙ্গল দাবড়ে চয়ন নিয়ে আসবে শিকার, সোনা ফলাবে মাঠে—লাজুক মিষ্টি মাল্‌কোর হাতে এনে দেবে নানা সম্পদ। ওদের দুজনের সংসারে সে তৃতীয় ব্যক্তিকে সহ্য করবে না। নিভৃতে থাকবে ওরা দুটিতে গাঁয়ের একান্তে। না, তা কেন? অতিথি বন্ধু আসবে বইকি! অতিথি অভ্যাগতের সেবাযত্নই যদি না করল তবে কেমন মুরিয়ার সংসার গড়ে তুলবে ওরা। আর তাছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি তো আসবেই! মাল্‌কোর বাচ্চা হবে না? চয়নের হাসি আসে! তারও বাচ্চা হবে। চয়ন তাকে শেখাবে তীর-ছোঁড়া, শিকার করা! পাঁচগাঁয়ের মানুষ অবাক হয়ে যাবে

চয়নের ছেলেকে দেখে। ছেলে না মেয়ে? মাল্‌কো কি চাইবে? মেয়ে, না ছেলে? আচ্ছা মালকো কি চয়নের কথা ভাবে এমনি করে? এভাবে রাতের পর-রাত সেও কি আকাশের তারা গোনে? পাশের ঘরেই শুয়ে আছে মালকো। একবার চুপিসারে গিয়ে দেখে আসবে? কিন্তু ঐ ঘরেই আছে রঙিলা। পাংনাহিন হানার! হয়তো শ্যেনদৃষ্টি মেলে বসে আছে পাহারায়। থাক, কাজ নেই। পাশ ফিরে শোয় চয়ন, অস্ফুটে উচ্চারণ করে—মালকো, মালকো! যেন ঐ মিষ্টি নামের অস্ফুট উচ্চারণের মধ্যেও একটা তৃপ্তি আছে!

রাত কত হয়েছে খেয়াল নেই। বোধহয় ওরই মধ্যে একটু ঘুম এসেছিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে খুট করে একটা শব্দ হওয়ায় আচম্‌কা ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। উঠে বসে। দেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মালকো। অন্ধকারে কিছুই ভাল দেখা যায় না অবশ্য। চাঁদ অস্ত গেছে। আবছা তারার আলোয় মনে হল মালকো একটা আঙুল রেখেছে ঠোঁটের উপর। চয়ন কাটুল ছেড়ে উঠে পড়ে। হাত বাড়িয়ে ধরতে যায় মালকোর শাড়ির আঁচল। চকিতে সরে যায় মালকো। চয়নের নাগালের বাইরে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। টলতে টলতে চয়ন এগিয়ে আসে ওর দিকে। কিন্তু ধরা না দেবার খেলায় যেন মেতেছে মালকো। সেও ধীরপদে বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে। নেমে পড়ে উঠোনে।

চয়ন একটু অবাক হয়েছে। মালকোর যে এতটা সাহস হতে পারে তা যেন ওর ধারণা ছিল না। মাল্‌কো লাজুক, মুখচোরা—বোধ করি সেও মাতাল হয়ে পড়েছে বিবাহের দিন স্থির হওয়ায়। বোধ করি সেও আর ধরে রাখতে পারছে না নিজেকে। আবছা আলো-আঁধারিতে চয়ন দেখল উঠানটা পার হয়ে মাল্‌কো ঢুকে গেল ও পাশের একচালাটায়—'আসকালোন' ঘরে। হাতছানি দিয়ে ডাকল তাকে।

চয়ন সাবধানে নামল উঠানে। শরীর তার এখনও দুর্বল। পায়ে জোর পাচ্ছে না। কিন্তু মাল্‌কোর ঐ হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারে এমন ক্ষমতা নেই চয়নের। পায়ে পায়ে সেও এগিয়ে যায় আসকালোন ঘরের দিকে।

নিরন্ধ্র অন্ধকার আসকালোন ঘরটা। একটাও জানালা নেই। একবার

চয়নের মনে হল, কাজ নেই—ফিরে যাই। 'আসকালোন' ঘরটা অশুচি, অপবিত্র। কোন পুরুষমানুষের আসকালোন ঘরের চৌকাঠ পার হবার আইন নেই। তাতে অমঙ্গল হয়। মনটা তাই খুঁত খুঁত করছে। কিন্তু মালকোর সে হাতছানিকে উপেক্ষাই বা করে কি করে?

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মেঝেতে ছড়ানো আছে খড়ের বিছানা। অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে। শীতল একটা নারীদেহ! উন্মুখ প্রতীক্ষায় সেও বুঝি নিমেষ গুণছিল! অন্ধ আদিম আবেগ! অন্ধকারের বুকে নিঃশেষ হয়ে যায় দুজনে…

কতক্ষণ কেটেছে? হঠাৎ বাইরে খুট করে একটা শব্দ হল। সম্বিত পেয়ে চয়ন উঠে বসে! কে যেন আসছে! অন্ধকারের মধ্যে মালকোও নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়ালো। অতি সন্তর্পণে খুলে গেল আসকালোন ঘরের ঝাঁপের দরজা। অন্ধকারে চোখ দুটো অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে। তারার অস্পষ্ট আলোয় চয়ন দেখল একটি নারীমূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারের কাছে। বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। নির্ঘাৎ রঙিলা। সর্বনাশ।

কোথাও কিছু নেই মাল্‌কো সেই নারীমূর্তিকে একটা ধাক্কা মেরে ছুটে বেরিয়ে গেল। ধরা পড়ে গেছে চয়ন। আর রক্ষা নেই। চয়নও উঠে আসে পায়ে পায়ে। আত্মরক্ষার তাগিদে কাজ। আর লজ্জা সঙ্কোচ করে লাভ নেই। রঙিলা যদি এখন ক্ষমা না করে তাহলে আর বাঁচবার কোন পথ নেই। শুধু লামহাদা একা নয়, তার ভাবী পত্নীকেও কঠিন শাস্তি পেতে হবে! মুহূর্তে মনস্থির করে চয়ন। ক্ষমাই চাইবে সে রঙিলার কাছে। ধাক্কা খেয়ে রঙিলা বসে পড়েছে খড়ের গাদায়। চয়ন এগিয়ে এসে তার হাত ধরে তোলে, কিন্তু ও কাঁদছে কেন?

চয়ন কাতর স্বরে বলে: এবারকার মতো মাপ কর রঙিলা!

: রঙিলা?—চম্‌কে ওঠে আগন্তুক মেয়েটি!

সে কণ্ঠস্বরে কিন্তু তার চেয়েও বেশী চমকে ওঠে চয়ন! এতো রঙিলা নয়।—কে? তুমি কে?

ওর বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে যে মেয়েটা এখন কাঁদছে সে আর কেউ নয়—মালকো। কিন্তু তা কেমন করে হবে? অবাক হয়ে চয়ন ভাবে। তাহলে, তাহলে সে মেয়েটি কে? যে তাকে অন্ধকারের মধ্যে হাতছানি দিয়ে

ডেকে এনেছিল? এইমাত্র গায়ের কাপড় সামলে যে ছুটে বেরিয়ে গেল আসকালোন ঘর থেকে? যার সঙ্গে এতক্ষণ সে......

হঠাৎ ওর বুক থেকে বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো মুখ তুললো মাল্কো। মুখ-চোরা লাজুক মেয়েটা বুঝি ক্ষেপে গেছে। দু হাতে চালাতে থাকে চড়-চাপড়-কীল-ঘুঁষি!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেল চয়ন। কোন প্রতিবাদ করল না। সে যেন পাথর হয়ে গেছে!

সেই কালরাত্রির পর থেকেই কি যেন হল চয়নের। পরদিন তাকে দেখে মনে হল সারারাত তার উপর দিয়ে বুঝি প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে গেছে। সমস্ত দিন সে কারও সঙ্গে কথা বলেনি। খায়নি, ঘুমায়নি, ঘর ছেড়ে একবারও বার হয়নি। তারপর কি ঘটেছিল মালকো জানে না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখা দিল মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ।

আয়েতু শিরাহাকে ডেকে পাঠালো, গুনিয়াকে খবর দিল। যথাবিধি 'বোহোরানির' আয়োজন করল। বোহোরানি হচ্ছে রোগমুক্তির জন্য পূজা-অর্চনা। কিন্তু কিছুই ফল হল না।

কিছুদিনের মধ্যে বাধ্য হযে কোণ্ডাকে আয়েতু খবর পাঠালো। চয়ন পাগল হয়ে গেছে। তাকে কাবোঙ্গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হল। সেখানেও শিরাহা আর গুনিয়ার দল নতুন করে বোহোরানির আয়োজন করল; কিন্তু কোন ফল হল না। অবশেষে ওরা শরণ নিল ডাক্তার পিল্লাইয়ের কাছে।

ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: রঙিলার জবানবন্দী নিয়েছিলেন? সে কিছু আলোকপাত করতে পারেনি?

: রঙিলাকে আমি কোনদিন দেখিনি।

: সে কি এখন কারাংমেটায় নেই?

: না! আয়েতু তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আয়েতুর বিশ্বাস রঙিলাই ধুরবান ছুঁড়ে গুণ করেছে চয়নকে!

: কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায়?

: তা কেউ জানে না।

প্রায় মাস ছয়েক পরের কথা।

নিজের কাজের ধান্ধায় ভুলেই গেছি নারানপুরের আধ-শোনা গল্প। ইট-কাঠ-সিমেণ্ট-লোহার স্তূপে ডুবে আছি আকণ্ঠ। ঘটনাচক্রে আবার দেখা হয়ে গেল গুপ্তেজীর সঙ্গে, জয়পুরের গেস্ট-হাউসে। জয়পুর উড়িষ্যায়। জয়পুরের মহারাজার তৈরী অতি সুন্দর একটি গেস্ট-হাউস আছে এখানে। সেকালের দামী দামী আসবাব। প্রকাণ্ড অয়েল-পেণ্টিং, ঝাড়-লণ্ঠন, দামী কার্পেট—সবই ধীরে ধীরে জীর্ণ জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। জয়পুর থেকে মাইল সাতেক উত্তরে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার কেন্দ্রীয় কারখানা তৈরি হচ্ছে—আম্বাগুডায়। আগামী কাল উড়িষ্যার রাজ্যপাল আসছেন দ্বারোদ্ঘাটনে। কাজটির তদারকি ভার আমার উপর। ফলে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে উদয়াস্ত। কদিন ধরে জয়পুরের রাজার অতিথিশালায় আছি। এখান থেকেই ভিত্তিপ্রস্তর বসাবার আয়োজন তদারকি করছি। সেদিন কাজকর্ম সেবে সন্ধ্যাবেলায় গেস্ট-হাউসে ফিরে এসে দেখি বারান্দায় চেনা মুখের জটলা। ডাক্তার পিল্লাই, মেহ্‌রা সাহেব আর গুপ্তেজী। দণ্ডকারণ্যে এ অভিজ্ঞতা খুব স্বাভাবিক। বিশাল এলাকা। যে যার নির্দিষ্ট পথে চক্রাবর্তন করে চলেছে। দিনান্তে যখন হাতের কাছে-পাওয়া ডাকবাংলোতে রাতের মতো মাথা গুঁজতে আসি তখন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এ পাড়ার লোক ও পাড়ার খবর নেয়, ও পাড়ার লোক এ পাড়ার। খুশী হয়ে উঠলাম ওঁদের দেখে। রাতে আড্ডাটা জমবে ভাল। নেপথ্যে বিধাতাপুরুষ বোধ করি হেসেছিলেন।

ডাক্তার সাহেবকে বললাম: আপনার রুগীর খবর কি?

: যথাপূর্বম্।

: আর রোগীর ডাক্তারের?

: বহাল তবিয়ৎ।

মেহ্‌রা সাহেবকে বলি: মধ্যপ্রদেশের মানুষ উড়িষ্যায় যে?

শুনলাম উনি এসেছিলেন কোরাপুটে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার চীফ্‌

এ্যাডমিনিস্ট্রেটারের সঙ্গে দেখা করতে। পারলকোটের জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে।

: আর গুপ্তেজী? আপনি কি মনে করে?

আমি এসেছি ভালুক নাচ দেখাতে!

: ভালুক নাচ! সে আবার কি? কাকে দেখাতে?

গুপ্তেজী বললে: কাকে আবার—দর্শকদের। ভালুকওয়ালা যখন পথের ধারে নাচ দেখাবার আয়োজন করে তখন সে কি জানে—কে কে দেখবে নাচ? সে জানে তার নিয়তি শুধু ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে ভালুক নাচানো। দর্শক? ও আপনিই জুটে যায়!

কথাটা ভাল লাগল না। অবশ্য গুপ্তেজী চিরকালই এ রকম সিনিক। সোজা কথা বাঁকিয়ে বলেন। বুঝলাম, আগামী কালকের উৎসবে আদিবাসীদের বোধ হয় কোন নাচের প্রোগ্রাম আছে। গুপ্তেজী একটি নাচের দল নিয়ে এসেছেন আম্বাগুডায় ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন উপলক্ষ্যে।

বললাম: এটা কিন্তু অন্যায় বলছেন। যে চোখ দিয়ে আমরা ভালুকনাচ দেখি—আদিবাসীদের নাচ নিশ্চয় আমরা সে চোখ দিয়ে দেখি না।

গুপ্তেজী বললেন: সকলে আপনার মতো সহস্রলোচন না হতে পারেন। আমি তো দেখি বাদর-নাচ, ভালুক-নাচ, আদিবাসী নাচ একই জোড়া চর্ম-চক্ষুতে সকলে দেখে থাকে।

আমি প্রতিবাদ কবতে যাই। উদযশঙ্কব, এ্যানা প্যাব্‌লোভার নাচও মানুষে ঐ চোখেই দেখে থাকে। কিন্তু আমার আগেই মেহ্‌রাসাহেব বলে ওঠেন: সত্যিকথা! কেন যে কর্তারা এই নাচের আয়োজন করেন বুঝি না। কী আছে ঐ নাচে যে, বাইরের লোক এলেই একদল অর্ধ-উলঙ্গ ছেলে-মেয়ে জড়ো কবে তাদেব নাচাতে হবে?

ডাক্তার পিল্লাই বাধা দিয়ে বলেন: কিছুই কি নেই? ওদের ঐ নাচের মধ্যে দর্শনীয় কিছুই কি নজরে পড়েনি আপনার?

মেহ্‌রা বিচিত্র হেসে বলেন: একেবাবে কিছুই নেই তা বলি না। ও নাচ দেখতে বেশ নেশা ধরে। কিন্তু ঐ অশ্লীল দৃশ্য বাইরের লোককে ডেকে দেখানোর কি দরকার?

মুখটা কালো হয়ে ওঠে গুপ্তেজীর।

পিল্লাই কিন্তু তবু হাল ছাড়েন না। বলেন: আমি তো অশ্লীল কিছু দেখিনা।

: আপনি বোধকরি শুকদেব গোস্বামী!

এর উপর কথা চলে না। তবু বলিলেন পিল্লাই। বলেন—ওদের নাচের রিদ্‌মে, ছন্দ আর সুর সত্যই অনবদ্য!

হা হা করে হেসে ওঠেন মেহেরা। বলেন: মনকে চোখ ঠারছেন কেন ডাক্তারসাহেব? সত্যি কথাটা স্বীকার করুন। রিদম ছন্দ আর সুর তো উপভোগ করেন না। আসলে দেখেন অন্য কিছু! হাটে-বাজারে পথে-প্রান্তরে যৌবনবতীদের যা কিছু তবু রাখা-ঢাকা থাকে—নাচের উদ্দামতায় তাই প্রকাশ হয়ে পড়ে! অবদমিত কামনার মূলে সুরসুরি লাগে—আরাম পান—আর মুখে বলেন নৃত্যরসের স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করছেন।

এবার পিল্লাইসাহেবের মুখখানাও কালো হয়ে ওঠে!

বেয়ারা কফির ট্রে এনে নামিয়ে রাখে। সুন্দর কফি সেট, দুর্লভ ট্রে। কিন্তু জরাজীর্ণ। মহারাজার আমল গেছে। রাজতন্ত্রের যুগ আর নেই। আমরা বারান্দায় বসে ছিলাম বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে। সামনেই প্রশস্ত লন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ফুলের গাছগুলো আর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। শুধু মৃদু একটা সৌরভ ভেসে আসছে বাগানের দিক থেকে। আকাশে শুক্ল পক্ষের চাঁদ—আবছা আলোয় বাগানটা মোহময়। কিন্তু সবই কেমন যেন বিষিয়ে উঠল।

একপাত্র র-কফি ঢেলে নিয়ে মেহেরা জুত করে বসেন। বলেন: আমি মিস্টার গুপ্তের সঙ্গে একমত। আদিবাসী বাঁদরগুলো জঙ্গলে আছে, জঙ্গলেই থাক। সভ্য-জগতে তাদের ধরে এনে বাঁদর নাচ দেখানো আমায় বরদাস্ত হয় না। ওদের এসব কেলেঙ্কারী বাইরের দুনিয়ার মানুষ যত কম জানতে পারে ততই মঙ্গল!

গুপ্তেজী নির্বাক। নিঃশব্দে কফির কাপে চামচ নাড়তে থাকেন। একবারও বলেন না—এটা তাঁর মত নয়। অথচ মনে আছে একদিন, তিনি আমাকে বলেছিলেন বাইরের দর্শক যখন আদিবাসী গাঁয়ে যায়, তখন গুপ্তেজী তাদের চোখে দেখেছেন সেই দৃষ্টি যা লক্ষ্য করা যায় চিড়িয়াখানার দর্শকের চোখে, পাগলা-গারদের ভিজিটরের চাহনিতে।

মেহরার যেন আশ মেটেনি; বলেন: কেন যে সরকার এদের পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় করছেন জানিনা। ওদের মধ্যে স্কুল খুললে, ওদের কাপড় পরাতে শেখালেই ওরা সভ্য হয়ে উঠবে? অসম্ভব! ওরা মনেপ্রাণে বর্বর! ওদের শোধরানো যাবে না। শুধু দেখতে হবে এ কেলেঙ্কারির কথা যেন বাইরের জগতে জানাজানি না হয়ে পড়ে।

মনে হল মেহরা ইচ্ছে করে গুপ্তেজীর গায়ে পা তুলে দিচ্ছেন। তাই বললুম: সে ক্ষেত্রে আপনাদের পাব্লিসিটি ডিপার্টমেণ্ট আদিবাসী জীবনের যে প্রামান্য চিত্র তুলে এনেছে সেটা অন্যায় হয়েছে নিশ্চয় আপনার মতে।

: হয়েছেই তো!

আমি হেসে বললুম: ভাগ্যে স্যুটিঙের সময় আপনি ছিলেন না। থাকলে নিশ্চয়ই এক্সপোসড্ স্পুলটা ক্যামেরাম্যানের কাছ থেকে কেড়ে নিতেন। অর্ধনগ্ন আদিবাসী রমণীর ছবি নিশ্চয় সভ্য জগতে আনতে দিতেন না!

এতক্ষণে মেহরা সাহেবের মুখটা কালো হয়ে উঠ্ল। গুপ্তেজী আড়চোখে একবার চাইলেন আমার দিকে। অস্বস্তিকর নীরবতাটাকে স্বাভাবিক খাতে আনবার জন্যই বোধকরি তাড়াতাড়ি পিল্লাই বলেন: কিন্তু কেলেঙ্কারী আপনি কোনটাকে বলছেন?

প্রসঙ্গান্তরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন মেহরা। দ্বিগুণ উৎসাহে বলেন: কোনটা নয়? যেমন ধরুন মুরিয়াদের ঘটুল। এখন বিশ্রী ব্যাপারের কথা সভ্যদুনিয়াকে জানিয়ে কী লাভ? ঘরের কেচ্ছা লুকানোর প্রচেষ্টাই স্বাভাবিক। এই কু-প্রথাটাকে যতদিন না আমরা সমূলে উৎপাটিত করতে পারব ততদিন ওটার কথা চেপে যাওয়াই তো উচিত।

ডাক্তারসাহেব দৃঢ় প্রতিবাদ করেন: আমি অন্তত আপনার সঙ্গে একমত নই। প্রথমত এটাকে আমি বিশ্রী ব্যাপার বলে মনে করিনা, দ্বিতীয়ত বিশ্রী হোক সুশ্রী হোক—ব্যাপারটাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে। গোপন করে যাওয়ায় কোনও মঙ্গল নেই।

মেহরা বলেন: বিচার করার আবার আছে কি? অবিবাহিত নরনারী একসাথে রাত্রিবাস করে—তাতে সমাজের প্রত্যক্ষ অনুমোদন আছে—এর চেয়ে নৈতিক অবনতি আর কি হতে পারে?

পিল্লাই হেসে বলেন : আর কি হতে পারে আলোচনার আগে আমি প্রশ্ন করব—এটাকে নৈতিক অবনতির শেষ দৃষ্টান্ত আপনি মনে করছেন কেন? নীতির কোন সংজ্ঞায়?

: নীতির সার্বজনীন সংজ্ঞায়। সর্বদেশে সর্বকালে সতীত্বের যে সংজ্ঞা স্বীকৃত, সেই সংজ্ঞায়।

: কিন্তু সতীত্বের সংজ্ঞাটা তো দেশকাল নিরপেক্ষ একটা কনসেপ্ট নয়। ওদের সমাজে সতীত্বের ধারণাটা অন্য রকম। যেহেতু সেটা আমাদের ধারণার সঙ্গে মেলে না সেই হেতু সেটা খারাপ, এ কথা বলার মধ্যে আর যাই থাক, যুক্তি নেই। দেখতে হবে, ওরা যে সংজ্ঞাটা মেনে নিয়েছে তাতে ওদের সমাজজীবনে কী কী সমস্যা দেখা দিয়েছে—কেমন করে ওরা তার সমাধান করেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, ওরা ওদের ঐ ব্যবস্থায় কি আমাদের চেয়ে বেশী শান্তিতে আছে? সভ্য জগৎ আমাদের শিখিয়েছে, প্রাক্-বিবাহ জীবনে ছেলেমেয়েদের কোন প্রত্যক্ষ যৌন-অভিজ্ঞতা থাকবে না; দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি সভ্য সমাজ এ নির্দেশ স্বতঃসিদ্ধের মতো মেনে নিয়েছে। ওরা এটাকে বিনা প্রমাণে মেনে নিতে নারাজ। ওরা জানতে চায় তার কারণ!

মেহরা সাহেব নাটকীয় ভঙ্গিতে কানে হাত চাপা দিয়ে বলেন : ইয়ে বাৎ শুন্‌নাহি গুনাহ্ হ্যায়!

পিল্লাই হেসে বলেন : সিরেফ কান বন্দ্ করনেসে নেহী চলেগা মেহরা সাব—দো আঁখে ভি বন্দ্ কিজিয়ে।

আমি বললুম : কেন চোখ বন্ধ করতে যাব কোন দুঃখে?

: চোখ-কান খোলা থাকলে যে ধরা পড়ে যাবে, ও আইন কেউই মানে না। অবশ্য আপনারা আপ্রাণ চেষ্টা করেন সে অপ্রিয় সত্যটাকে চাপা দিতে। মেহরা সাহেবের ভাষায় 'ঘরের কেচ্ছা লুকানোর চেষ্টাই স্বাভাবিক।' আপনারা ভাবেন এতেই সমাজের কল্যাণ। ওরা সেটাকে চাপা না দিয়ে সরাসরি অনুমোদন করে। এই তো তফাত?

আমি তর্কের খাতিরে বলি : কিন্তু আপনি কি একটু বাড়িয়ে বলছেন না?

: আমি তো তা মনে করি না। ১৯৩৮ সালে মিস্ ডারোথি ব্রমলি নামে একজন যৌন-বিজ্ঞানী মহিলা ছয় শ' জন আমেরিকান ছাত্রের কাছে চিঠি লিখে জানতে চান তাদের অভিজ্ঞতা। ছাত্রদের মধ্যে শতকরা সত্তরজন

চিঠির জবাবে জানিয়েছে প্রাক-বিবাহ জীবনেই তারা জীবনের মূল সত্যের বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। ডাক্তার ডিকিনসন, ডাঃ কিনসের স্ট্যাটিসটিক্স খুলে দেখুন……

মেহরা সাহেব বাধা দিয়ে বলেন: আমেরিকাই সভ্য জগতের একমাত্র প্রতিনিধি নয়।

: মানলাম, বলেন ডাক্তার পিল্লাই। কিন্তু ওরা সত্যবাদী জাত। আমাদের দেশে এ ধরনের স্ট্যাটিসটিক্স জোগাড়ই করতে পারবেন না। আপনি যদি ছয় শ' জন ভারতীয়ের কাছে চিঠি লেখেন, তাদের প্রাক-বিবাহ জীবনের অভিজ্ঞতা জানাতে, তা হলে দেখবেন অর্ধেকের বেশী লোক জবাবই দেবে না সঙ্কোচে—বাকি ক'জন সত্য গোপন করবে, লজ্জায়।

আমি বললুম: বাস্তবে কি হয়, কি হচ্ছে, সে কথা বাদ দিয়েও যদি আমি প্রশ্ন করি কি হওয়া উচিত, তাহলে আপনি কি বলবেন? বিবাহপূর্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জিনিসটা বাঞ্ছনীয়, না অবাঞ্ছনীয়?

ডাক্তারবাবু বলেন: আপনারাই বলুন আপনাদের মত। আপনারা কি এটাকে অবাঞ্ছনীয় মনে কবেন?

আমি বললুম: আলবাত। না হলে বিয়ে জিনিসটার থ্রিলটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

মেহরা বলেন: শুধু তাই নয়, এতে সভ্য জগতের বনিয়াদই ধ্বসে যাবে।

: আর গুপ্তেজী? আপনাব মত?

কিন্তু কোথায় গুপ্তেজী? তিনি নিঃশব্দে উঠে গেছেন কখন। খটকা লাগল। এমন তো হওয়ার কথা নয়? যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি তাতে তো গুপ্তেজীব অনাসক্ত হয়ে পড়ার কথা নয়?

ডাক্তার সাহেব কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তর্কে মেতে উঠেছেন। বলেন: তর্কশাস্ত্র বলে বিচাবকের কোনরকম 'বায়াস' থাকলে একটা ব্যবস্থার ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা তার থাকে না। আপনারা একটা পূর্বধারণার বশবর্তী হয়ে এ কথা বলছেন?

: এ কথা কেন বলছেন?

: হিন্দুসমাজ আমাদের শিখিয়েছিল হিন্দু নারীর একবার মাত্র বিয়ে হবে, বিবাহের পর স্ত্রী হবে একমাত্র স্বামীর ভোগ্যা। স্বামীর মৃত্যুতে সে আবার ব্রহ্মচর্য পালন করবে। এই আইনকে ঘিরে দানা বেঁধে উঠেছিল সতীত্বের

কনসেপ্ট। মনে হয়েছিল এ ব্যবস্থা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় এবং অনড়। বিধবা-বিবাহ এই ধারণাটায় হানল প্রথম আঘাত। হিন্দু কোড বিল দ্বিতীয়। বিদ্যাসাগর মশাই সতীত্ব কথাটার সংজ্ঞাটাকে দিলেন অনেকখানি বদলে—হিন্দু কোড বিল দিল আর এক ধাপ এগিয়ে। প্রতিবারেই পরিবর্তনের প্রস্তাব ওঠামাত্র সমাজ হাঁ হাঁ করে তেড়ে এসেছিল। মনে হয়েছিল—এ অসম্ভব! মেহরাজীর ভাষায় এতে সভ্য দুনিয়ার বনিয়াদ যাবে ধ্বসে। তা যায়নি কিন্তু। নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর সমাজ তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েনি। এতদিন আমরা জানতাম, ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে প্রজননের গূঢ় সত্যটা গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয়। আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণার জন্যে কত ছেলের জীবন যে আমরা বিষময় করে তুলেছি, কত কুমারী মেয়েকে বলি দিয়েছি উদাসীর মাঠে তার লেখাজোখা নেই। তবে হ্যাঁ, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি খবরটা লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন রাখতে। ঘরের কেচ্ছা লুকানোর চেষ্টাই নাকি স্বাভাবিক! আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন, সাম্প্রতিককালে একদল বৈজ্ঞানিক বলছেন—এ ভুল পথ। ছেলেমেয়েদের ছোট বয়স থেকেই জীবনের মূল সত্যটার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। পশ্চিমের অনেক স্কুলে কৈশোরের শুরুতেই এ বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে। জীবনের তথাকথিত গোপন-সত্যটা তাঁরা প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। আপনাদের কি মত? তাঁরা ভুল করছেন?

মেহরা সাহেব জবাব দিলেন না।

কোণঠাসা হলেও আমি স্বীকার করলাম : না, তাঁরা ভুল করছেন না।

: আর আজ যদি আর একদল বৈজ্ঞানিক আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন—কোন ব্যবহারিক বিজ্ঞান চর্চাই শুধু থিয়োরেটিক্যাল লেকচারে শেখানো যায় না। ছবি, ম্যাজিক-লণ্ঠন আর বক্তৃতায় এ বিষয়ে শিক্ষা দেবার আয়োজন হবে জলে না নেমে সাঁতার শেখানোর চেষ্টা—তাহলে আপনি কি বলবেন?

মেহরা সাহেব আর ধৈর্য সংবরণ করতে পারেন না। তিক্তকণ্ঠে বলেন : দেখুন ডাক্তারসাহেব, সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে··· ···

বাধা দিয়ে পিল্লাই বললেন : আই বেগ টু ডিফার। দুনিয়ায় এমন অনেক জিনিস আছে যার নিজস্ব সীমারেখা নেই—আমরা আমাদের ধারণা অনুযায়ী

সীমারেখা টানি। অনন্ত আকাশকে বলি সিলেস্‌চিয়াল স্ফিয়ার, অবাঙ্‌মানস-গোচরকে গুটিয়ে আনি নারায়ণ-শীলায়! বিদ্যাসাগর মশাই যখন বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব আনেন তখন সেটাকে দিক্‌চক্রবালের শেষ সীমান্ত বলে মনে হয়েছিল। হিন্দু কোড বিল যখন এল তখন বুঝলুম যেটাকে সেদিন দিগন্তের বঙ্কিমরেখা মনে হয়েছিল আসলে সেটা চশমার গ্রীজ! বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাস হবার পর আপনি এখন বলছেন এইটেই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত। মেনে নিই কোন্‌ যুক্তিতে? দিগন্ত-রেখার তো কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই—ওরা একটা সাব্‌জেকটিভ কন্‌সেপ্ট্‌। ওর পরেও দুনিয়া আছে! ওটা আপনার বদ্ধমূল সংস্কারের দিগন্ত মাত্র।

ডাক্তারবাবু থামলেন। মেহরা কি বলবেন ভেবে পেলেন না। গুপ্তেজী আগেই রণে ভঙ্গ দিয়ে উঠে গেছেন। আমি বললুম: বেশ যদি মেনেও নিই, তবু বলব—আপনি যে প্রস্তাব করছেন তাতে অনেক নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

: পাবেই তো। কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান তো সহজ হল। নতুন যে সমস্যা দেখা দিল, দেখতে হবে তার নতুন সমাধান কেমন করে পাওয়া যায়।

: কিন্তু নতুন সমস্যা মূল সমস্যার চেয়ে কঠিনতর হতে পারে। ছেলে-মেয়েদেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় যে ক্ষতি হচ্ছে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ব্যবস্থায তার চেয়ে বেশী ক্ষতি হওয়া অস্বাভাবিক নয। অবাঞ্ছিত শিশুর বন্যায সমাজ ভেসে যেতে পারে। ভ্রূণ-হত্যার হার বেড়ে যেতে পারে· ·

বাধা দিয়ে ডাক্তার সাহেব বলেন: যেতে পারে, আবার নাও পারে। সেদিন আপনাকে বলেছিলাম, ভেরিযার এলুইন সাহেব দুই হাজারটি মুরিয়া বিবাহ পরীক্ষা করেছিলেন—তার মধ্যে মাত্র ছাব্বিশটি ক্ষেত্রে এই দুর্ঘটনার জন্যে চেলিক বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিল। মাত্র শতকরা ১'৩টি ক্ষেত্রে। খুব বেশী নয নিশ্চয়। আর লক্ষ্য করার বিষয়—এই ছাব্বিশটি ক্ষেত্রেই সহজ সমাধান হয়েছিল বিবাহের মাধ্যমে।

আমি বললুম: কিন্তু এত অবাধ মেলামেশা সত্ত্বেও সে দুর্ঘটনা এত কম ক্ষেত্রে ঘটছে কেন?

: সেই রিসার্চই তো করছি। কয়েকটি কারণও আন্দাজ করেছি, তবে মতামতটা জানা'বার মতো সংখ্যাতত্ত্ব এখনও হাতে নেই। সেই জন্যই তো

বলছি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর বিচার করতে হবে। আধুনিকতার প্রতিযোগিতায় এই আদিম মানুষগুলি আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে এ কথা সবিনয়ে স্বীকার করে নিন। ভারতবর্ষের স্কুল-কলেজে বাৎস্যায়ন পড়ানো হয় না, পশ্চিমের আধুনিক বিদ্যায়তনে ওরা থিওরেটিক্যাল ক্লাস খোলার সাহস দেখিয়েছে। মানবিকতার উৎসমুখের এ মানুষগুলি মোহনার মানুষদের উপর টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গেছে আরও এক ধাপ! প্র্যাকটিক্যাল ল্যাবরেটারী খুলে বসে আছে কয়েক শ', অথবা কয়েক হাজার বছর আগে। তার ফলাফল আমরা দেখে শিখতে পারি, ঠেকে শেখার আগে!*

: বেশ তো, বলুন না কি শিখলেন?

: দেখাও শেষ হয় নি, শেখাও নয়। তবে এ পর্যন্ত শিখেছি অনেক কিছু। প্রথমত, সাম্যের চূড়ান্ত জয়। ঘটুলের প্রত্যেকটি সভ্য-সভ্যা যাতে সমান অধিকার পায় সেদিকে ওদের কড়া নজর। মার্কস-এঞ্জেলস্ আমাদের অর্থনৈতিক সাম্য দিয়েছেন—কিন্তু একটি রূপবান ছেলেকে একটি রূপহীন ছেলের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসাতে পারেন নি। একটি পঙ্গু ছেলের অন্নের সংস্থান করেছেন—কিন্তু মানুষ কি শুধু উদর নিয়ে বাঁচে? মুরিয়া সমাজ আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পেরেছে। ঘটুলের সব ছেলে মেয়ের উপর সব মেয়ে-ছেলের সমান অধিকার। শিরপুরী ঘটুলের একটা সত্য ঘটনা বলি। সেখানে একটি চেলিক ছিল. তার নাম চেয়াং। হঠাৎ

---

* ভেরিয়ার সাহেবের সংকলিত একটি হিসাব:

সর্বসমেত পরীক্ষিত বিবাহিত মুরিয়া রমণী		...	...	...	২০০০
বিবাহের এক মাসের মধ্যে প্রথম সন্তান জন্মেছে		...	...	...	১
দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে	ঐ	...	...	...	৭
চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে	ঐ	...	...	...	২১
সাত থেকে নয় মাসের মধ্যে	ঐ	...	...	...	১৭
অর্থাৎ বিবাহের নয় মাসের মধ্যে	ঐ	...	...	...	৪৬ (২·৩ শতাংশ)
এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে	ঐ	...	...	...	১৬৯২ (৮৪·৬ শতাংশ)
সন্তান জন্মানোর সঠিক সময় জানা যায় না		...	...	...	১১২ (৫·৬ শতাংশ)
সন্তান আদৌ জন্মায়নি		...	...	...	১৫০ (৭·৫ শতাংশ)
					২০০০

তার বসন্ত হল। বেঁচে গেল প্রাণে, কিন্তু একটি চোখ কানা হয়ে গেল—মুখেও হল বিশ্রী বসন্তের দাগ। শিরপুরী ঘটুলে সবচেয়ে সুন্দরী মোটিয়ারী তুলোসা। দীর্ঘ রোগভোগের পর চেয়াং যেদিন প্রথম ঘটুলে এল সেদিন কোতোয়ার নির্দেশ দিল, সে তুলোসাকে নিয়ে শোবে। আহা বেচারা কতদিন পরে ঘটুলে এল। কিন্তু বাধ সাধলো তুলোসা নিজেই। বেঁকে বসল সে। কিছুতেই যাবে না চেয়াঙের 'মাসানি'তে। সবাই ছি ছি করে ওঠে। তুলোসা কিন্তু অটল। সুন্দরী তুলোসার প্রতি সবাই অনুরাগী—সেই মূলধনের ভরসায় সে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল চেয়াঙের 'মাসানি'তে যেতে। এ ক্ষেত্রে শিরদারের বিচার করে রায় দেবার কথা। শিরদার বললে—সে নিজে বিচার করবে না। সে জানতে চায় পাঁচজনে কি বলে। আপনারা যাকে ভোট দেওয়া বলেন, তাই দিল সকলে। ব্যালট-ভোট নয়, প্রকাশ্যে হাত তুলে। একজনও সুন্দরী তুলোসার পক্ষে ভোট দিল না। তাকে যেতেই হল চেয়াঙের মাসানিতে। অসংখ্যবার এ দৃশ্য দেখেছি আমি। ভানপুরী ঘটুলের দারোগা ছেলেটি অন্ধ। চক্রবেড়া ঘটুলের কোতোয়ারের একটি পা নেই। চক্রবেড়া হচ্ছে জোড়িদার ঘটুল। সে ঘটুলের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে কোতোয়ারের জোড় হয়েছিল। সভ্য দুনিয়ায় আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন পঙ্গু ছেলেমেয়েরা মুখ চুন করে ঘুরে বেড়ায়···

মেহ্‌রা বাধা দিয়ে বলেন—কিন্তু আমরাও পঙ্গু ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে উদাসীন নই। মূক-বধির-অন্ধদের স্কুল সভ্য জগতেও আছে। আমরাও ছেলেমেয়েদের শেখাই. 'কানাকে কানা বলিও না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না।'

ডাক্তারসাহেব জোর দিয়ে বলেন: হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু একটু তলিয়ে ভেবে দেখেছেন কি? 'কানাকে কানা বলিও না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না'—এ উপদেশের হাইপথেটিক্যাল অ্যাসাম্পশন হচ্ছে 'কানাখোঁড়া একগুণ বাড়া!' তবে নাকি আমরা সভ্য, তাই প্রকাশ্যে কানাকে বলি পদ্মলোচন, খোড়াকে বলি টেনজিং নোরকে! আড়ালে তাই নিয়ে হাসাহাসি করি, তাতে দোষ নেই। কারণ সভ্য সমাজের মূল শিক্ষাটাই হচ্চে—ভিতরে 'ছুঁচোর কেত্তন' চলে চলুক—বাইরে 'কোঁচার পত্তন'টা চাই। এই কথাটাই ঘুরিয়ে বলেছেন আপনি, 'ঘরের

কেচ্ছা লুকাতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক!' ওরা কিন্তু মনে মুখে এক। তাই চেয়াং ওদের কাছে কানা নয়, চেলিক—কোতোয়ার খোঁড়া নয়, সে মানুষ।

আমি বলি: ডাক্তারসাহেব, আপনি মোদ্দা কি বলতে চাইছেন? এই মাড়িয়া-মুরিয়া-ভাত্রা-শবরদের সব ব্যবস্থাই ভাল? আমাদের অনুকরণযোগ্য? 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর?'

: আমি তো তা বলিনি। মাড়িয়াদের মধ্যে নরবলি দেবার ব্যবস্থা চালু ছিল। ওদের বিশ্বাস, নতুন অকর্ষিত জমিতে প্রথম চাষ করার আগে ভূমি-মাকে রক্তপান করাতে হয়। জোর করে এ প্রথা রদ করা হয়েছে। এখনও ওরা কুমারী ভূমি কর্ষণ করার আগে বলি দেয়—তবে মানুষ নয়, মুরগী। এ পরিবর্তনে আমি তো কোন আপত্তি করিনি। কিন্তু তাই বলে উন্নাসিক অভিমানে দূর থেকে ওদের সব কিছুকেই আদিম অসভ্যতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্বরতা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। খোলা মন নিয়ে ওদের প্রতিটি ব্যবস্থা যদি বিচার করে দেখবার ক্ষমতা আপনার না থাকে তবে আমি বলব—আপনার মন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন!

আলোচনায় বাধা পড়ে। গেস্ট হাউসের স্টুয়ার্ট এসে সবিনয়ে নিবেদন করে: ডিনার রেডি!

উঠে পড়তে হল। গুপ্তেজীকেও ডেকে পাঠালাম। চারজনে উঠে গেলাম ভিতরের বড় খানা-কামরায়।

আমার আর পিল্লাই সাহেবের বিছানা হয়েছে এক ঘরে। আর্দালী নন্দু থাপা বিছানা পেতে রেখেছে। আহারাদির পর জামা-কাপড় বদলে শোবার উপক্রম করছি, পিল্লাই সাহেব বলেন: আপনার বন্ধু গুপ্তেজীর কি মাথা খারাপ?

চমকে উঠে বলি: হঠাৎ এ কথা কেন?

: খাবার পরে বাইরের নির্জন বারান্দা দিয়ে আসছি, অন্ধকারের মধ্যে ভদ্রলোক এসে চেপে ধরলেন আমার হাত দুটো! বললেন—'কংগ্র্যাচুলেসন্স!' আমি বললুম—'কিসের জন্য?' তার জবাবে ভদ্রলোক বললেন—'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন।' বলেই ঢুকে গেলেন নিজের ঘরে।

আমি বললুম: ভদ্রলোকের মাথায় একটু ছিট আছে!

তাইতো মনে হয়।

পিল্লাই সাহেব বাতি নিবিয়ে দিলেন।

পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে সেই একই প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। ডাক্তার পিল্লাই বললেন: আমার একটা পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছে করে।

: কী পরীক্ষা?

একটি মাড়িয়া ছেলে বা মেয়েকে সভ্য জগতে নিয়ে এসে মানুষ করলে কি হয়।

রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে মেহ্‌রা সাহেব বলেন: আমি একটি ঘটনা জানি। এক ভদ্রলোক সে চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু ফল হয়েছিল করুণ।

গল্পের গন্ধ পেয়ে আমি ঘড়ি দেখলুম। সাড়ে সাতটা। নটার সময় আমার বের হবার কথা। সুতরাং উস্‌কে দেওয়া চলতে পারে মেহ্‌রা সাহেবকে। বললুম: ঘটনাটা আমরা শুনতে পাইনা?

মেহ্‌রা বলেন: আমার আপত্তি নেই। তবে আপনাদের হাতে সময় আছে তো?

ডাক্তার সাহেব বলেন: আমার তাড়া নেই।

গুপ্তেজী হাঁ না কিছুই বলেন না।

গল্প শুরু করেন মেহ্‌রা সাহেব।

: আপনারা জানেন নিশ্চয়—এই দণ্ডকারণ্য থেকে নানান জাতের আদিবাসীকে চালান দেওয়া হত আসামের চা-বাগানে। দেশ স্বাধীন হবার পর চা-বাগানের সাহেবরা অনেকে বাগান বেচে দিয়ে বিলেতে ফিরে গেল। এখানে শ্রমিক-সরবরাহের যে বিলাতী প্রতিষ্ঠানটি ছিল তারাও চাটি-বাটি গোটালো। সরকার সমস্ত সম্পত্তিটা কিনে নিলেন। আমাকে পাঠানো হল সম্পত্তির দখল নিতে। কোম্পানিব মালিক মিস্টার স্যামুয়েল বারওয়েল মধ্যবয়সী অমায়িক ভদ্রলোক। আমাকে সম্পত্তি হস্তান্তবিত করে বিলেত চলে গেলেন। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির দখল নিতে গিয়ে দেখি এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা অকসান করে বেচে দিতে হবে। গল্‌ফ স্টিক, বিলিয়ার্ড টেবিল, পিয়ানো, গ্রামোফোন। গুদামঘর থেকে বের হল পুরানো 'পাঞ্চ' আর 'লণ্ডন টাইমস্'। আরও কত ধূলিজীর্ণ নথিপত্র। ঘাঁটতে ঘাঁটতে উদ্ধার করলাম খান চারেক প্রাচীন ডায়েরি। লেখকের নাম আর্নে´ষ্ট স্টোন। সম্পত্তির বর্তমান মালিক স্যামুয়েল বারওয়েলের বাপের নাম দলিলে দেখেছি ডেভিড বারওয়েল। অথচ ডায়েরি পড়ে মনে হয় এই স্টোন সাহেব ছিলেন এককালে

সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক। কোন সূত্রে সেটা হাত বদলিয়ে এল বারওয়েল পরিবারের হাতে? যাইহোক, ডায়েরির কয়েক পাতা পড়েই মনে হল ভদ্রলোক এই গহন অরণ্যে শ্রমিক সংগ্রহের ব্যবসা না করে যদি ইংরাজি উপন্যাস লিখতেন তাহলে বেশী অর্থ উপার্জন করতে পারতেন।

ডায়েরি চারখানি পরবর্তীকালে আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। মেহ্‌রা সাহেবের কাছ থেকে সেই চারখানি ডায়েরি এনে পড়েছিলাম জগদলপুরে গিয়ে। সত্যকথাই বলেছিলেন মেহ্‌রা-সাহেব। অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম আমি। বিজন অরণ্যের মধ্যে কয়েকটি বিদেশী চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল দিনলিপির যাদুস্পর্শে। এ কাহিনীর শুরুও জানিনা, শেষও জানিনা—কিন্তু, ঐ জরাজীর্ণ ডায়েরির পাতায় বিধৃত হয়ে আছে 'দি নুকের' হাসি অশ্রু বিজরিত এক খণ্ডকালের ইতিকথা।

উনিশ শ' সাত, আট, নয়, আর দুই বছর বাদ দিয়ে বারো।

উনিশ শ' সাতের ডায়েরিতে দেখি বিপত্নীক এক প্রবাসী খাঁটি ইংরাজ ভদ্রলোককে। আর্নেষ্ট স্টোন। নিজের চেহারার বর্ণনা নেই দিনলিপিতে। বয়স তখন বাহান্ন। সংসারে একমাত্র অবলম্বন তাঁর মেয়ে ডেইজি। তার বর্ণনা আছে। কিন্তু বর্ণনা থাক। উনিশ শ' সাতের বারোই মার্চ মিস্টার স্টোন দিনপঞ্জিতে লিখেছেন:

"ডেইজি আজ একুশ বছরে পড়ল। ওর মা নেই। আমিই ওর বাপ, আমিই ওর মা। ডেইজিব যদি একটা ভাই অথবা বোন থাকত, তাহলে সে হয়তো এমন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ত না। ওর সঙ্গী নেই—এটাই আমাকে সব চেয়ে বেশী পীড়া দেয়। বাহান্ন বছরের বুড়ো বাবা কেমন করে পাল্লা দেবে একুশ বছরের মেয়েব সাথে? তাই বোধ হয় আমরা দুজনেই আত্মকেন্দ্রিক। 'দি নুক'কে কেন্দ্র করে আমরা একটা বৃত্ত টেনেছি। তার বাইরে আমরা সচরাচর যাইনা। না ভুল বললুম। বৃত্ত নয়, উপবৃত্ত। ইলিপস্।। দি নুক ইস্ নট্ দ্য সেণ্টার—ইট হ্যাস্ টু ফোসাই, বেবী এ্যাণ্ড হার পুয়োর ওল্ড ড্যাড।

"যাক্ যা বলছিলাম। বেবী আজ একুশ বছরে পড়ল। ছোট্ট আয়োজন করেছিল তার বাপ। ফাদার জোনস্ এসেছিলেন, মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস্ বারওয়েল এসেছিলেন, গেব্রিয়েল, ডক্টর স্টীভেনস—আর আমরা

দুজন। না ভুল হল আমার, বাদ দিয়েছি বারওয়েল জুনিয়ারকে। মারাত্মক ভুল। মিসেস্ বারওয়েল বেবীকে যে চমৎকার ব্রোচটা দিলেন সেটা পেয়ে বেবী যত খুশী হয়েছে, তার চেয়ে বেশী খুশী হয়েছে বারওয়েল দি জুনিয়ারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। বস্তুত বুড়োবুড়ির সমাবেশে ডেভিড বারওয়েলই ছিল একুশ বছর বয়সকে অভিনন্দন জানানোর প্রকৃত অধিকারী। বারওয়েলের এই ভাইপোটিকে আমারও ভালো লেগেছে। চমৎকার ছেলে। সম্প্রতি এসেছে বিলেত থেকে। ভারতবর্ষ দেখতে এসেছিল, এখন বলছে এখানেই থেকে যেতে চায়। আমার মতো ও বোধহয় এই অদ্ভুত দেশটার প্রেমে পড়ে গেছে। সাবধান ডেভিড্, এ বড় সাঙ্ঘাতিক দেশ—একেবারে অক্টোপাস। যাকে ধরে, তাকে আর ছাড়ে না। শেষ পর্যন্ত আমার মতো পচে মরতে হবে অরণ্যপর্বতে!"

বোধকরি নেপথ্যচারী একজন সেদিন হেসেছিলেন। সেই উনিশ শ' সাত সনের বারোই মার্চ, আর্নেষ্ট স্টোন যখন ডায়েরির পাতায় ডেভিডের উদ্দেশ্যে এ সাবধানবানী লেখেন। বারওয়েলের ভাইপো ডেভিড বারওয়েল উত্তরকালে এই অরণ্য-পর্বতের মায়াবন্ধন সত্যিই কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেনি। সাত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সেই 'বারওয়েল-ভিলা' থেকে সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আসতো 'দি হুকে'। আর্নেষ্ট স্টোনের আইভি-লতায় ঘেরা পাথরের বাংলো-বাড়ির ফটকে সন্ধ্যা হলেই জ্বলতো একটা কেরোসিনের বাতি। ডাইনামো তখনও বসে নি। ফটকের পিলারে একটা কুলুঙ্গি। তার ভিতরে জ্বলে সন্ধ্যাপ্রদীপ। কাঁচের গায়ে লেখা 'দি হুক'। ফটক থেকে লাল কাঁকরের পথটা এসে আশ্রয় খুঁজেছে মোটা মোটা থামওয়ালা গাড়ি-বারান্দার তলায়। দুধারে নানান জাতের ফুলের গাছ—বিলাতী মরশুমি চারা, আর ক্যাকটাস। বৃহদায়তন টব, নানান জাতের পাম। গেটের উপর লতানে জুঁই। ডানহাতি দারোয়ানের কুটুরি, বাঁয়ে একটি ছোট্ট ঘর, তার গায়ে কাঠের ফলকে লেখা 'কেনেল'। এক জোড়া পুড্‌ল থাকত তাতে। গাড়ি-বারান্দা পার হলেই সামনের বড় হল কামরা। ড্রইং রুম। দেওয়ালে ট্যান করা বাঘ-ভালুক আর হরিণের চামড়া, মোষের সিং, সম্বরের স্টফ্‌ট্ মাথা। পিয়ানো, বুককেস আর ডোম বসানো সেজবাতি।

এই ছিল রাজ্য। রাজ্যে রানী নেই। রাজা দিবারাত্র কোম্পানির

কাজে ব্যস্ত। এ রাজ্যের নিঃসঙ্গ বাসিন্দা ছিল রাজকুমারী ডেইজি। বুড়ো আর্নেস্টের—বেবী। পোষা হরিণ, খরগোশ, এক ঝাঁক পায়রা আর পুডল্ ছুটো ছাড়া আর কোন বন্ধু নেই তার। এমন নিঃসঙ্গ মিরাণ্ডার জীবনে এল নায়ক। ডেভিড বারওয়েল। সাতাশ বছরের তারুণ্যের প্রতীক। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় নয়, সাইকেলে চেপে সে আসত সাত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে।

তারপর যা হয়ে থাকে। সাতই আগস্ট আর্নেস্ট স্টোন তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন :

যা অনুমান করেছিলাম তাই হল। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। ডায়েরির এই পাতাটা কালো কালিতে নয়, সোনার জলে লেখা উচিত ছিল আমার। আজ ডেভিড এসে আমাকে জানাল সে আমার বেবীকে বিয়ে করতে চায়। বললুম : ডেইজির কাছে প্রপোস করেছ? ডেভিড বললে—সে ভরসা না দিলে কি এ দুঃসাহস দেখাতে পারি?

দুজনকে ডেকে এনে আশীর্বাদ করলাম। কাল একবার বারওয়েল-ভিলায় যেতে হবে। ডেভিড ছেলেটি ভাল। বিনয়ী, বুদ্ধিমান, দরদী আর কর্মঠ। আমি নিশ্চিন্ত। বেবীর মা বেঁচে থাকলে এমন জামাই পছন্দ হত তার। বেবী সুখী হবে। করুণাময় ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করুন।

কিন্তু তুমি? তোমার কি গতি হবে আর্নেস্ট স্টোন? এই নির্বান্ধব পাষাণপুরীতে তুমি কি নিয়ে বেঁচে থাকবে? সারাদিনের শ্রমে ক্লান্ত দেহটা টেনে নিয়ে যখন ফিরে আসবে 'নুকে' তখন দেখবেনা দক্ষিণের ঘরে কোনও আলোর রেখা। ড্রইংরুমে বসে থাকবে না কোন অভিমানিনী—কেন রাত রাত হল ফিরতে তার কৈফিয়ৎ নেবার জন্যে! ব্যালেন্স-সীট যখন মিলতে চাইবে না তখন কেউ খাতাপত্র কেড়ে নিয়ে বলবে না—উলের গুলি পাকিয়ে দাও দেখি, তোমাব জন্যে একটা দস্তানা বুনব। মধ্যরাত্রে নাইট-গাউন-পরা কোন অভিভাবিকা এসে সেজবাতি নিবিয়ে দিয়ে বলবে না—এত রাত জেগে কাজ করলে শরীর খারাপ করবে!

কিন্তু এসব তুমি কি বলছ, স্টোন? এ চিন্তা যে তোমাকে দুর্বল করে দেবে। মেয়েকে বিদায় জানাতে যে তোমার চোখে জল এসে যাবে? তুমি না ডিভনসায়ারের বিখ্যাত স্টোন বংশের ছেলে? তোমার পূর্বপুরুষ না ট্রাফালগারের যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে? তোমার চোখে জল? ছিঃ!

বুড়ো স্টোনের আশঙ্কা কিন্তু সত্য হল না। মেয়ে বেঁকে বসল। বাপকে ছেড়ে সে কিছুতেই যাবে না। বুড়ো তাকে কত বোঝাল! এই হচ্ছে পুরুষ মানুষের জীবন। মেয়ের বিয়ে হলে তাকে একলা থাকতে হয়। এই হচ্ছে মেয়েমানুষের নিয়তি! পুরাতন আবাস ছেড়ে তাকে নতুন নীড় রচনা করতে হয়। বুড়ো স্টোন বললে : বেবী, আমি শুধু তোমার বাপ নই, আমি তোমার মাও। আমি বলছি—তুমি ওকে বিয়ে কর, তুমি সুখী হবে।

মেয়ে বললে : ড্যাডি! কিন্তু আমি যে শুধু তোমার মেয়ে নই, আমি তোমার ছেলেও! তারপর বাপের বুকে মুখ লুকিয়ে বললে,—তোমার বেবীকে না দেখলে তুমি আর পাঁচ বছরও বাঁচবে না বাবা!

জবাব দেবে কি, ট্রাফালগার যুদ্ধের বীর সৈনিকের অধঃস্তন পুরুষ হু হু করে কেঁদে ফেলল মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

সমাধানের পথের সন্ধান দিল ডেভিড বারওয়েল। বললে : মিস্টার স্টোন তোমার বয়স হয়েছে। এতবড় ব্যবসা তোমার পক্ষে একা দেখাশোনা করা সম্ভবপর নয়। য়ু নীড এ্যান এ্যাসিষ্টেন্ট। তুমি আমাকেই নাও না। আমাকে তোমার ফার্মের পার্টনার করতে পার, কর্মচারীও করতে পার। আমি সবেতেই রাজি। আমার তরফে শুধু একটিমাত্র সর্ত!

হাতে স্বর্গ পেল স্টোন। তবু দুরু দুরু বুকে বলে : কী সর্ত?

: মিস স্টোনের পরিচয় এরপর থেকে হবে মিসেস্ ডেভিড বারওয়েল।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল বুড়োর। হা হা করে প্রাণখোলা হাসি হেসে বললে : সো য়ু প্রপোস টু সার্ভ এ্যাস্ লামহাদা?

: লামহাদা? হোয়াসাট?—নবাগত ডেভিড বুঝতে পারে না রসিকতাটা।

বুঝেছে ডেইজি। বাপের গালে একটা চুমু খেয়ে বলে : য়ু নটি ওল্ড বয়।

আনন্দের জোয়ার এসে লাগল অরণ্যপ্রান্তের নিভৃত নুকে। রোজই পার্টি পিকনিক, শিকার। রায়পুর থেকে, ভাইজাগ থেকে এমন কি সুদূর কলকাতা থেকে এলেন বন্ধু-বান্ধব,—নবদম্পতিকে অভিনন্দন জানাতে। বৃদ্ধ ফাদার জোনস্ নিজে বিবাহ দিলেন ওদের।

ডায়েরির বাকি কয়মাসের পাতা ছাপিয়ে আনন্দস্রোত যেন উপছিয়ে পড়েছে পরের বছরের ডায়েরিতে। ডেভিড অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অত্যন্ত পরিশ্রমী,

ডেভিড তাঁর স্বপ্নকে সার্থক করবে। বাবুর চুরি সে বন্ধ করেছে, বাবুর অত্যাচার সভয়ে থেমে গেছে।

বাবু বলতে ম্যানেজার পি. এল. মিশ্র। কলিকাতাবাসী বন্ধুদের অনুকরণে আর্নেস্ট স্টোন তাঁর দেশীয় কর্মচারীকে 'বাবু' বলে ডাকতেন। মিশ্রজী লোকটি অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছেন দিনপঞ্জিতে। মিশ্র ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের একেবারে কেন্দ্রস্থলে। তাঁর প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়। আর্নেস্ট স্টোন বহুবার বহুজনের মুখে শুনেছেন মিশ্রের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ। মিশ্র এ প্রতিষ্ঠানের অর্থ বেনামীতে খাটাচ্ছে। মিশ্র আদিবাসী গ্রামে অন্যায় অত্যাচার চালিয়ে শ্রমিক সংগ্রহ করছে। সবই শুনেছেন, হাতেনাতে ধরতে পারেন নি। তাছাড়া ঘাঁটাতেও সাহস হত না মিশ্রকে। মিশ্র শুধু ভয় করত ডেইজীকে। তবু সে মেয়ে মানুষ—কতটুকু প্রতিবাদের সাহস হবে তার? তা সত্ত্বেও, একদিন, মনে আছে স্টোনের—ডেইজী এসে বাপের সামনেই কঠিন ধমক দিয়েছেন মিশ্রকে; বলেছিল: ছোটা পারাঙের চায়েতুকে নাকি আপনি মদ খাইয়ে অচৈতন্য মাতাল অবস্থায় রিক্রুট-ভ্যানে তুলে দিয়েছেন?

মিশ্র থতমত খেয়ে বলেছিল: কে বললে?

: কে বললে সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু এভাবে শ্রমিক সংগ্রহ করতে কে আপনাকে অধিকার দিয়েছে?

মিশ্র সামলে নিয়ে বলেছিল: বাজে কথা! এইতো টিপছাপ দেওয়া চুক্তি-পত্র আছে আমার কাছে। চায়েতু স্বেচ্ছার দাদন নিয়ে টিপছাপ দিয়ে গাড়িতে উঠেছে।

সোণালী চুলে ভরা মাথাটা ঝাঁকিয়ে ডেইজী বলেছিল: ছি, ছি, ছি! আপনি না ভারতবাসী! আমরা ইংরাজ হয়ে যা করতে চাই না আপনি টাকার লোভে তাই করছেন? চায়েতুর বৌ আমার কাছে এসে সব কথা বলেছে। আই ওয়ার্ন য়ু মিস্টার মিশ্র। দ্বিতীয়বার আমার বাবার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যেন এ কথা না শুনি!

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন আর্নেস্ট স্টোন। ডেইজীর বয়স তখন কত হবে? পনের? না ষোলো?

সেই মিশ্রকে সায়েস্তা করে দিয়েছে ডেভিড। হাণ্টার দেখিয়ে বলেছে:

এ কথা যদি তোমার নামে দ্বিতীয়বার শুনি তাহলে চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নেব!

মিস্টার স্টোন জনান্তিকে ডেভিডকে ডেকে বলেছিলেন : একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছেনা ডেভিড? লোকটা যদি ইস্তফা দিয়ে বসে? তাহলে কি করবে?

: তৎক্ষণাৎ রেজিগ্‌নেশন এ্যাকসেপ্ট করব।—ডেভিডের সাফ জবাব। আপনি ভ্রান্তধারণার বশবর্তী। ঐ রকম অর্থলোভী অত্যাচারী নীচ ম্যানেজার না থাকলে আপনি আরও সহজে আরও অনেক বেশী শ্রমিক সংগ্রহ করতে পারতেন।

মিশ্র পদত্যাগ পত্র পেশ করতে আসেনি। সাবধান হয়ে গিয়েছিল সে। বৃদ্ধ স্টোন দ্বিগুণ উৎসাহে ব্যবসা বিস্তারে মন দিলেন।

কিন্তু বিধাতা এবার বাধ সাধলেন!

উনিশ শ' আট সনের সতেরই ডিসেম্বর। আর্নেস্ট স্টোনের ডায়েরিতে অল্প কয়েকটি ছত্র লেখা আছে—"কোরাপুট সিমেটারীতে আমার বেবীমাঈকে শুইয়ে রেখে এলাম। শ্বেত-করবী গাছেব তলায়। সাদা ফুল খুব ভালবাসত বেবী!"

ডিসেম্বর মাসের বাকি কটা পাতা শ্বেত-করবী ফুলের মতই সাদা।

পরের বছর জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি আর্নেস্ট স্টোন লিখছেন :

মুশকিল হয়েছে বাচ্ছাটাকে নিয়ে। অতটুকু বাচ্ছাকে আমি কেমন করে মানুষ করব? অথচ প্রায় মাসখানেক হতে চলল। হাসপাতাল থেকে মেজর গেব্রিয়েল তাগাদা দিচ্ছেন। যা হয় মতিস্থির করতে হবে। মিসেস্ বারওয়েল ডেভিডের পরামর্শটাই উচিত বিবেচনা করছেন। কিন্তু তা কেমন করে হবে? আমার বেবী মায়ের ছেলে 'লুকে' মানুষ হবে না? বেবীও শৈশবে মাতৃহারা। তাকে তো মানুষ করে তুলেছিলাম। এবার সাহস পাচ্ছি না কেন? আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি? কিন্তু ডেভিড বদ্ধপরিকর। ছেলেকে সে কোনও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দেশে ফিরে যেতে চায়। যায় যাক! আমি বাধা দেব না। এ অরণ্যপর্বতের সঙ্গে ডেভিডের নাড়ির যোগ নেই। সে এখানে নোঙর গেড়েছিল ডেইজীর আকর্ষণে। ডেইজী নেই—তাই জাহাজও আর বন্দরে থাকতে চাইছে না। কিন্তু আর্নেস্ট?

তুমি কি করবে? তুমি তো জাহাজ নও, তুমি গাছ। এই অরণ্যে শিকড় গেড়েছ তুমি—এর আলোবাতাস, জ্যোৎস্না, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত তোমাকে প্রাণের নিবিড় টানে একান্ত করে বেঁধে রেখেছে। তোমার তো মুক্তি নেই!

অরণ্যের একটা প্রাণময় সত্তা আছে। মানুষীর মতো সেও জানে নিবিড় করে ভালবাসতে। শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন অরণ্য রমণীর হৃদয়ের মতোই দুর্গম, রহস্যময়ী। তার আকর্ষণও তেমনি অমোঘ। আর্নেস্ট স্টোন এ অরণ্যের নাড়ির সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছেন। মুক্তির স্বপ্ন তাই তিনি দেখেন না। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষার পালা যৌবনের প্রারম্ভেই একদফা হয়ে গেছে। হার মানেননি। জীবন-সঙ্গিনীকে হারিয়ে হাল ছাড়েননি। বেবীকে জড়িয়ে খাড়া হয়ে ছিলেন এতদিন। আজ আর সে বয়স নাই—না থাক, তবু তিনি ডিভনসায়ারের স্টোন পরিবারের ছেলে, নতি স্বীকার করলেন না নিয়তির কাছে। জীবনের অপরাহ্নে এসে নতুন করে শুরু করলেন খেলা—এবার আবার নতুন ঘুঁটি—বেবীর বাচ্ছা স্যাম!

বুড়ো স্টোন দিনসাতেক পরে ডায়েরিতে লিখেছে: ডেভিডকে শেষ পর্যন্ত মুক্তিই দিলাম। যে কাণ্ডটা করেছে তারপর তাকে যেতে দেওয়াই মঙ্গল। ও পাগল হয়ে যাবে এখানে থাকলে! কাল সন্ধ্যাবেলা হল বিশ্রী কাণ্ডটা। অফিসের বাবুরা এল দল বেঁধে। মিশ্রের জামা তুলে দেখালে আমাকে। পিঠে সত্যই চাবুকের দাগ! বাবুরা বললে—এর প্রতিকার না হলে তারা থানায় যাবে। অনেক বুঝিয়ে শেষে তাদের ঠাণ্ডা করি। গভীর রাত্রে ডেভিড ফিরল। মদে চুর হয়ে আছে। তবু তখনই তাকে ডেকে পাঠালুম। এসে দাঁড়ালো ঘোলা চোখ দুটো আমার মুখে মেলে। বললুম: মিশ্রকে চাবকেছ?

বললে: হ্যাঁ।

: কেন?

: ইট ওয়াস্ দ লাস্ট ডিসায়ার অফ ডেইজি!

: বুঝতে পারিনা ও মাতলামি করছে, না পাগলামি! কী আর বলব, তবু বললুম: তুমি কি কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত নও?

ও বললে: হ্যাঁ অনুতপ্ত। আই স্যাড রাদার হ্যাভ ইউস্‌ড মাই রিভলভার!

বললুম : তুমি মুক্তি চেয়েছিলে ডেভিড। তোমাকে মুক্তিই দিলুম আমি!

মাতালটা বললে : থ্যাংক্স!

ডায়েরির পরের কয় পৃষ্ঠা পড়ে বুঝতে পারি পরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন তিনি। ডেভিড নয়, আর্নেস্ট স্টোন। কিন্তু ডেভিড থাকেনি। ফিরে গিয়েছিল স্বদেশে। মিশ্রের অপরাধটা শুনেছিলেন পরে। মেয়েটিকে নিয়ে এসে তুলেছিলেন নিজের বাড়িতে। শুনেছিলেন তার করুণ ইতিহাস:

মেয়েটির নাম লিখমু। আর্নেস্ট তাকে বরাবর মেরিয়া নামে উল্লেখ করে গেছেন। বোধকরি লিখমুর এ নামকরণ তিনিই করেছিলেন। মেরিয়ার বাড়ি ছিল বড়া পারাঙ গাঁয়ে। মাত্র দু বছর হল বিয়ে হয়েছে। ডেইজির চেয়ে অল্প ছোট হবে হয়তো বয়েসে। স্বামী ছিল ঘটুলের কোতোয়ার। মিশ্র তাকে দাদন দিয়ে টিপছাপ নিয়েছিল। মেরিয়া বলে, কোতোয়ার জানত না—এ দাদনের অর্থ কি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই ধারণা দাদন নেওয়া হয়েছে বিড়ি-পাতা সরবরাহের জন্য। মিশ্র বেনামীতে বিড়ি-পাতা, হরতুকি-মহুয়া সরবরাহের ব্যবসা করত। তারপর যেদিন মিশ্র দলবল নিয়ে গ্রাম থেকে ওকে ধরে আনতে যায়—তখন সে বুঝতে পারে এ দাদন হচ্ছে আসামে কাজ করতে যাবার জন্য। মিশ্র দয়া করেনি। ওরই মতো অনেকগুলি হতভাগ্যকে মিশ্রের লোকেরা টেনে হিঁচড়ে ভ্যানে তুলে ফেলে। সে রাত্রে মেরিয়া ছিল প্রসব-বেদনায় শয্যাশায়ী। স্বচক্ষে সে কিছু দেখেনি—শুনেছে শুধু আর্তনাদ আর কান্না। সব কথা সে জানেনা। শুধু এটুকু জানে গ্রামের লোক বাধা দিতে গিয়েছিল—একটা খণ্ডযুদ্ধও হয়ে যায়। মধ্যরাত্রে নবজাতকের ক্রন্দনধ্বনি শুনেছিল একবার, আর ভোর রাত্রে দেখে তার খড়ের চালায় আগুন! আর কিছু সে জানেনা। জ্ঞান ফিরে এলে সে জানতে পারে—তার স্বামীকে চালান দিয়েছে কোন চা-বাগানে—আর তার সদ্যোজাত সন্তান পুড়ে শেষ হয়েছে স্বামীর ভিটের সঙ্গে!

আর্নেস্ট নিরাশ্রয় মেয়েটিকে এনে তুললেন দি নুকে। তারই হাতে তুলে দিলেন ডেইজির স্মৃতিচিহ্নটুকুকে—স্যামুয়েল বারওয়েলকে। বারণ করেছিল সবাই। আদিবাসীদের প্রতিশোধ-প্রবণতা ভয়ানক বেশী! সে হত্যা করবে শিশুকে! কিন্তু আর্নেস্ট স্টোন কারও কথায় কর্ণপাত করেননি। বলেছিলেন : মেরিয়া জানে আমি মেরিয়ার মধ্যে খুঁজে পেয়েছি আমার

হারানো মেয়েকে—তাই আমিও জানি স্যামের মধ্যে মেরিয়াও খুঁজে পাবে তার হারানো ছেলেকে। অদ্ভুত যুক্তি। কিন্তু দুনিয়ায় কিছুই অসম্ভব নয়। তাই হল শেষ পর্যন্ত।

অসাধ্য সাধন করলেন আর্নেস্ট স্টোন। চুয়ান্ন বছরের যুবক। ডেভিড নেই। না থাক। একাই সব দেখা শোনা করেন। এদিকে মেরিয়াকে লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব আছে। মেরিযা এ-বি-সি-ডি চিনল, আঁক কষতে শিখল। তিলে তিলে একটি পিতৃহৃদয়ের শূন্য স্থান দখল করে নিল সেই প্রকৃতির সন্তান। শুধু তাই নয়। স্টোনের দৌহিত্রকে নিজের বুকের অমৃত পান করিয়ে মানুষ করে তুলল সে। অদ্ভুত এক পরীক্ষার নেশায় মেতে উঠলেন স্টোন। ব্রিটিশ-ধমনী নিঃসৃত রক্তের সঙ্গে মাডিযা যুবতীর বুকের দুধের ককটেলে কী দাঁড়ায় দেখবেন তিনি। দেখবেন, প্রতিহিংসাপরায়ণ আদিবাসীর মনে বাইবেলের প্রতিক্রিযা।

স্যাম হাঁটতে শিখল—মেরিযা শিখল বুকের উপর কাপড় তুলতে। স্যামের দাঁত আর মেরিয়ার হাতে ছুরি কাঁটা উঠল প্রায় একই সঙ্গে। স্যাম যেদিন শিখল এ বি-সি-ডি, মেরিযা সেদিন শিখল 'লাভ দাই নেবার।' মিসেস্ বারওযেল বলেন : অদ্ভুত তোমার মনের জোর আর্নেস্ট। সব খুইযেও তুমি ভেঙ্গে পড়নি।

কিন্তু বৃদ্ধ আর ব্যবসাযের দেখা শোনা করে উঠতে পারেন না। সব দাযিত্ব এখন মিশ্রের উপর। ডেইজি নেই—মিশ্রের তো পোয়া বারো। মনের আনন্দে চুটিযে ম্যানেজারি করতে বসল সে। কিন্তু গোল বাধল হঠাৎ। মারাত্মক একটা দুর্ঘটনা ঘটতে ঘটতে দৈবক্রমে বেঁচে গেল মিশ্র। সে আসছিল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে সন্ধ্যার পর। একাই। গেটের কাছে দাঁড়িযে কি দেখছিল। হঠাৎ একটা ধারালো তীর তার কান ঘেঁসে গিয়ে বিঁধল ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছের গাযে। মাডিযা তীর। বিষাক্ত। এসেছে সাহেবের বাড়ির দিক থেকেই।

মিশ্র ভয়ে কুঁকড়ে গেল একেবারে। সাহেবের কাছে গিযে কেঁদে পড়ল—তাকে ব্রাঞ্চ-অফিসে পাঠিয়ে দিতে হবে। সাহেবও চিন্তায় পড়লেন। মেরিযাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। সরাসরি অস্বীকার করল মেরিয়া। বাড়ি তল্লাসী করে কোন মাডিয়া ধনুক পাওয়া গেল না। সাহেব জানতেন

মেরিয়া কোনদিন মিশ্রকে ক্ষমা করতে পারেনি। পাহাড়ী মেয়েটির রক্তে প্রতিশোধের আদিম আকাঙ্খা একেবারে চাপা দেওয়া যায়নি 'লাভ দাই নেইবার' মন্ত্রে। মেরিয়ার মরদ আর ফিরে আসেনি কোনোদিন। চা-বাগান থেকে অধিকাংশই অবশ্য ফেরে না। আর্নেস্ট স্টোন এ ক্ষেত্রে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু খবর পাননি। ধূর্ত মিশ্র চালান করবার সময় নাম-ধাম এমনভাবে পাল্টায় যে দূর থেকে আর কোন মানুষকে সনাক্ত করার উপায় থাকে না। মিশ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন—সেও আত্মপ্রান্ত অস্বীকার করে গেছে ঘটনাটা। বড় পারাঙের কোতোয়ারকে বিক্রুটই করা হয়নি আদপে।

আর্নেস্ট স্টোন বাইবেল পাঠের সময়টা বাড়িয়ে দিলেন শুধু। পড়তেন—পরমকরুণাময় যীশু বলেছেন: এক গালে চড় মারলে আর এক গাল বাড়িয়ে দিতে হবে,—অত্যাচারীর সম্বন্ধে ঈশ্বরকে ডেকে বলেছেন: ওরা জানেনা ওরা কি করছে। প্রভু! ওদের তুমি ক্ষমা কর।

মেরিয়া নতজানু হয়ে চোখ বুঁজে সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করত সেই অহিংসার মন্ত্র। শ্যাম দু একটা কথা বলতে শিখেছে। সে শুধু বলত: আমেন!

বৃদ্ধ তাকে বুকে তুলে নিয়ে বলতেন: ইয়েস, ইয়েস। আমেন! হিংসার বদলে হিংসা নয়, ক্ষমা—করুণা!

কিন্তু তবু কিছু হল না। দ্বিতলের ঝোলা বারান্দা থেকে মেরিয়ার হাত ফসকে বিরাট একটা পাম-গাছের টব আবার পড়ল মিশ্রের মাথা থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে! বাইবেলের প্রভাব দেখবার মতো মনের জোর আর ছিল না মিশ্রের। সাহেবের হাতে পায়ে ধরে সে বদলি হয়ে গেল ব্রাঞ্চ অফিসে।

বছর তিনেক পরের কথা। সেবার বাস্তারে ভীষণ গণ্ডগোল। প্রজারা বিদ্রোহ করেছে। সাহেব অসুস্থ। উত্থানশক্তি রহিত। এদিকে ওঁদের প্রতিষ্ঠানের নামে কারা সব গোপনে নালিশ জানিয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। তদন্তে আসছেন উপর-আলা। আর্নেস্ট স্টোন নিরুপায় হয়ে ডেকে পাঠালেন মিশ্রকে। এতদিনের প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষা করতে বাধ্য হয়ে ছুটে আসতে হল মিশ্রকে। কিন্তু সাবধানী লোক সে। দুজন বডিগার্ড নিয়ে সে দেখা করতে এল সাহেবের বাংলোতে তদন্তকারী অফিসারকে নিয়ে। নিচের বড় হল কামরায় বসে এত্তালা পাঠালো উপরের ঘরে। সাহেব তখন দ্বিতলের ঘরে শয্যাশায়ী। উপর থেকে নেমে এল মেরিয়া—ভায়োলেট রঙের

একটা স্কার্ট-গাউন পরেছে সে। গলায় জড়োয়া নেকলেশ। সেজবাতির আলোয় ঝিকমিক করে উঠল। দীর্ঘদিন পরে চার চক্ষুর মিলন হল আবার। মিশ্র দেখল ডেইজির নেকলেশ উঠেছে মেরিয়ার গলায়। মেরিয়া দেখল মিশ্রের চোখে সেই ক্রুর দৃষ্টি আজও তেমনি আছে। তদন্তকারী অফিসার অবাক হয়ে মিশ্রকে জনান্তিকে বললে—ইনি কে?

মিশ্র মেরিয়ার শ্রুতিগোচর করেই জবাব দিলে: এ বাড়ির আয়া!

মেরিয়া অপমানটা হজম করে নিলে। মনে মনে সে করুণাময় যীশুর ভালো ভালো উপদেশগুলি আওড়াতে থাকে। হিংসা নয়, ক্ষমা—করুণা! রাগ সে করবে না, সে তো সত্যই আর্নেস্ট স্টোনের কন্যা নয়, সে এ বাড়ির আয়া-ই।

অফিসার বললে: স্ট্রেঞ্জ গার্ল!

সাহেবের সঙ্গে ওদের দেখা হল। মিশ্র জনান্তিকে মেরিয়াকে বললে—আমাকে এখানে কিছুদিন থাকতে হবে। কিন্তু অজানা হাতের তীর অথবা ফুলের টব যদি আমার কাছ ঘেঁষে ছুটে যায় তাহলে বড়া পারেঙের কোতোয়ারের ঘরের মতো এই কুকটিকেও পুড়িয়ে শেষ করব আমি! মনে রেখ, এখন ডেভিড নেই, মিস্টার স্টোনও এখন শয্যাশায়ী!

মেরিয়ার চোখ দুটো ধ্বক করে জ্বলে উঠেছিল, হঠাৎ সেও বলে বসে: তুমিও মনে রেখ, ডেভিড নেই—কিন্তু যাবার সময় সে চাবুকটা আমাকে দিয়ে গেছে! ড্যাডি শয্যাশায়ী কিন্তু তাঁর পিস্তলে মরচে ধরতে দিইনি আমি!

বলেই উঠে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরে। সেখানে ঘুমাচ্ছিল ওব কুড়িয়ে পাওয়া ইংরাজ সন্তান। স্যামুয়েল বারওয়েল। তাকে জড়িয়ে ধরেছিল বুকে। তারপর উঠে গিয়ে নতজানু হয়ে বসেছিল মেরীমাতার ছবির সম্মুখে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলেছিল: আমাকে তুমি বল দাও। আমি অন্যায় করে ফেলেছি! আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রতিশোধ নয়—করুণা! হিংসা নয়, প্রেম!

তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

তদন্তকারী অফিসার ভাল রিপোর্টই দিয়ে গিয়েছিলেন। অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। সফল হয়েছিল মিশ্রের কারসাজি।

আমি বললুম : কিন্তু মিস্টার মেহ্‌রা, আপনি গল্পটা শুরু করার সময় বলেছিলেন আদিবাসীদের শিক্ষিত করলেও তারা আদিম থেকে যায়— সে সিদ্ধান্তের তো কোন মীমাংসা হল না।

মেহ্‌রা বলেন : গল্পটা আমার শেষ হয়নি এখনও। তদন্তকারী অফিসার চলে যাবার পরেই খুন হয়েছিলেন মিশ্র। আমূল বিদ্ধ হয়েছিল একটা বিষাক্ত তীর তাঁর কণ্ঠ-নালীতে!

ডাক্তারসাহেব বলেন : মেরিয়াই জিত হল শেষ পর্যন্ত? দ্বৈরথ সমরে মিশ্রই হারল?

: একেবারে যে হারল তা নয়। মিশ্র তার আগেই একটা চাল চেলেছিল। তদন্তকারী অফিসারেব ভাল রিপোর্টের পিছনেও কিছু ইতিহাস আছে। দামী মদ আর নগদ মূল্য দিয়েই শুধু অমন একখানি হয়-কে-নয়-করা রিপোর্ট আদায় করা যায়নি। সে রাত্রে অফিসার ভদ্রলোকটিকে সরবরাহ করতে হয়েছিল আরও একটি ম-কারযুক্ত পদার্থ! মাডিয়া যুবতী মেরিয়া!

আমি বললুম : তারপর?

: তারপর আবাব কি? এখানেই তো গল্পের শেষ!

: কিন্তু বুড়ো আর্নেস্ট-স্টোনের কি হল? মেরিয়ার? ফাঁসী?

: বুড়ো স্টোনের কথা জানি না। তবে মেরিয়ার ফাঁসি হয়নি। বেকসুর খালাস পেয়েছিল সে। বিচারে তার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি।

: তাহলে সে নিশ্চয় ফিরে এসেছিল স্টোনের কাছে।

: না। ফিরে সে আসেনি।

: তাহলে কোথায় গেল সেই মেয়েটি?

: তা আমি জানি না। আন্দাজ কবতে পারি। এজাতীয় একটি মেয়ের যাবার মতো একটিমাত্র রাস্তাই এরপর কল্পনা করা যায়। সম্ভবত কোন ব্রথেলে গিয়ে নাম লিখিয়েছিল!

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে ওঠেন গুপ্তেজী : সাট আপ!

ঘরে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা! বেয়ারাগুলোও এগিয়ে এসেছে সে চীৎকারে। মেহ্‌রা উঠে দাঁড়িয়েছেন। বিস্মিত হয়ে বলেন : হোয়াট ডু য়ু মীন?

: আই সে য়ু উইথড্র দ্যাট ইনসাল্‌টিং রিমার্ক!

মেহ্‌রা আপাদমস্তক একবার দেখে নিলেন প্রতিপক্ষকে। তারপর ধীরে সুস্থে বললেন: আপনি ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছেন নাকি?

গুপ্তেজী টেবিলে একটা প্রচণ্ড মুষ্টাঘাত করলেন। ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল কাচের পাত্রগুলো। তাঁর মুখে চোখে ফুটে উঠেছে এক আদিম বর্বরতা। কঠিন কণ্ঠে উনি বলেন: আমি জানতে চাই সেই মাড়িয়া ভদ্রমহিলার নামে যে কুৎসিত কথা আপনি উচ্চারণ করেছেন তা প্রত্যাহার করবেন কিনা।

ডাক্তার সাহেব ওঁর মুষ্টিবদ্ধ হাতটা চেপে ধরে বলেন: আপনি কি ক্ষেপে গেলেন মিস্টার গুপ্তে?

মেহ্‌রা কিন্তু মেজাজ ঠিক রেখেছেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন: না, আমার দৃঢবিশ্বাস সেই খুনে মাগী কোন ব্রথেলেই আশ্রয় নিয়েছিল।

এবং সে কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তেজী যা করলেন তা পাগল অথবা মধ্যযুগীয় নাইট ছাড়া কেউ কল্পনাও করতে পারে না। বাঁ-হাতে ধরা জলের গেলাসটা থেকে আধ গ্লাস এঁটো জল ছুঁড়ে দিলেন প্রাতরাশ টেবিলের অপর প্রান্তে জয়দীপ মেহ্‌রার মুখে।

আমি আর ডাক্তার সাহেব দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওঁদের মাঝখানে। হাতাহাতিটা আর হল না।

কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত। আর তা হল, এক গাদা পিয়ন আর্দালির সামনে।

মেহ্‌রা জামাটা পালটে যখন গাড়িতে উঠলেন তখন তাঁর মুখ দেখে বিদায় সম্ভাষণের কথাও বের হল না আমার মুখ দিয়ে। বলা বাহুল্য তিনি শাসিয়ে গেলেন—এর শোধ তিনি নেবেন। গুপ্তেজী যাবার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। তাঁর পিয়ন এক টুকরা কাগজ এনে দিল আমার হাতে। সেই কাগজের উল্টো পিঠে শুধু লিখে দিলাম: আপনার ব্যবহারে আমরা লজ্জিত। আপনি মেহ্‌রা সাহেবের কাছে ক্ষমা চাইবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারছি না বলে দুঃখিত।

ডাক্তার সাহেব গাড়িতে উঠবার সময় গত রাত্রের কথাটাই বললেন আবার: আপনার বন্ধুটি কিন্তু বদ্ধ উন্মাদ।

দণ্ডকারণ্যের পথ-প্রান্তরে ঘুরে বেরিয়েছি আর সংগ্রহ করেছি ওদের টুকরো কাহিনীর ইতিকথা। ঐ ভাত্রা-পরজা-শবর বোণ্ডো-মাড়িয়া-মুরিয়াদের

গল্প। এসেছিলাম আদিম অসভ্যদের জগতে আধুনিক সভ্যতার স্থায়ী নিদর্শন রেখে যেতে। ইট পাথরের ইমারৎ, কালো পীচমোড়া সড়ক, ব্রীজ-কালভার্ট-ফ্যাকটারী বানাতে। উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসনে সাহায্য করতে। ভগবানের কী বিচিত্র করুণা। সেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখলাম এক অজানা জগতে—যার কথা কলকাতায় বসে কল্পনাও করতে পারতুম না। আমাদেরই দেশে আমাদেরই কালের এই অদ্ভুত অজানা মানুষগুলিকে দেখবার দুর্লভ সুযোগ পেলুম অতি নিকট থেকে। ওরা নাকি মানবিকতার উৎসমুখের বাসিন্দা। মোহনার মানুষদের রীতি-নীতি চাল-চলন ওদের স্বপ্নের অগোচর। ওদের এ নির্জন অরণ্যের বুক বারে বারে কেঁপে উঠেছে আমাদের বুলডোজারের গর্জনে, রোড রোলারের শীৎকারে আর গান-পাউডারের বিস্ফোরণে। আমাদের বুল-ডোজার যতই এগিয়ে গিয়েছে ওরা ততই পিছিয়ে গিয়েছে আরও অভ্যন্তর ভাগে। যারা পালাতে পারেনি তারা নতি-স্বীকার করেছে বুলডোজারের মুখে মহীরুহের মতো। ওদের কিছুটা অংশ পালায় নি, মিশতে চেষ্টা করেছে আমাদের সঙ্গে। তারা সভ্য হয়ে উঠছে। তারা আমাদের থিওডোলাইট বয়ে বেড়িয়েছে অরণ্য পর্বতে, তারা আমাদের নির্দেশে পুঁতেছে লাল-নিশান পাহাড়ের মাথায়। জানিনা তাতে কতটা ভাল হয়েছে, আর কতটা মন্দ। কিন্তু একথা ঠিক, আজ আমার যা দেখবার সৌভাগ্য হল আগামী দিনের দর্শক তা দেখতে পাবে না। দ্রুত বদলে যাচ্ছে আদিম দণ্ডকারণ্য। এদের মাডাই, এদের উইজ্জা-ওয়েতো, এদের হুল্‌কি-রেলো গোড এণ্ডানা নাচ হয়তো গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে পড়বে দু-দশ বছর পরে।

কিন্তু ওরা কি ভাল মনে মেনে নেবে এ পরিবর্তন? ওরা কি বরণ করে নেবে পূব-বাঙলার বাস্তুচ্যুত ভাইবোনদের?

সে কথাই সেদিন আলোচনা করছিলাম পণ্ডিত তারাপ্রসন্নের সঙ্গে। তারাপ্রসন্ন ন্যায়তীর্থের সাক্ষাত পেয়েছিলাম নতুন পত্তন হওয়া উদ্‌বাস্তু গ্রামে। সংস্কৃত শাস্ত্রে অগাধ অধিকার। আমি বলেছিলাম: ভয় হয়, আদিবাসীরা যদি কোনদিন এই নতুন বাসিন্দাদের উপর টাঙ্গি-বল্লম হাতে চড়াও হয়?

তারাপ্রসন্ন বলেছিলেন: আমি সে ভয় করি না। ওরা শান্তিপ্রিয় জীব। সভ্যজগত থেকে আমরাই যুগে যুগে এসে ওদের উপর অত্যাচার চালিয়েছি।

ওরা মুখ বুঁজে সয়ে গেছে। আমরা যদি ওদের গায়ে পা তুলে দিয়ে ঝগড়া না করি, তাহলে ওরাও স্বেচ্ছায় আমাদের ক্ষতি করবে না।

তর্কের খাতিরে আমি বলেছিলুম: ইতিহাস কিন্তু সেকথা বলে না। শ্রীরামচন্দ্র একদিন এই দণ্ডকারণ্যে কুটির নির্মাণ করে শান্তিময় জীবনযাপন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে সুখের সংসারে দেখা দিয়েছিল নির্লজ্জ আদিবাসী সূর্পনখা। রামচন্দ্রের সুখের সংসার সে ছারখার করে দিয়েছিল। তারাপ্রসন্ন আমার এ কথায় তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। মূল রামায়ণ থেকে শ্লোক উদ্ধার করে প্রমাণ করেছিলেন প্রথম অপরাধ সূর্পনখা করেনি, করেছিলেন আর্যসন্তান—শ্রীরামলক্ষ্মণ।

সে সব কথা অন্যত্র বলেছি।

সেই প্রসঙ্গেই তারাপ্রসন্ন বলেছিলেন: শুধু কি সূর্পনখার উপাখ্যান? আদিবাসীরাজ বালিব প্রতি আমাদেব আদর্শপুরুষের ব্যবহারটা লক্ষ্য করে দেখুন। বালি আর সুগ্রীবের গৃহযুদ্ধে তৃতীয়পক্ষ রামচন্দ্র যে ভূমিকা নিয়েছিলেন সেটাও আর্যসভ্যতার গৌরববাহী নয়। শরাহত মহারাজ বালি মৃত্যুর পূর্বে শ্রীবামচন্দ্রেব কাছে জানতে চেয়েছিলেন: কেন তুমি অতর্কিত আক্রমণে আমাকে বধ করলে? আমি পঞ্চনখ হলেও আমার মাংস অভক্ষ্য, আমার চর্ম লোম অস্থি কিছুই তোমায় কাজে লাগবে না। তাহলে কেন তুমি চোরের মতো গুপ্ত স্থান থেকে আমাকে হত্যা করলে? রামচন্দ্র উত্তরে বলেছিলেন—কেন তোমাকে বধ কবেছি তাব কারণ শ্রবণ কর। তুমি পাপাচারী, মহাত্মা সুগ্রীবের পত্নী রুমা তোমার পুত্রবধূ স্থানীয়া, কামবশে তুমি তাকে অধিকার করেছ।—কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র তো জানতেন তাঁর কাছে যা সনাতন ধর্ম আদিবাসী বালিব কাছে সেটাই ভয়াবহ পরোধর্ম। ভবিষ্যতে বালির বিধবা পত্নীকে যখন সুগ্রীব অধিকার করে বসল তখন তো তিনি আপত্তি করেন নি। তাহলে এ মনগড়া যুক্তিব অর্থ কি? সোজা কথাটা রামচন্দ্র স্বীকার কবেননি। করলেও বালি তা বুঝতো না। পলিটিক্যাল মার্ডার কাকে বলে ঐ অসভ্য অনার্য মানুষটি তা জানতো না।

কিম্বা ধরুন শম্বুকের কথা।

আমি বাধা দিয়ে বলেছিলুম: কিন্তু শম্বুক তো আদিবাসী ছিল না। সে ছিল আর্যসমাজেরই নিম্নস্তরের লোক। শম্বুক শূদ্র ছিল।

তারাপ্রসন্ন বললেন : আমার তো ধারণা শম্বুক ছিলেন একজন আদিবাসী সাধক। এই দণ্ডকারণ্যেরই মানুষ। এখানেই তপস্যা করেছিলেন তিনি।

: এ ধারণার পিছনে কোন যুক্তি আছে?

: আছে বইকি। বাল্মীকি রামায়ণ খুলে দেখুন। অকালমৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণ-প্রজা মহারাজের কাছে অভিযোগ আনল। শ্রীরামচন্দ্র শুনলেন রাজ্যের কোথাও না কোথাও গোপনে অনাচার হচ্ছে। তাই এই অকালমৃত্যু। কে করেছে এ অনাচার? স্বয়ং তদন্ত করতে বের হলেন। ঘুরে দেখবেন সারা রাজ্য। পুষ্পকরথে উঠে রাম চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে খুঁজতে থাকেন অপরাধীকে। বাল্মীকি বলছেন : মহাবাহু নরনাথ শ্রীরামচন্দ্র পুষ্পকরথ থেকে প্রথমে পূর্বদিকে দৃষ্টি দিলেন। তারপর উত্তরে, তারপর পশ্চিমে—কিন্তু না, কোথাও কোন অনাচার তাঁর দৃষ্টিগোচর হল না। অতঃপর রাজর্ষিতনয় রাম দক্ষিণাভিমুখে চলতে শুরু করলেন। হ্যাঁ, এইবার তাঁর নজরে পড়ল একটি দৃশ্য :

দক্ষিণাং দিশমাক্রামত্ততো রাজর্ষিনন্দনঃ।
শৈবলস্যোত্তবে পার্শ্বে দদর্শ সুমহৎসরঃ॥

বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণস্থিত শৈবল গিরির উচ্চ মালভূমিব উত্তরপার্শ্বে এক সুমহৎ সরোবর দেখতে পেলেন। শ্রীমান রঘুনন্দন সেই স্বচ্ছতোয়া সরোবর তীরে দেখলেন একজন তপস্বী বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে কঠিন তপস্যায় নিরত।

রামচন্দ্র সেই তপস্বীর সন্নিকটস্থ হয়ে বললেন : হে তাপস, তোমাব পরিচয় দাও। আমাকে ভয় পেও না, তোমার সত্য পবিচয় আমাকে জানাও এবং বল কেন তুমি এমন কঠিন তপশ্চর্যা করছ।

শ্রীরামচন্দ্রের অভয়বাণীতে আশ্বস্ত হয়ে তপস্বী বললেন : আমার নাম শম্বুক। আমি শূদ্র সন্তান। শূদ্র জাতির দুঃখ দুর্দশা দেখে আমি নিতান্ত পীড়িত হয়েছি—তাই তপশ্চযার মাধ্যমে এই জাগতিক দুঃখের পথ থেকে কেমন করে শূদ্র-সন্তান মুক্তি পেতে পারে সেই পথের সন্ধান করছি।

কথা শেষ হতেই ঝল্‌সে উঠ্‌ল আর্যনৃপতির তরবারি। লুটিয়ে পড়ল শম্বুকের ছিন্নশির। আর সেই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল শূদ্র-তপস্বীর সত্য-সন্ধানের মহৎ প্রচেষ্টা।

আমি বললুম : আপনি কিন্তু শম্বুকের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে রামচন্দ্রের প্রতি অবিচার করছেন। শ্রীরামচন্দ্র যুগপ্রথা মেনে চলেছিলেন শুধু।

: মানুন, তাতে তো আপত্তি করছি না আমি। সীতাবর্জনের মতো অন্যায়কেও যখন প্রজানুরঞ্জনের যুগধর্ম বলে মেনে নিয়েছি তখন এ তো সামান্য কথা। আমার আপত্তি অন্যত্র। আমার আপত্তি রামচন্দ্রের রসিকতায় —যখন তিনি সূর্পনখাকে বলেন 'আমার ভ্রাতা অকৃতদার, তুমি তার উপযুক্ত পত্নী হতে পার'; আমার আপত্তি তাঁর নীতি ব্যাখ্যায় যখন তিনি বালিকে বলেন—'তুমি সনাতন ধর্ম ত্যাগ করেছ বলেই তোমাকে হত্যা করলাম'; আমার আপত্তি তাঁর মিথ্যা আশ্বাসে যখন তিনি তপস্যানিরত শম্বুককে বলেন 'আমাকে ভয় করনা, তোমার সত্য পরিচয় দাও।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তারাপ্রসন্ন বলেছিলেন : এরমধ্যে নতুন কথা কিছু নেই। সত্যযুগ থেকেই এই হচ্ছে দণ্ডকারণ্যের ইতিহাস। সভ্যতার অভিমানে আমরা ওদের চিরকাল ছোট করে দেখেছি—ওদের উপেক্ষা করেছি, ঘৃণা করেছি, আর উপকার করবার অছিলায় ওদের শান্তিময় জীবনে অশান্তিকে আমদানি করেছি শুধু।

আমি বললুম : সত্যযুগ নয়, বলুন ত্রেতাযুগ থেকে। শ্রীরামচন্দ্র সত্যযুগের মানুষ ছিলেন না।

তারাপ্রসন্ন হেসে বলেন : কিন্তু দণ্ডকারণ্যে শ্রীরামচন্দ্রই তো প্রথম বহিরাগত আর্যসন্তান নন। তার আগের ইতিকথা খুঁজে দেখুন—দেখবেন সেই একই করুণ কাহিনী। এ অঞ্চলের নাম দণ্ডকারণ্য হল কেন জানেন?

: মহারাজা দণ্ডের রাজ্য বলে।

: হ্যাঁ, কিন্তু কে সেই মহারাজ দণ্ড? কী তার উপাখ্যান।

স্বীকার করতে হল—সে কাহিনী আমার অজানা।

নিপুন কথকের মতো তারাপ্রসন্ন শোনালেন দণ্ডকারণ্যের আদিকথা :

সত্যযুগের কথা। দেবারিগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্যের আশ্রম ছিল এই অরণ্যক-ভূমির দক্ষিণাঞ্চলে। স্ফটিকস্বচ্ছ সরোবরের তীরে শান্ত তপোভূমি। বেদমন্ত্রের ছন্দে উষা সে আশ্রমের প্রতিটি দিনের ডালা বয়ে নিয়ে আসেন—গৃহপ্রত্যাগত পাখীর কূজনের সঙ্গে সন্ধ্যার সামগান যখন মিশে যায় তখন আশ্রমের কর্মাবসান ঘটে। দেশ দেশান্তর থেকে মহর্ষি শুক্রাচার্যের আশ্রমে বিদ্যাভ্যাস

করতে আসেন অযুত শিক্ষার্থী,—দেব-নর-নাগ-গন্ধর্বেরা। ঋষি শুক্রাচার্যের দুই কন্যা—এক বৃন্তে যেন দুটি ফুল; স্থির দীপশিখার মত উজ্জ্বল জ্যেষ্ঠা অরজা, আর রাকারজনীর কৌমুদীকণিকার মত কনিষ্ঠা দেবযানী। দিনে দিনে দুটি ঋষি-কন্যা যৌবনের মধ্যাহ্ন গগনে এসে উপনীত হল। একদিন মহর্ষি দুই আত্মজাকে কাছে ডেকে এনে সস্নেহে বললেন: আমি আমার কন্যাভাগ্য বিচার করে দেখেছি। জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে জানতে পারলেম যে আমার এই আশ্রমে কালে দুজন শিক্ষার্থী আসবেন। একজন উদয়ভানুর মত অনিন্দ্যকান্তি তেজদীপ্ত দেবশিশু—তিনি জয়ন্তপ্রতিম শালপ্রাংশু জিতেন্দ্রিয় তরুণ, আসবেন অমৃত আহরণের ব্রত নিয়ে; অপরজন কাম-ক্রোধ-লোভের বশীভূত সামান্য মানবসন্তান, পার্থিব নৃপতি—আসবেন হলাহলের মোহে। দেবশিশু থাকবেন তাঁর সাধনায় একনিষ্ঠ, শিক্ষা-সমাপনান্তে যেদিন তিনি পিতৃগৃহে ফিরে যাবেন সেদিন ত্রিভুবন তাঁর কীর্তিতে হবে রোমাঞ্চিততনু, অন্তরীক্ষ্যে দুন্দুভি বাজবে, দিগাঙ্গনার দল লাজবৃষ্টি করবে, মঙ্গলশঙ্খ বাজাবে। অপরজন এখানে থেকে বিদায় দেবে আনতশিরে, ক্ষোভে লজ্জায় আত্মগোপনে উন্মুখ। দেবশিশু এ আশ্রম থেকে নিয়ে যাবেন অমৃত আর মানবশিশু হলাহল। তবু, ভাগ্যচক্রের নির্দেশে দেখছি এই দুই কুমার আমার দুই কন্যার রূপে মুগ্ধ হবেন। অরজা, দেবযানি, কোন সঙ্কোচ ক'রনা বল তোমরা কে কার প্রণয়ের প্রত্যাশী হতে চাও।

অরজা অপাঙ্গে লক্ষ্য করে দেখলেন সুযৌবনা প্রিয় ভগ্নীর তনুভঙ্গিমার রূপরুচির উপর সরমের রক্তিমাভা। রাত্রি-হৃদয়ের গোপনচারী উদয়ভানুর আভাস যেমন উষামুহূর্তে ফুটে ওঠে পূর্বাদিগন্তে তেমনি লজ্জার এক সূক্ষ্ম চীনাংশুকে ঢেকে গেছে দেবযানীর মুখপদ্ম। অরজা ধীরে ধীরে বলে: প্রগলভতা ক্ষমা করুন পিতা, কিন্তু এ আপনার কেমন শিশুসুলভ প্রশ্ন? নন্দন-বনের পারিজাত আর পুতিগন্ধময় পুরীষ, অমৃতপয়স্বিনী সুরভি কামধেনু আর মলদলিত শূকরী, প্রস্ফুটিত কল্পতরু আর বিষমুখ কণ্টক-গুল্ম—এ দুইয়ের মধ্যে নির্বাচনের অবকাশ কোথায়?

অরজার প্রশ্নে মহর্ষি শুক্রাচার্য লজ্জা পেলেন।

অরজা পুনরায় বলে: দেবযানী আপনার আদরিণী কনিষ্ঠা কন্যা। আমার মাতৃহীনা অনুজাকেই তাই আমি নির্বাচনের সুযোগ দিলাম।

মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি দেবযানী সলজ্জে বললে: দেবশিশুর প্রণয়ভীরু দৃষ্টিতে অবগাহন-স্নান করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্যা মনে করব।

শুক্রাচার্য বললেন: তথাস্তু! কিন্তু এই দুই শিক্ষার্থীর কেহই আমার জামাতা হবেন না। ভাগ্যলেখা বিচারে দেখছি আমার একটিমাত্র কন্যার বিবাহ হবে—এবং আমার সেই পৃথিবীপতি জামাতা অনন্ত যৌবনের অধিকারী হবেন; জরা তাঁর ত্রিসীমানায় আসতে পারবেনা। অপর পক্ষে আমার অপরা কন্যার ভাগ্যে স্বামীলাভ ঘটবে না। পিতার অবর্তমানে চিরকুমারী আমার সেই আত্মজাকে আমৃত্যু এই আশ্রমের পরিচর্যা করতে হবে। তারই পুণ্যে এ অরণ্যের নিষ্পাপ পশুপক্ষী আশ্রমচারীরা একদিন দাবানলের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে। কন্যা অরজা, এবার আমি তোমাকেই বিশেষভাবে নির্বাচন করতে বলছি, তুমি ভাগ্যের কোন নির্দেশ বরণ করতে চাও?

অরজা পুনরায় অপাঙ্গে কনিষ্ঠা ভগ্নীর দিকে দৃকপাত করেন। দেখতে পান দেবযানীর পদ্মনেত্রে প্রত্যাশা কাঁপছে পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মত। একদিকে অনন্তযৌবন স্বামীর সঙ্গসুখ সোহাগ-সৌভাগ্য আর অন্যদিকে ঋষি-কুমারীর আমৃত্যু ব্রহ্মচর্যের ঊষর মরুভূ। অরজা দেখলেন—নীরব দেবযানীর অক্ষিতারকার দর্পণে প্রত্যাশাস্পন্দিত প্রাণের স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়েছে। একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে অরজা বললেন: হে অক্লিষ্টকর্মা ভার্গব, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হক। আমিই নির্বাচন করছি। আমি বরণ করে নিলেম আমৃত্যু ভর্তৃহীন আশ্রমকুমারীর জীবন। আমার পুণ্যে এ আশ্রম দাবানলের আক্রমণ থেকে যদি রক্ষা পায় তাহলেই আমার জন্ম স্বার্থক বলে মানব।

অন্তরীক্ষ্যে দুন্দুভি বেজে উঠ্‌ল—দিঙ্‌নাগাচার্যরা সাধুবাদ দিয়ে ওঠেন—দিগাঙ্গনারদল অরজার আত্মত্যাগের গৌরবে পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকেন। আনন্দে মহর্ষি অরজার শিরশ্চুম্বন করে বললেন, অরজা, কেন সুযোগ পেয়েও তুমি স্বেচ্ছায় এ কঠোর জীবন বরণ করে নিলে?

অরজা বললেন,: দেবযানী কনিষ্ঠা, একজনের জীবনে যদি কঠোরতা অমোঘ হয় তবে তা জ্যেষ্ঠকেই সহ্য করতে হবে। দ্বিতীয়ত আপনি বলেন হবি প্রয়োগে হুতাশনের মতো কামনার কখনও ভোগে উপশম হয় না। সুতরাং অনন্তযৌবন স্বামীলাভেও তৃপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, পরন্তু যদি আমার পুণ্যে এ আশ্রম রক্ষা পায় তাতে তৃপ্তি আছে। তৃতীয়তঃ যে অনন্যচিত্ত একনিষ্ঠ

দেবশিশু অমৃতের সন্ধানে এখানে আসবেন আমি তাঁর প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করছি না। বরং আমার কৌতূহল দেখতে—সেই কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহের বশীভূত মানুষকে, যে আসবে হলাহলের আকর্ষণে! আমার সাধনা হবে হলাহলের পরিবর্তে তার হাতে অমৃতের ভাণ্ড তুলে দেওয়া।

শুক্রাচার্য বললেন: তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হক।

এরপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। চক্রাবর্তনের পথে আশ্রমদ্বারে বারে বারে এসেছে পুষ্পভারনম্র বসন্ত,—আশ্রমতরুশাখা শীতের হিমেল হাওয়ায় অপর্ণার তপস্যায় মগ্ন থেকেছে, বর্ষাব সমাগমে ঘনঘোর বর্ষণে অরজার অন্তরাত্মা মেঘডম্বরুর তালে তালে দুরু দুরু করে কেঁপেছে, বনকপোতের কূজনে খরমধ্যাহ্নের কর্মহীন অবসর হয়েছে অঙ্কিততনু। দেবশিশু কচ এসেছেন দৈত্যগুরুর আশ্রমে—একমাত্র সহচরী ভগ্নী দেবযানীব সান্নিধ্য থেকেও বঞ্চিতা হয়েছে অরজা। নিরলস সেবায় আশ্রমের যাবতীয় কাজ সে করে যায়—আর একটি চক্ষু মেলে রাখে আশ্রমদ্বারের দিকে—কখন আসবেন সেই দোষে-গুণে গড়া হলাহল সন্ধানী মোহান্ধ মব-মানব।

মহর্ষি আশ্রমে নাই,—তিনি গিয়েছেন মধুমন্ত নগরে মহারাজ দণ্ডের বাজ্যাভিষেকে। অরজাব উপর দিয়ে গিয়েছেন আশ্রমের দায়িত্ব। মহারাজ দণ্ড মহীপতি ইক্ষ্বাকুব কানিষ্ঠ পুত্র—দণ্ডধর মনুর পৌত্র। মনু পৃথিবীদুর্জয় প্রিয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে নিজ রাজ্যভার দিয়ে বলেছিলেন—'তুমি পৃথিবী মধ্যে রাজবংশগণের রাজা হও। পবমোদাব। আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। তুমি সহস্র বৎসরকাল প্রজাপালন কর। কিন্তু অকারণে কাউকে দণ্ড দিও না। দণ্ডপ্রদান বিষয়ে তুমি যত্ন পরায়ণ থাকবে। তাহলেই তোমার ধর্ম রক্ষা হবে।'

কালে সেই ইক্ষ্বাকুর শতপুত্র হল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের নাম দণ্ড। শৈশব থেকেই দণ্ড মূঢ় এবং অকৃতবিদ্য। এর ভাগ্যে নিশ্চয় দণ্ডভোগ আছে, এই কথা মনে করে মহারাজা পুত্রকে দূরে পাঠালেন। বিন্ধ্য এবং ঋষ্যমূখ পর্বতের মধ্যে মধুমন্ত নামে এক নগরী নির্মাণ করে দণ্ডকে সেই জনপদের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন! দণ্ড মূঢ় এবং অকৃতবিদ্য,—কিন্তু পুরোহিত নির্বাচনে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল সে। কবিশ্রেষ্ঠ উশনা কবি অর্থাৎ মহর্ষি শুক্রাচার্যকেই সে পৌরহিত্যে বরণ করে নিলে।

দীর্ঘদিন পরে আশ্রমে ফিরে এলেন মহর্ষি। সঙ্গে তাঁর এক অনিন্দ্যকান্তি তরুণ নৃপতি। বৃক্ষান্তরাল থেকে অতিথির দিকে দৃকপাত করে মুগ্ধ হয়ে গেল আশ্রমতনয়া অরজা। অন্তরালে পিতার কাছে আগন্তুক অতিথির পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। ভার্গব বললেন: ইনিই ইক্ষ্বাকুপুত্র মধুমন্তনগরাধিপতি মহারাজ দণ্ড। আমার হতভাগ্য শিষ্য।

অরজা সবিস্ময়ে বলেন: আপনাকে পৌরহিত্যে বরণ করবার সৌভাগ্য যাঁর হয়েছে তাঁকে ভাগ্যহীন বলছেন কেন?

মহর্ষি বললেন: হতভাগ্য দণ্ড সুন্দরের উপাসক, কিন্তু তার উপাসনার মন্ত্র তামসিক। আশ্চর্য ওর চরিত্র। অতি ঊর্ধ্বলোকে উঠবার ক্ষমতা ওর আছে—কিন্তু গৃধ্রের মতো ওর দৃষ্টি শুধু মৃতদেহের দিকে। অমৃতে ওর রুচি নেই,—ও নীলকণ্ঠ শিবের মতো হলাহলের সাধনায় মত্ত।

শিউরে উঠ্ল অরজা। এই কি তাহলে সেই কুমার, যার হাতে বিষের পরিবর্তে অমৃতের ভাণ্ড তুলে দেবার সাধনায় সে প্রহর গুনেছে আযৌবন?

অরজার দিবসের কর্মে এবং রাতের অনিদ্রায় শুধু এক চিন্তা। কেমন করে ঐ দুর্মদ রাজকুমারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা যায়। দণ্ডের চরিত্রে সাত্ত্বিকতার চিহ্নমাত্র নাই। রাজসিকতা অল্প—তামসতপস্যায় সে নিষাধের মতো বনে বনান্তরে পশুপক্ষী শিকার করে ফেরে। অরজা অন্তরাল থেকে দেখে দুরন্ত-যৌবন রাজপুত্রের উদ্দাম মৃগয়া। অরজার অন্তরাত্মা আর্তনাদ করতে থাকে, সে মনে মনে জপ করে: 'হে ঈশ্বর, আমাকে বল দাও—আমি ঐ তামসতপস্বীকে এনে দেব সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান! প্রেমের স্পর্শমণির ছোঁয়ায় ওর লৌহকঠিন হৃদয়কে পরিবর্তিত করব হিরণ্ময় সম্পদে। প্রমাণ দেব ও মানুষ,—ও অমৃতের পুত্র!

তবু ঐ রাজপুত্রের সম্মুখে আসতে সাহস হয় না তার। পিতা বলেছেন দণ্ডও সুন্দরের উপাসক, কিন্তু তার সাধনার মন্ত্র তামসিক। অরজা সেই মন্ত্রের পরিবর্তন আনবে—কিন্তু কোন যাদুবলে? সে শুধু মনে মনে বলে: হে ঈশ্বর আমাকে শক্তি দাও।

সেদিন রমনীয় চৈত্রসন্ধ্যা। মৃদুমন্দ বাতাসে বনপথে ঝরে পড়ছে অশোক কিংশুক পলাশ। মৃগয়া-অন্তে মৃতপশু স্কন্ধে বহন করে শ্রান্ত দেহে মহারাজ দণ্ড আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করছেন। সহসা বনান্তরাল থেকে ভেসে-আসা এক

স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। বিজন অরণ্যে কে গাইছে এমন অপার্থিব সঙ্গীত! মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। অন্তরালবর্তিনীকে উদ্দেশ করে বলেন: হে সঙ্গীতমগ্না, তুমি কে?

অকস্মাৎ অর্ধপথে স্তব্ধ হয়ে যায় অসমাপ্ত সঙ্গীত। বনান্তরাল থেকে ভেসে আসে ভয়ত্রস্ত বামাকণ্ঠ: হে মৃগয়াচারী মহারাজ, আমি এ অরণ্যের বনদেবী।

: কিন্তু তুমি অর্ধপথে সঙ্গীত সমাপ্ত করলে কেন?

: সঙ্গীত নয় মহারাজ, এ আমার আর্তবিলাপ!

: বিলাপ?—স্তম্ভিত হন মহারাজ দণ্ড—কেন? বিলাপ কিসের? বল কে তোমাকে দুঃখ দিয়েছে; আমি এক্ষণি তার শিরচ্ছেদ করব।

গোপনচারিণী অরজা বলে: এক অত্যাচারী নরপতি এসে এ অরণ্যের পশুপক্ষীর প্রাণ হনন করে চলেছেন ক্রমাগত। তাই আমার এ শুধু সমবেদনার অশ্রু! করুণার উৎসমুখে আমার এ সঙ্গীতের জন্ম।

সমবেদনা? করুণা? অর্থগ্রহণ হয় না মূঢ়মতি দণ্ডের। বলেন: তোমার সঙ্গীতে আমি মুগ্ধ হয়েছি, তুমি আবার আমাকে গান শোনাতে পার না?

অন্তরাল থেকে অরজা বলে: পারি। যদি তুমি অত্যাচারীর ভূমিকা ত্যাগ করে সঙ্গীতপিপাসুর মতো আমার গান শুনতে আস।

: আমাকে কি করতে হবে?—অকৃতবিদ্য দণ্ডের সরল প্রশ্ন।

: অকারণ পশুবধ বন্ধ করতে হবে। বনচারিণীর সঙ্গীতের মতো বনচারী পশুপক্ষীকেও ভালবাসতে হবে।

পরদিন সন্ধ্যায় দণ্ড সেই অরণ্যের একান্তে এসে দাঁড়ালেন, অন্তরীক্ষ্যচারিণীকে সম্বোধন করে বলেন: হে নেপথ্যবাসিনী বনদেবী, দেখ আজ আমি পশু বধ করতে বের হইনি। আজ আমাকে তোমার সঙ্গীত শোনাও।

অরণ্যের অন্তরাল থেকে ভেসে এল অপূর্ব সঙ্গীত। তৃপ্ত হলেন মহারাজ। বললেন: হে বনেশ্বরী, তুমি অন্তরাল ত্যাগ করে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াও।

অরজা বললেন: আমাকে মার্জনা করবেন রাজেন্দ্র। আজ নয়।

তারপর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মহারাজ দণ্ড সেই বনবীথিকার প্রান্তে এসে বসেন, প্রতিদিনই বৃক্ষান্তরাল থেকে ভেসে আসে স্বর্গীয় সঙ্গীত। মুগ্ধ মহারাজ প্রতিদিনই অনুরোধ করেন: দেখা দাও।

শিহরিত অরজা বলে : আজ নয় মহারাজ।

তিল তিল করে পরিবর্তন হতে থাকে মূঢ়মতি দণ্ডের। অকারণ পশুবধ বন্ধ করেছে সে, সুরাপানের মাত্রা কমিয়েছে। অদেখা বনদেবীর আকর্ষণে প্রতি সন্ধ্যায় এসে বসে থাকে সঙ্গীতমুগ্ধ রাজকুমার। অরজা সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে না। মনে হয় এখনও সময় হয়নি। তবু তামস-তপস্বীর পরিবর্তনে আশান্বিতা হয় সে।

কিন্তু অরজার মন্দভাগ্য। এক চৈতালী বৈকালে ঘটে গেল অঘটন। অন্যমনস্কভাবে মহারাজ পদচারণ করছিলেন আশ্রমসংলগ্ন উদ্যানে। সহসা এক সরোবর তীরে মহারাজ দেখতে পেলেন পরমাসুন্দরী এক ঋষিকন্যা অবগাহন স্নান করছেন। মুগ্ধ হয়ে গেলেন মহারাজ। বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করে সেই নিরুপম রূপবতী বরবর্নিনী কন্যার অবগাহন স্নান প্রত্যক্ষ কবতে থাকেন। স্নানশেষে পূর্ণকলস কক্ষে ঋষিকন্যা সরোবরের তীরে উঠে এলে দণ্ড বৃক্ষান্তবাল থেকে বেবিয়ে এলেন। পথবোধ কবে দাঁড়ালেন সত্যস্নাতার। শিউরে উঠ্‌ল অরজা। তার দৃষ্টি হল নত, নিঃশ্বাস হল ঘন।

মহারাজ দণ্ড তার দিকে একপদ অগ্রসর হয়ে বললেন : শুভে সুশ্রোণি! তুমিই কি সেই বনদেবী?

সিক্তবসনে কোনক্রমে দেহ আবৃতা করে অরজা বলে : আমার সঙ্গীতেই মহারাজ পবিতৃপ্ত হযেছেন বটে, কিন্তু আমি বনদেবী নই।

: তবে তুমি কাব দুহিতা, এবং কোথা থেকে এ বিজন অবণ্যে আবির্ভূতা হলে? শুভাননে। আমি তোমাকে দেখেই কন্দর্পবানে নিতান্ত পীড়িত হয়েছি। তোমার পরিচয় দাও।

আশ্রমমৃগী সভয়ে এবং সলজ্জে ধীরে ধীরে বলেন : রাজেন্দ্র! আমাকে অক্লিষ্টকর্মা ভার্গবের জ্যেষ্ঠা কন্যা বলে জানবেন। আমার নাম অরজা। আমি এই আশ্রমেই বাস করি। রাজন। আমি পিতার অধীনা, সুতরাং আপনি আর অগ্রসর হবেন না। আমাকে বলপূর্বক স্পর্শ কববেন না।

অরজা এই কথা বল্‌লে কামার্ত দণ্ড কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করে : বরাননে, সুশ্রোণি! তোমাকে লাভ করবার জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আর ক্ষণকাল মাত্রও বিলম্ব করতে পারব না! সুন্দরি! তুমি শীঘ্র আমার প্রতি প্রসন্না হও!

পিতার ভবিষ্যতবাণী স্মরণ হল অরজার। মোহান্ধ তামসতপস্বী মানব-শিশু এসেছেন হলাহল আহরণে! কিন্তু কী তীব্র সে হলাহল! ভার্গবের ক্রোধবহ্নিতে চরাচর দগ্ধ হয়ে যাবে যে! সানুনয়ে অরজা বললেন: হে অনবদ্যাঙ্গ! আমার মহাত্মা তপোধন পিতা আপনার গুরুস্থানীয়। আপনি অন্যায়ভাবে আমার অঙ্গ স্পর্শ করলে তিনি কঠিন অভিশাপ দেবেন! পিতা ক্রুদ্ধ হলে ত্রৈলোক্য দগ্ধ করতে পারেন, এমন অন্যায় কার্য আপনি কছুতেই করবেন না!

লালসাজর্জর দণ্ড বললেন: কিন্তু বরারোহে; আমি নিতান্ত মদমত্ত—আমি ধৈর্য ধারণ করতে অক্ষম। তুমি অবিলম্বে আমাকে ভজনা কর!—বলে সিক্তবসনা ঋষিকন্যার দিকে তিনি দুই বাহু প্রসারিত করে অগ্রসর হয়ে আসেন।

আর্তকণ্ঠে অরজা বলতে থাকে: নরশ্রেষ্ঠ! এখনও ক্ষান্ত হন। যদি আমার প্রতি আপনার নিতান্ত অভিলাষ হয়ে থাকে তবে ধর্মসঙ্গত উপায়ে মহাপ্রভাবশালী পিতার কাছে আমায় পানি প্রার্থনা করুন;—আমি নিশ্চয় বলছি প্রিয়শিষ্যকে কন্যাদান করে তিনি নিতান্ত সুখীই হবেন!

কিন্তু মূঢ়মতি কামার্ত দণ্ড কোন উপদেশই শুনলেন না। বললেন: সুন্দরি, তোমাকে লাভ করবার মূল্য দিতে যদি আমাকে নিদারুণ শাপগ্রস্ত হতে হয়, যদি আমার প্রাণও যায়, তবু আমি এই মুহূর্তে বিরত হতে পারছি না!

বাল্মীকি বলছেন,

এবমুক্তা তু তাং কন্যাং দোর্ভ্যাং প্রাপ্য মহদ্বলী।
বিস্ফুরন্তীং যথাকামং মৈথুনায়োপচক্রমে॥

এই নিদারুণ অনর্থ সম্পাদন করেই মূঢ়মতি দণ্ড আত্মস্থ হলেন। অপরাধের গুরুত্ব অনুধাবন করে নিতান্ত ভয়ে কণ্টকিত হয়ে উঠলেন। ধূসরস্তনী বিকীর্ণমূর্ধজা অরজার দিকে আর দৃকপাত মাত্র না করে তদ্দণ্ডেই মধুমন্তনগর অভিমুখে যাত্রা করলেন। বেপথুমান অরজা পিছন থেকে আর্তকণ্ঠে বারম্বার ডাকলেন—কিন্তু ভয়ার্ত দণ্ডের কর্ণকুহরে সে আহ্বানধ্বনি প্রবেশমাত্র করল না। কুমারী অরজা ক্ষোভে লজ্জায় কাঁদতে কাঁদতে আশ্রমে ফিরে এল। তার হৃদয়ের অমৃতকুম্ভ পড়ে রইল অনাদৃত—তামসতপস্বী সে পূর্ণকুম্ভের দিকে ফিরেও তাকায়নি।

কিছুক্ষণ পরেই আশ্রমাধিপতি মহর্ষি শুক্রাচার্য বনান্তর থেকে আশ্রমে ফিরে এলেন। দেখলেন উষাকালে অরুণ-কিরণ-রঞ্জিতা চন্দ্রকলার ন্যায় অরজা ভূশয্যায় শায়িতা। ধর্ষিতা কন্যাকে প্রশ্নমাত্র করার প্রয়োজন হল না। ভার্গব যোগবলে উপলব্ধি করলেন মধুমন্তনগরাধিপতির হীনতম কুকার্য!

মহর্ষি বললেন : অপরাধীর দণ্ড আমি দেব। আমার অভিশাপে মধুমন্তনগর সমেত এই সমস্ত আরণ্যকভূমি দাবানলে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। মা অরজা, তুমি ঐ সরোবরমধ্যে অবস্থিত দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ কর। আশ্রমবাসীগণ তোমার অনুগামী হবে। তোমার পুণ্যে এ অরণ্যে শুধু ঐ দ্বীপটিই দাবানলের দহন থেকে রক্ষা পাবে।

এই কথা বলে মহর্ষি তদণ্ডেই কঠিন অভিশাপবাণী উচ্চারণ করলেন। অরজা আশ্রমবাসীদের নিয়ে সরোদনে দ্বীপমধ্যে আশ্রয় নিলেন। ঐ দ্বীপ ব্যতিরেকে সমস্ত অরণ্য ভয়ঙ্কর দাবানলে দগ্ধ হয়ে গেল। রাজ্যজনপদ সমেত মধুমন্তনগরী ভস্মস্তূপে পরিণত হল। মহারাজ দণ্ডের রাজধানীর চিহ্নমাত্র রইল না। যেখানে ছিল সুমসৃন রাজপথ, সুরম্য হর্ম্যমালা—যেখানে কালে দেখা দিল শ্বাপদসঙ্কুল ভয়াবহ অরণ্য। তার নাম দণ্ডকারণ্য।

পণ্ডিত তারাপ্রসন্নের মুখে দণ্ডকারণ্যের ইতিকথা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল আমার। মনে হয়েছিল—'সেই ট্রাডিসন সমানে চলেছে।'

সত্য থেকে ত্রেতা, ত্রেতা থেকে দ্বাপর, দ্বাপর থেকে কলি। যুগযুগান্তর ধরে এই হচ্ছে দণ্ডকারণ্যের ইতিহাস। আজও এ অরণ্যের আকাশে কান পাতলে শুনতে পাওযা যায ঋষিকন্যা অরজাব মর্মভেদী আর্তনাদের প্রতিধ্বনি। হয়তো সেই অবজার আর্তকণ্ঠই শুনতে পেযেছিলেন গুপ্তেজী মাডিয়া যুবতী 'মেবিযার' কাহিনীতে—তাই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হযে অপমান করে বসেছিলেন মেহ্‌রা সাহেবকে। গুপ্তেজী কি শুনেছিলেন জানিনা—আমি কিন্তু শুনতে পেয়েছিলাম চার যুগেব ওপাব থেকে ভেসে আসা ধর্ষিতা নাবীর ক্রন্দন। নারানপুরের হাটের অনতিদূরে দেখেছিলাম নিরাবরণা ভার্গবতনযাকেই। তৃপ্তকাম মহারাজদণ্ডেব রাজপবিচ্ছদের ছিন্ন অংশ মুঠিতে ধরে দেখেছিলাম তামস তপস্বীকে। অমৃত তাব অরুচি, আসক্তি আসবে।

বাস্তারের রাজার বাড়ী জগদলপুরে। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তার একাংশে এখন কলেজ খোলা হয়েছে। আমি যখনকার কথা বলছি তখন কলেজের চিহ্নমাত্র ছিল না। প্রবল প্রতাপান্বিত বাস্তারের মহারাজ প্রফুল্লচন্দ্র ভঞ্জদেও যে বছর স্বর্গারোহন করেন তার পরের বছর আমি দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলাম। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। নকীবে তাঁর নাম ঘোষণা করবার আগে যেসব গালভারি বিশেষণের ফুলঝুরি কাটতো তার হয়তো কোন মূল্য দেবে না আজকালকার শিক্ষিত মানুষ, কিন্তু নামের পিছনে কয়েকটি ক্ষুদ্র অক্ষরকে উপেক্ষা করা চলেনা। প্রফুল্লচন্দ্র ভঞ্জদেও পি. এইচ. ডি (কেম্ব্রিজ) প্রজাবর্গের কাছেই শুধু দেবতাস্থানীয় ছিলেন না, ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যেও তাঁর ছিল বিশিষ্ট আসন।

১৯৫৯ শালে প্রফুল্লচন্দ্র প্রবাসে মারা গেলেন। খাশ দিল্লীতে। পুত্রের কাছে জরুরী তারবার্তা এল 'মহারাজের শবদেহ নিয়ে যাও।'

জ্যেষ্ঠপুত্র প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জদেও। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ। সুন্দর ইংরাজি বলতে পারেন, সুন্দর চেহারা। বাৎসায়ণের ওপরে পড়াশুনা করে প্রবন্ধ লিখেছেন। তন্ত্রে বিশ্বাসী। শোনা যায় নিজেও নানা ধরণের তন্ত্র-সাধনা করে থাকেন গোপনে। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রয়াণে তিনিই উঠে বসেছিলেন শূন্য সিংহাসনে। গদিতে উঠে তাঁর প্রথম কীর্তি হল দিল্লীতে টেলিগ্রাফের জবাব পাঠানো—'মৃতদেহ বাস্তারে আনা হবে না, তোমরা যা হয় কর।'

দিল্লীর যমুনাতীরে অনাড়ম্বর আয়োজনে শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ভঞ্জদেও মহারাজা পি. এইচ. ডি (কেম্ব্রিজ)-এর সৎকার করা হল। প্রবীরচন্দ্র সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারলেন না। অভিষেকের অনেক অনুষ্ঠান যে তখনও বাকি ! শুধু তাই নয়। এর কিছুদিন পরে জগদলপুরের রাজবাড়িতে প্রবীরচন্দ্রের একটি প্রিয় কুকুর মারা গেল। রাজার আদেশে বিরাট শোভাযাত্রা করে মৃত কুকুরকে নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে—দাহ করবার জন্য। রীতিমত নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হল তালুকে তালুকে। কয়েক হাজার লোক ভরপেট খেয়ে নিল কুকুরের শ্রাদ্ধবাসরে। এখানেই ক্ষান্ত হলেন না প্রবীরচন্দ্র। যমুনায় তাঁর কুকুরের অস্থি বিসর্জন দেওয়া চাই। রাজ-অনুচরেরা সাড়ম্বরে যাত্রা করল প্রয়াগে—কুকুরের পূতাস্থি নিয়ে !

বাস্তারের লোক আড়ালে ছি ছি করলে। তবু প্রকাশ্যে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায় নি। রাজা হচ্ছেন ৺দন্তেশ্বরী মাতার প্রতিভূ। তিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে। রাজার কোন অভিলাষে প্রতিবাদ করলে মাতা দন্তেশ্বরী অপ্রসন্না হবেন। অনাবৃষ্টিতে শুকিয়ে যাবে মাঠ, অতিবৃষ্টিতে ভেসে যাবে দেশ, মহামারীতে উজার হয়ে যাবে বাস্তার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গল্প কথা নয়। এ ঘটনা যখন ঘটতে দেখলাম তখন বিংশ-শতাব্দী প্রায় ষাট বছরের বুড়ো!

নারানপুর থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই শুনলাম এ হেন প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জদেওকে গ্রেপ্তার করেছেন ভারত সরকার। নরসিংহগড় জেলে বন্দী আছেন মহারাজা। সিংহাসনে বসানো হয়েছে প্রফুল্লচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র বিজয়চন্দ্রকে।

চাপা উত্তেজনা দেখা দিল সারা বাস্তারে। মহালে মহালে গোপন সভা-সমিতির আয়োজন হল। মহারাজার অনুগত মাতব্বর প্রজারা গোপনে মিলিত হল এখানে ওখানে। প্রকাশ্য সভাও হল কিছু। যেদিন সেখানে হাটবার সেদিন সেখানেই প্রচার চালাল তারা। নতুন রাজাকে তারা মানে না। সরকার ওদের সাবেক রাজাকে, প্রবীরচন্দকে আটক করেছেন—এ অপমান বাস্তারের, এ অবমাননা আদিবাসী-সমাজের প্রতি।

সরল-বিশ্বাসী আদিবাসীর দল তীরে শান দেয়, টাঙ্গির ফলা মেরামত করে আর নির্দেশের অপেক্ষায় দিন গোনে।

এই প্রসঙ্গে প্রবীরচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে রাখা চলতে পারে। ১৯৫৭ সালে প্রবীরচন্দ্র কংগ্রেসের টিকিটে আইনসভার সদস্য হন। সে সময়ে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বাচনী সফরে অক্লান্তভাবে ঘুরেছিলেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে মহারাজা একদিন আশ্রয় নিলেন বাজাওন গ্রামে এক অনুগত প্রজার বাড়ী। বৃদ্ধ রাজভক্ত ব্রাহ্মণ প্রজা শিবলোচনের কুটিরে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রৌঢ়া স্ত্রী সুভদ্রাদেবী আত্মহারা হয়ে গেলেন এ দুর্লভ সৌভাগ্যে দন্তেশ্বরীর মাতার প্রতিভূ স্বয়ং বাস্তার-রাজ আজ তাঁর অতিথি! অন্তরাল থেকে এমন মহান অতিথির পরিচর্যা করে কি তৃপ্তি হয়? সুভদ্রাদেবী স্বহস্তে মহারাজকে আহার্য পরিবেশন করতে এগিয়ে এলেন গৃহান্তরাল থেকে। মহারাজ তাঁকে দেখলেন; শুধু তাঁর হাতে গড়া মিষ্টান্ন পরখ করেই তৃপ্ত হতে

পারলেন না,—স্বয়ং বিধাতার হাতে গড়া সুভদ্রা-দেবীকে চেখে দেখবার সাধ গেল। মুগ্ধ হয়ে গেলেন যুবক মহারাজ। প্রফুল্লচন্দ্র তখনও জীবিত। তাই তিনি অগ্রসর হলেন না।

পিতার মৃত্যুর পর গদিতে উঠে প্রবীরচন্দ্র ডেকে পাঠালেন শিবলোচনকে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বোধকরি তখনও সবটা জানতেন না, কানাঘুষা একটা কানে এসেছে, কান করেন নি। মহারাজ তাকে জানালেন তিনি বিবাহ করতে চান।

শিবলোচন সত্যই শিবনেত্র হয়ে যান। মহারাজ যদি বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন তবে সেকথা এত লোক থাকতে তাঁকেই বা জানানো হচ্ছে কেন? তবু আভূমি নত হয়ে বলেন: এ তো অত্যন্ত আনন্দের কথা।

মহারাজ রসিকতা করে বলেন: আপনার নির্বাচনের উপরেই নির্ভর করব আমি। আপনার ব্রাহ্মণীকে দেখে বুঝেছি আপনি পাকা জহুরী। তাই বিশেষভাবে আপনার উপরেই দিতে চাই বাস্তার রাজ্যের মহাবানী নির্বাচনের মহান দায়িত্ব। আপনি নেপালে চলে যান। রাহাখরচ বাবদ রাজকোষ থেকে হাজাব দুই টাকাও নিয়ে যান। আমার জন্য একটি সর্বগুণান্বিতা কন্যার সন্ধান আপনাকে আনতে হবে।

বৃদ্ধ এবাবেও বুঝতে পারেন না—এ কাজে তিনি কেন? আর এত দেশ থাকতে এজন্য তাঁকে সুদূর নেপালেই বা যেতে হবে কেন? কাছে পিঠে কি সুলক্ষণা কন্যা নেই? আব সবচেয়ে বড কথা এ কাজের জন্য দুই হাজার টাকার অঙ্কটা কিঞ্চিৎ বেশী হয়ে পড়ছে না? কিন্তু সে কথা প্রকাশ্যে বলার সাহস তাঁর নেই। সানন্দচিত্তে শিবলোবনকে এ দাযিত্বভার গ্রহণ করতে হল। রওনা হয়ে পড়লেন সুদূর নেপাল অভিমুখে।

তার ক'দিন পবেই রাজ্যের বড বড অমাত্যেবা একটি নিমন্ত্রণ পত্র পেলেন —শ্রীমন্ মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রবীবচন্দ্র ভঞ্জদেও বাহাদুর বিবাহ করেছেন। নিমন্ত্রণ পত্রের তাবিখ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০। নিমন্ত্রণকর্তা স্বয়ং বাস্তারাধিপতি মহারাজ—স্থান জগদলপুরের রাজবাটি—কন্যার নাম শ্রীমতী সুভদ্রা দেবী।

এবারও কেউ প্রতিবাদ করল না। সকলে সমবেত হলেন রাজবাড়িতে। যথারীতি বিবাহ শুরু হল। মন্ত্রোচ্চারণ করছেন রাজপুরোহিত। পট্টবস্ত্র

পরিহিত মহারাজ, সালঙ্কারা কন্যা। প্রদক্ষিণ শুরু হল। নহবতে সাহানা বাজছে। পুরোহিত গুনছেন, এক-দুই-তিন···চার···পাঁচ···

মহারাজ বলেন : আরে থামো থামো! সাতপাক হয়ে গেল যে, আবার আট পাক কেন?

পুরোহিত সবিনয়ে নিবেদন করলে : আজ্ঞে না মহারাজ, সাতপাক নয়, মাত্র পাঁচপাক হয়েছে। বিবাহ সিদ্ধ হতে আরও দু'পাক বাকি!

রাজা রোষ-কষায়িত নেত্রে বলেন : আমি বলছি সাত পাতপাক হয়ে গেছে। আর তুমি প্রতিবাদ করছ? তোমার সাহস তো কম নয়?

পুরোহিতের কণ্ঠনালী শুকিয়ে ওঠে। আমতা আমতা করে বলেন : আজ্ঞে না। মানে···

: আবার বলে আজ্ঞে না!—ধমক দিয়ে ওঠেন রাজেন্দ্র!

পুরোহিতের আর বাক্যস্ফূর্তি হয় না!

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন মহারাজ : ক'পাক হয়েছে? ঠিক করে বল!

বেতসপত্রের মতো কাঁপতে কাঁপতে রাজপুরোহিত বলেন : আজ্ঞে সাত!

: ব্যস্! এখানেই বিয়ে শেষ! এবার আহারাদির আয়োজন কর।

আইনজ্ঞ অমাত্যেরা মুখ লুকিয়ে হাসলেন।

অবগুণ্ঠনের আড়ালে এ প্রহসনের নায়িকার চোখদুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল কিনা কেউ খোঁজ নিয়ে দেখেনি।

এর কিছুদিন পরে মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল যখন মহারাজকে বলেন : আপনি সুভদ্রাদেবীকে বিবাহ করেছেন শুনে আমার অভিনন্দন···

বাধা দিয়ে সিনিয়ার কেম্ব্রিজপাশ প্রবীরচন্দ্র চোস্ত ইংরাজিতে বলেছিলেন : কী আশ্চর্য! এমন অদ্ভুত উড়ো খবর কে আপনাকে জোগান দেয় বলুন তো? সুভদ্রা দেবী আমার মায়ের মতো। আমার রাজপ্রসাদেই থাকেন—এবং মাতৃস্নেহে আমাকে দেখা শোনা করেন মাত্র।

আবার বলতে ইচ্ছে করে—'কী বিচিত্র এ দেশ!'

আর পাঠকে স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছে করে—এ রূপকথার গল্প নয়। আমাদের আমলের ঘটনা। রাজা আর রাণীকে···থুড়ি, রাজমাতাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি!

এ হেন প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ প্রবীরচন্দ্রকে মধ্যপ্রদেশ:সরকার হঠাৎ আটক করলেন—স্থান হল তাঁর নরসিংহগড় জেলে!

১৯৫৭-তে প্রবীরচন্দ্র আইনসভার সদস্য হয়েছিলেন। কংগ্রেস মনোনয়নে। কিন্তু কংগ্রেস সরকার যা চায় তিনি তা চান না। কিম্বা বলা যায় তিনি যা চান তাতে কংগ্রেস সরকারের অনুমোদন পান না। ফলে বিরোধ বাধল। প্রবীরচন্দ্র আশা করেছিলেন আদিবাসী কন্সটিটুয়েন্সিতে তাঁর অবিসংবাদিত জনপ্রিয়তাকে অস্বীকার করতে সাহস পাবে না কংগ্রেস সরকার। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখলেন তা হল না। পদত্যাগ করলেন মহারাজা। আইনসভা থেকেই শুধু নয়, কংগ্রেস পার্টি থেকেও। আদিবাসীদের বোঝালেন কংগ্রেস সরকার আদিবাসীদের কল্যাণ চায় না—তাই তিনি দলত্যাগ করে চলে এসেছেন।

এর পরেই শুরু হল তাঁর সরকার-বিরোধী অভিযান। প্রবীরচন্দ্রকে ডেকে পাঠানো হল ভূপালে, পরে নয়াদিল্লীতে। আলাপ-আলোচনায় কিছু ফল হল না। হবে না আশঙ্কা করেছিলেন অনেকে, কারণ হলে তা আইনসভার ভিতরেই হতো। সে যাই হ'ক প্রবীরচন্দ্র ফিরে এলেন বাস্তারে। নতুনভাবে আন্দোলন পরিচালনা করবেন তিনি। কিন্তু ও পক্ষও আর নীরব দর্শক থাকতে রাজি নয়। মহারাজের উপর আদেশ জারি করা হল তিনি যেন তাঁর রাজ্যসীমার বাইরে না যান। বাস্তারের বাইরে যেতে হলে তাঁকে সরকারের অনুমতি নিতে হবে। মহারাজ কর্ণপাত করলেন না সে আদেশে। একদিন রওনা হয়ে পডলেন রাজবাড়ি থেকে। জগদলপুর থেকে চলেছেন রায়পুরের দিকে ন্যাশানাল হাইওয়ে ধরে। রাজবাড়ির নম্বরি গাডিতে নয়। গোপনে। বাধা পেলেন মাঝপথে। গ্রেপ্তার করা হল মহারাজকে।

খবরটা শুনলাম জগদলপুরে গিয়ে। শহরটা থম্‌থম্‌ করছে। কখন কি হয় অবস্থা। দোকান পাট বন্ধ। এখানে ওখানে জটলা—ফুস্‌ফুস্‌, গুজ্‌গুজ। রাস্তায় যেন টহলদারি জীপের প্রাবল্য। হাট বসেনি। পথঘাট ফাঁকা। ধুলোর ঝড় তুলে পুলিসেব জীপ ছোটাছুটি করছে শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে গিয়েও দেখি ঐ কথাই আলোচনা হচ্ছে। বিলিয়ার্ড টেবিলে মার্কার অনুপস্থিত—ব্যাডমিনণ্টন কোর্টের বাল্ব জ্বলছে না, মায় তাসের টেবিলে সত্যিকারের সাহেব-বিবির দল এমন পটের সাহেব-বিবির মতো ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছেন যে তাসের সাহেব-বিবিরা আর প্যাকেটের বাইরে মুখ বাড়ায়নি। আদিবাসী-বিদ্রোহ হবে না তো? সবাই এই চিন্তায় মগ্ন।

মেহ্‌রা-সাহেব স্তব্ধতা ভেঙে বলেন: যাক, এতে প্রমাণ হল, দরকার হলে আমরা শক্তও হতে পারি। বড় বেশী বাড় বেড়েছিল ও তরফের।

ত্রিবেদী সাহেব বলেন: আরে রাখুন মশাই, সাহসের কথাটা আর তুলবেন না। ছি ছি ছি! নিজেদের পুলিস ভ্যানটাও তো সাহস করে বার করতে পারলেন না।

ত্রিবেদী-সাহেব এ্যাডমিনিস্ট্রেশান বিভাগের অফিসর নন। কিন্তু ব্যাপারটা কি? প্রশ্ন করে জানতে পারলাম। মহারাজ যেমন নিজের নম্বরি গাড়ি নিয়ে পলায়নের চেষ্টা করেন নি, পুলিশ কর্তৃপক্ষও তেমনি নিজেদের কোন গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করেন নি তাঁর পিছু। যে গাড়ি নিয়ে গিয়ে মহারাজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেটা দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার একটা ধার করা স্টেশান-ওয়াগন। স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে—কেন? মধ্যপ্রদেশ সরকারের আরক্ষা বিভাগে প্রিস্‌ন ভ্যানের তো অভাব নেই? সে কথার কেউ জবাব দিল না। প্রশ্ন করে জেনে নিলাম গাড়ির নম্বরটা। আরে এ গাড়ি তো হাসান চালায়। হাসান কে না চেনে কে? দণ্ডকারণ্য সংস্থার নামকরা ড্রাইভার। শীতগ্রীষ্ম এক মিলিটারী গরম স্যুট পরে, বুকে একরাস মেডেল, মাথায় কাইজারি টুপি—আর দেখা হলেই মোঘলাই কায়দায় ইয়া লম্বা—'সেলাম সরকার'! লোকটা কথা বলে বেশী। ভালই হল, ওর কাছ থেকে একটা ফার্স্ট-হ্যাণ্ড রিপোর্ট পাওয়া যাবে।

পাণ্ডে বললেন: এক নম্বর ঘুঘু তো ফাঁদে পড়লেন, দু-নম্বরের কি হবে?

মেহ্‌রা বলেন: দু-নম্বর ঘুঘুর খবর শোনেন নি? হি ইস্‌ আণ্ডার অর্ডারস অফ সাস্‌পেন্সন!

: তাই নাকি?—ঝুঁকে পড়ে সবাই!

: হ্যাঁ, অর্ডার বেরিয়ে গেছে।

পার্শ্ববর্তী পাণ্ডেকে বলি: কার কথা বলছেন আপনারা?

পাণ্ডে মুখটি কানের কাছে এনে বলেন: আপনার দোস্ত, গুপ্তেজী!

: গুপ্তেজী? গুপ্তেজী সাস্‌পেণ্ডেড হয়েছেন? কেন?

: আসল অপরাধ রাজদ্রোহ! অবশ্য আপাতত তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে অন্য একটি অপরাধে। চার্জসীট ফ্রেম করা হলে বোঝা যাবে ব্যাপারটা।

আমি তো স্তম্ভিত!

মেহ্‌রা বলেন: বাছাধন অনেক খেল দেখিয়েছেন। এইবার আমিও দেখে নেব—ও কতবড় গুপ্তেশ্বর! চাকরি-নট তো হবেই, গলায়-তক্তি হাফপ্যাণ্ট পরে কপির চাষও করতে হবে! আপনাকে বলিনি এঞ্জিনিয়ার সাহেব—অপমানের শোধ আমি নেবই।

মিসেস্ মেহরা বিশুদ্ধ ইংরাজিতে আহ্লুরে গলায় বলেন: প্রিয়তম, এ ভাবে ভূপতিত শত্রুর উপর খাঁড়ার ঘা মারা ক্ষাত্রনীতি সম্মত নয়!

উঠে পড়লাম। ভাল লাগছিল না। সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলাম ক্লাব থেকে। গুপ্তেজীর ডেরা জানা ছিল। একটা সাইকেল রিক্সা নিয়ে রওনা হয়ে পড়ি সেদিকে। গুপ্তেজীর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ জয়পুরের গেষ্ট-হাউসে। সেদিন দেখা করতে চেয়েছিলেন তিনি। কি যেন বলতে চেয়েছিলেন, প্রত্যাখ্যান করেছিলাম আমিই। আজ অযাচিতই যাচ্ছি গুপ্তেজীর কাছে। ভদ্রলোক রূঢ়ভাষী, রগচটা মেজাজী মানুষ—তবু তাঁর চরিত্রের কোন একটা দিকের প্রতি আমার মোহ ছিল। আমার ভাল লাগত ভদ্রলোককে। এ বিপদের দিনে একঘরে মানুষটির পাশে গিয়ে দাঁড়াবার একটা প্রেরণায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই চললাম তাঁর বাসায়।

গুপ্তেজী বাসাতেই ছিলেন। আমাকে দেখে কোন বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। যেন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আমি এসেছি সৌজন্য-সাক্ষাতে। তবু মনে মনে বেশ খুশী হয়ে উঠেছেন বোঝা যায়। আপ্যায়ন করে নিয়ে গিয়ে বসালেন, বললেন: কি খাবেন বলুন, কোল্ড-ড্রিংস্ না চা?

বললুম: খেতে আমি আসিনি। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

বিচিত্র হেসে গুপ্তেজী বলেন: ব্যাপার কিছুই নয়। আমার এখন অখণ্ড অবসর। পেয়ালার পর পেয়ালা চা খেয়ে সময় কাটাচ্ছি। শুনেছেন নিশ্চয় আমাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

: শুনেছি। কিন্তু কি করেছিলেন আপনি?

: তেমন কিছুই নয়। আসিবাসীদের কিঞ্চিৎ উপকার।

: সেটা তো সরকারও করতে চান। আপনার মাধ্যমেই করতে চান। তাহলে?

গুপ্তেজী একটু চিন্তা করে বললেন: মুশ্‌কিল কি জানেন, আমার

দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গিটার ঠিক মিল নেই। আমি মহারাজের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ছিলাম।

আমি বিস্মিত হয়ে বলি: গুপ্তেসাহেব, আপনি বাড়াবাড়ি করেছেন নাকি? আপনার আমার মতো ক্ষুদ্রজনের এ ব্যাপারে স্বপক্ষে বিপক্ষে থাকার কোন মানে হয়? এ ব্যাপারে সরকার কোন পথে চলবেন সে পলিসি যে মহলে নির্ধারিত হচ্ছে তা আপনার আমার নাগালের বাইরে। দিল্লীতে একেবারে উপরতলার কয়েকজন কূটনৈতিক ধুরন্ধর যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাই মেনে চলতে হবে এখানে। এরমধ্যে আপনার মতামত প্রকাশের স্কোপ কোথায়?

: বলছি, তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?

: বলুন।

: আপনি পূব-বাঙ্গলার মানুষ না পশ্চিম বাঙ্গলার?

এ অদ্ভুত প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে না পারলেও বলি—পশ্চিম-বাঙ্গলার।

: তাহলে আর আপনাকে সে প্রশ্ন করে লাভ নেই।

: কোন প্রশ্ন?

: আপনার বাড়ি যদি পূব-বাঙ্গলায় হত, তাহ'লে আরও একটি প্রশ্ন করতাম আপনাকে।

: কি প্রশ্ন?

: দিল্লীতে একেবারে উপরতলার আর কয়েকজন কূটনৈতিক ধুরন্ধর দণ্ডকারণ্যে উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসন বিষয়ে আজ যদি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেন যে এই দণ্ডকারণ্যের দরজা অতঃপর পূব-বাঙ্গলার উদ্‌বাস্তুদের জন্য আর খোলা থাকবে না, এখানে আনা হবে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্‌বাস্তু; তাহলে আপনি কি করতেন? চুপচাপ হুকুম তামিল করে যেতেন?

বললুম: কি হলে কি করতাম সে আলোচনা থাক। আপনি কি করেছেন? রাজার গ্রেপ্তারে বাধা দিয়েছেন?

হা হা করে হাসলেন গুপ্তেজী: আমি কি পাগল? আমাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

শুনলাম ঘটনাটা। কোণ্ডাগাঁওয়ের হাটে গিয়েছেন গুপ্তেজী। দেখেন একটি বিখ্যাত চা-কোম্পানির মোবাইল-ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে হাটের অদূরে।

বিনা পয়সায় বিতরণ করা হচ্ছে ভারতীয় চা। গুপ্তেজী নিজে চা খান, দিনে আটদশ হাফ-কাপ। তবু তিনি ক্ষেপে গেলেন। চা-কোম্পানির প্রচার বিভাগের লোকদের বললেন : এসব চলবে না। হঠাও গাড়ি!

সাধারণ লোক হলে বোধহয় ঝামেলা না বাড়িয়ে মানে মানে সরে পড়ত। দুর্ভাগ্যক্রমে বাস্তার-জোনের ম্যানেজার ছিলেন সে গাড়িতে। চা-কোম্পানির প্রচার বিভাগের ম্যানেজার। তিনি প্রতিবাদ করলেন। চলে যাও বললেই হল? কথা কাটাকাটি থেকে বচসা; এবং গুপ্তেজীর মতো গুণীজন উপস্থিত থাকতে মৌখিক বচসা হাতাহাতিতে রূপান্তরিত হতে বিলম্ব হয়নি। ম্যানেজার ভদ্রলোক ক্ষীণজীবী—এতটা সে আশঙ্কা করেনি। মার খেয়েছে সেই বেশী। ম্যানেজারই থানায় ডায়েরি করালো প্রথমে। গুপ্তেজী থানায় যাননি। ফিরে এসেছিলেন নিজের ডেরায়।

অচিরে মামলা উঠ্‌ল কোর্টে। গুপ্তেজীর বিরুদ্ধে ম্যানেজারের অভিযোগ নয়—ভারতীয় চা প্রতিষ্ঠান মামলা আনলেন সরকারের বিরুদ্ধে! কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত। বিভাগীয় তদন্ত সাপেক্ষে মামলা মুলতুবী রাখা হল। গুপ্তেজীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে তাই।

বললুম : চায়ের উপর হঠাৎ এ ভাবে ক্ষেপে গেলেন কেন? আপনি নিজে তো একজন পাঁড় চা-খোর?

: শুধু চা-খোর নই, চাকরও বটে!

: তাহলে?

: তাই তো জানি চাকরির মতো চাও একটা বিশ্রী নেশা। আরও জানি এই হচ্ছে নেশা-ব্যবসায়ীদের ট্যাকটিক্স। ভারতবর্ষে এভাবেই হয়েছে চা আর কফির প্রচার, চীনে হয়েছে আফিংএর। আদিবাসীদের চা খাওয়া শিখিয়ে শিক্ষিত ক'রে তোলায় তাই আমার আপত্তি। বিনা পয়সায় চা-বিতরণের এই বদান্যতাকে তাই বাধা দিতে গিয়েছিলাম।

কী আর বলব এ পাগলকে। প্রসঙ্গ বদলে বলি : ডিফেন্সের কি ব্যবস্থা করছেন? কোনও উকিলের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন?

একটা আড়ামোড়া ভেঙ্গে উনি বলেন : নাঃ! আমি কোন ডিফেন্স দেব না।

: ডিফেন্স দেবেন না? বলেন কি! কি করবেন তাহলে?

: রিলাইন করব। ফাইন হলে ফাইন দেব। আর জেল হলে তো কথাই নাই। বেকার মানুষের তাহলে একটা গতি হবে।

আমাকে নির্বাক দেখে নিজে থেকেই ফের বলেন: ভেবে দেখলাম, এভাবে দূর থেকে ওদের উপকার করা যাবে না। আদিবাসীদের সত্যিকার ভাল করতে হলে ওদের মধ্যে গিয়ে বাস করতে হবে—ওদের জীবনের ভাগিদার হতে হবে। সম্মানের উচ্চ সিংহাসনে বসে উপদেশ বর্ষণ করে কোন ফল হবে না।

: কিন্তু সে তো আর আপনার পক্ষে সম্ভবপর নয়!

: কেন নয়? দু পাতা ইংরাজি পড়েছি বলে কি আমি মাড়িয়া হয়ে যেতে পারি না?

এবার আমার হেসে ওঠার পালা। হাসতে হাসতেই বলি: না গুপ্তেজী! ও অধিকার অত সহজে পাওয়া যায় না। আপনি এক্ষুনি বলেছেন আমি পশ্চিম বাঙ্গলার মানুষ, তাই পূববাঙ্গালার উদ্‌বাস্তুদের প্রকৃত দরদী আমি হতে পারি না—সেই এ্যানালজিতে আমি বলব, আপনিও কোনদিন আদিবাসীদের প্রকৃত শুভার্থী হতে পারবেন না। সঙ্কল্প করে ও অধিকার পাওয়া যায় না। সে অধিকার পেতে হলে তা জন্মসূত্রে পেতে হয়।

একটু সময় লাগল জবাবটা দিতে। কয়েকটা মুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন দেওয়ালের একটা ছবির দিকে। সেই আলখাল্লাধারী বৃদ্ধ সাহেবটির দিকে। তারপর যেন বহুদূরের থেকে অস্ফুটে জবাব দিলেন গুপ্তেসাহেবের সম্মোহিতের মতো: আপনার ধারণা ভুল। জন্মসূত্রেই সে অধিকার পেয়েছি আমি। আমি, আমি গোণ্ড,...মাড়িয়া গোণ্ড!

আমি বজ্রাহত!

সামনের দেওয়াল ঘড়িটায় ক্রমাগত টিক্-টিক্-টিক্-টিক্ শব্দ!

দমকা হাওয়ায় গত বৎসরের নিঃশেষিত-পৃষ্ঠা একটা ক্যালেণ্ডার ক্রমাগত দেওয়ালে ওলট পালট খাচ্ছে।

রাত বাড়ছে। রিকসা-আলা মুখ বাড়িয়ে জানতে চায়—আরও দেরী হবে কিনা। কী জবাব দেব বুঝে উঠ্‌তে পারিনা। গুপ্তেজী নিজে থেকেই বলেন: মাপ করবেন, আজ আর আপনার কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারছি না। তবে জানাব, যাবার আগে আপনাকেই শুধু জানিয়ে যাব। আরও

একদিন জানাতে গিয়েছিলাম, আপনি শুনতে রাজি হন নি। কিন্তু আজ আর নয়!

উঠে এলাম নীরবে। বুঝলাম গুপ্তেজীর অন্তরেও কী একটা কথা ঐ নিঃশেষিত-পৃষ্ঠা দেওয়াল-পঞ্জিটার মতোই ওঁর অন্তরের প্রাচীরে ক্রমাগত মাথা খুঁড়ে চলেছে। গুপ্তেজীর গুপ্তকথা! এ কাজের দুনিয়ায় যে ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন উনি তার প্রয়োজন বুঝি নিঃশেষ হয়েছে—একটি একটি করে ক্যালেণ্ডারের ঝরা পাতার মতো উড়ে চলে গেছে ওঁর কর্মচঞ্চল যৌবনের দিনগুলি, প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রান্তে এসে ওঁর মনে আজ আত্মজিজ্ঞাসা জেগেছে! অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নাইটহুড ত্যাগ করা যায়, কিন্তু অন্যায় কি তাতে পরাভব মানে? হঠাৎ ওঠা দমকা হাওয়ায় তাঁর অন্তরের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরছে সেই প্রশ্নটাই!

অনেকদিন আগে গুপ্তেজীকে বলেছিলুম: আপনিও তো হিন্দু। উনি জবাবে রুখে উঠেছিলেন—নো আয়াম নট! আর হিন্দুধর্মের যে আদর্শের কথা আপনি শোনালেন তাতে বলব—সে জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

কথাটা সেদিন ধাঁধার মতো মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম, কি জানি হয়তো ভুল ধারণা আমার—গুপ্তেজী হয়তো সত্যিই হিন্দু নন, খ্রীস্টান, বা অন্যকোন ধর্মাবলম্বী। স্বপ্নেও ভাবিনি উনি নিজেকে মাডিয়া গোণ্ড বলে পরিচয় দেবেন। লিঙ্গোপেন, বড়া-দেও, ভীমুল-পেন, তাল্লুর-মুট্টাইয়ের উপাসক বলে নিজেকে অকপটে ঘোষণা করবেন।

সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল গুপ্তেজীর দীর্ঘপত্রে। জগদলপুরে তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের দিন পনের পরে পেলাম তাঁর ভারী রেজিষ্ট্রি চিঠি। মনের ভার কারও একজনের কাছে না নামিয়ে মানুষ শান্তি পায় না। কি জানি কেন গুপ্তেজী আমাকেই বেছে নিয়েছিলেন এ জন্যে। এই দুনিয়ার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে বিদায় নেবার আগে তাঁর গুপ্তকথা অকপটে জানিয়ে গেলেন আমাকে। সে চিঠির জবাব আমি দিইনি—দেবার উপায় ছিল না। গড়-ঠিকানার মানুষটা হারিয়ে গেল আমার জানা এই দুনিয়া থেকে। এখন তিনি যে রাজ্যে সেখানে এই দুনিয়ার চিঠি বিলি হয় না!

গুপ্তেজীর সে দীর্ঘ চিঠিখানি আজও আমার কাছে আছে। তাঁর শেষ স্মৃতি। আজও কর্মহীন অবসরে মাঝে মাঝে সেখানি খুলে পড়ি আর মনে পড়ে দণ্ডকারণ্যের পথে প্রান্তরে ঘটে যাওয়া নানান টুক্‌রো ঘটনা। গুপ্তেজীর ঘরে আলখাল্লাধারী সাহেবের ছবিটি দেখে কৌতূহলী হয়েছিলাম আমি। শুনেছিলাম আদিবাসী উন্নয়নের কাজে তিনি নাকি গুপ্তেজীর পূর্বসূরী। স্নানরতা মুরিয়া মেয়েদের ছবি তোলায় তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন মেহরার শ্যালকের এক্সপোসড ফিল্ম। নাগরদোলার মালিকের সার্টের কলার চেপে ধরেছিলেন রাগের মাথায়। অদ্ভুত মানুষটার চরিত্রটাকে ভেবেছিলাম জানা হয়ে গেছে—কিন্তু কেন তাঁর মনের গতি এ পথে গেল তা ভেবে দেখিনি। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার যেন শেষ কথা—কেন এ মাধ্যাকর্ষণ তা জানবার স্পৃহা জাগেনি মনে। গুপ্তেজীর সে দীর্ঘ চিঠি পড়ে বুঝতে পারি—কী মর্মান্তিক অভিমানে তিনি জীবনের পথে এমন ভারসাম্য হারিয়ে একসেন্ট্রিক হয়ে উঠেছিলেন। নিজেকে বরাবর তিনি আদিবাসীদের সমতলে দাঁড করিয়েছেন মনে মনে—আর তাই আমাদের দেখতে পেয়েছেন ওদের দৃষ্টি দিয়ে। পাগলা গারদে যদি দৈবক্রমে আটক পড়ে একজন সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষ, চিড়িয়াখানার সিম্পাঞ্জিটার মস্তিষ্ক যদি হঠাৎ মানুষের মতো কার্যকরী হয়ে পড়ে তাহলে দর্শকের কৌতুক এক্সকারসান তারা যে চোখ দিয়ে দেখত গুপ্তেজী সেই চোখ দিয়েই বরাবর দেখে এসেছেন আমাদের,—'হোয়াইট মেন্‌স বার্ডনের' নবতম ধ্বজাধারী মানুষগুলিকে। গুপ্তেজী লিখছেন :

আমার এ চিঠিখানি পেয়ে নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবেন আপনি। এত কথা কেন আপনাকে ইতিপূর্বে বলিনি আর এখনই বা কেন এত লোক থাকতে আপনাকেই জানিয়ে যেতে চাই সবকথা।

এতদিন এ কথা সকলের কাছ থেকেই গোপন রেখেছিলাম, লজ্জায় সঙ্কোচে। এ আমার গৌরবের কথা নয়। আর আজ এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি তার কারণ আপনিই ঘটনাচক্রে আমাকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছিলেন।

অনেক দিন আগে আপনি আমাকে একখানি ক্যালেণ্ডার দিয়েছিলেন, মনে আছে?

নাঃ! ভুল বললাম। আজ আর সৌজন্যের খাতিরে মিথ্যা কথা বলব

না—ছোটখাট ভদ্রতার কৃত্রিমতাকে ছাড়িয়ে উঠে নগ্নসত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই এ চিঠিতে। তাই সত্য কথাই বলব। আপনার কাছ থেকে ক্যালেণ্ডারখানা কেড়ে রেখেছিলাম আমি। প্রতি মাসে তার পাতা একখানা একখানা করে খুলে নিয়েছি; তবু পঞ্জিকাহীন ছবিখানা আজও রয়েছে আমার সামনেই টাঙ্গানো। যতবার ঐ ছবিখানার দিকে তাকিয়েছি ততবারই আমার মনে জেগেছে এক অদ্ভুত চিন্তা। এ ছবিখানা অন্যায়-যে-করে সেই মোহনের ঘর থেকে কেড়ে এনেছিলেন আপনি—অন্যায়-যে-সহে তার কাছ থেকেও কেড়ে রেখেছিলাম আমি। কিন্তু ওটা কাছে রাখবার অধিকার কি ছাই আমারই ছিল? যে মানুষ লোকলজ্জার সঙ্কোচে নিজের পরিচয় গোপন করে লোকসমাজে ঘুরে বেড়ায় তারও তো অধিকার নেই ঐ বলিষ্ঠ প্রতিবাদ-চিত্রটি রাখবার।

আমার পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন আপনি। বলেছিলাম আমি মাড়িয়া গোণ্ড। হয়তো ঘৃণা হয়েছিল আপনার। কিন্তু সেদিন আমি সত্য কথা বলিনি। আজ বলছি। আমি মাডিয়া গোণ্ড নই—তার চেয়েও নীচুস্তরের জীব। আমার পরিচয় আমি—"ভুলাহুয়া"!

শব্দটির ইংরাজী প্রতিশব্দ অবৈধ সন্তান। কিন্তু অসভ্য আদিবাসী সমাজে বৈধতাটা বড কথা নয়। ওরা বলে 'ভুলা-হুয়া"। ভুল ভুলই—অন্যায়ও নয়, পাপও নয়। আমি যদি ওদের সমাজ থেকে ছিটকে বেরিয়ে না আসতাম তাহলে এভাবে আত্মপরিচয় গোপন করে ফিরতে হত না আমাকে। সংসার সন্তান সবকিছুই হয়ত পেতাম জীবনে! অপরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিতনা আমাকে ঐ অসভ্য মানুষগুলি।

যাক সে কথা। আমার জন্মের ইতিহাসটাই আগে বলি। আমার বাবা ছিলেন পুলিশ বিভাগের উঁচুদরের অফিসার। নামটা আর কববনা—উপাধিটা তো জানেনই। মধ্য প্রদেশ সরকারে জঁাদরেল অফিসার বলে একপক্ষে সুনাম অপরপক্ষে দুর্নাম কিনেছিলেন। বাস্তারের বিদ্রোহদমন করতে রাজধানী থেকে তিনি এসেছিলেন এই দণ্ডকারণ্যে। কোন শালে? যে শালে বাস্তারে বিদ্রোহ হয়। সেটা কোন শাল তা তো ওরা জানে না। না, আবার ভুল বল্‌ছি;— আর 'ওরা' নয়, এবার থেকে 'আমরা'। কোন শালে বিদ্রোহ হয়েছিল তা তো আমরা জানি না। আমাদের কি লিখিত বর্ণমালা আছে যে লিখে রাখব?

আপনারাও লিখে রাখেননি। দিল্লীতে সেবার আপনারা দরবার করছেন—কলকাতায় মোহনবাগান প্রথম শীল্ড পাওয়ায় হচ্ছে দারুন হৈ হৈ! খবরের কাগজে আমাদের কথা ছাপবার মতো স্থান হয়নি। দণ্ডকারণ্যের গহন অরণ্যে ইংরাজের বুলেটে কতজন জংলি মানুষ লুটিয়ে পড়ল কে তার হিসাব রাখে? সে সময়ে বাস্তার মহারাজার দেওয়ান ছিলেন বৈজুনাথ পাণ্ডে। তিনি আদিবাসীদের সত্যিকারের দরদী লোক ছিলেন। প্রগতি-মূলক কর্মসূচী ছিল তাঁর। কয়েকটি বিত্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, সমবায় প্রথায় আদিবাসীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। সভ্য তুনিয়ার তদানিন্তন মানুষ তাঁর সেই প্রগতিমূলক কর্মসূচীকে সুনজরে দেখল না। তারা আদিবাসীদের উত্তেজিত করল—বেছে বেছে বিত্যালয়ের শিক্ষকদের উপর চালানো হল অকথ্য অত্যাচার। ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরকাল যা হয়ে এসেছে এখানেও তার ব্যতিক্রম হলনা। নীরব তৃতীয়পক্ষ—ইংরেজ সরকার এবারে আসরে নামলেন। কঠিন দমননীতির আশ্রয় নিয়ে বিপ্লবের মূলোৎপাটন করা হল। বৈজুনাথ পাণ্ডের স্বপ্ন আর বাস্তবায়িত হল না। চা-বাগানে দাস ব্যবসায়ের সাপ্লাই এজেন্সির ইংরাজি মূলধনে আঁচড়টি লাগল না।

আমার বাবা বাস্তারে এসেছিলেন এই শুভকার্যের ব্রত নিয়ে। বিদ্রোহ দমন করে, লেবার রিক্রুটিং প্রতিষ্ঠানকে বিপদমুক্ত করে ফিরে গিয়েছিলেন এখান থেকে। কিন্তু যাবার আগে একটি স্থায়ী কীর্তি রেখে গিয়েছিলেন তিনি। সে কীর্তি এই 'ভুলা হুয়া' আমি!

এই কথাই সেদিন জানতে চেয়েছিলাম আপনাকে জয়পুরেব গেষ্ট হাউসে। জয়দীপ মেহ্‌রাকে অকারণে অপমান করিনি আমি। রেভারেণ্ট আর্নেস্ট স্টোনের পালিতা কন্যা মেরিয়া আমার মা!

ভারতবর্ষে ইংরাজের রক্তে জন্ম নিয়েছেন ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, দীনবন্ধু এ্যাণ্ড্রুজের মতো' মানুষ। আমিও শৈশবে এসেছিলাম এমন একজন মহাপুরুষের সান্নিধ্যে। তাঁর গল্প শুনেছেন জয়পুরে—আমি আর্নেস্ট স্টোনের কথা বলছি।

ফাঁসীর মঞ্চ থেকে আমার মা ফিরে এলেন তাঁর আশ্রয়ে; কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার মায়ের। সেদিনও নিষ্কৃতি পেলেন না তিনি। তাঁর দেহের অভ্যন্তরে দেখা দিয়েছে তখন নতুন প্রাণের স্পন্দন। যদি পুরোপুরি মাড়িয়া হতেন

তাহলে তিনি এ দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে পারতেন; কিন্তু কাল হয়েছিল তার ইংরাজি শিক্ষা। ভুল আর তাঁর কাছে ভুলমাত্র নয়, লেজিটিমেসির সম্বন্ধে ধারণা জন্মেছিল তাঁর। ঈশ্বর করুণাময়—অবাঞ্ছিত সন্তানকে শুধু গর্ভেই ধারণ করেছিলেন তিনি—ক্রোড়ে ধারণ করেননি। সন্তান হতে গিয়ে তিনি মারা যান। বুড়ো আর্নেস্ট স্টোন তখন ষাটের কাছাকাছি। সদ্যোজাত শিশুর জন্যে ওয়েট-নার্স খুঁজতে বের হলেন আবার!—জীবনে তৃতীয় বার।

বাধ সাধলেন এবার তাঁর আত্মীয় বন্ধুরা। মিসেস্ বারওয়েল এ অনাচার মেনে নিতে রাজি হলেন না কিছুতেই। তাঁর ভাইপোর ছেলে একটি মাড়িয়া গভর্নেসের অবৈধ সন্তানের সাথে এক সঙ্গে মানুষ হতে পারে না, কিছুতেই না।

আর্নেস্ট স্টোন কয়েকটা দিন গভীর চিন্তায় ডুবে থাকলেন। তারপর নতুন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন একদিন। সমস্ত সম্পত্তিটা দান করে গেলেন দৌহিত্রকে। নাবালক দৌহিত্রের অছি নিযুক্ত করলেন এক ট্রাস্টীকে—মিসেস্ বারওয়েল তার এক্সিকিউটার। নিজে যোগ দিলেন ক্রিশ্চিয়ান মিশনে। বিশাল সম্পত্তি থেকে সামান্য মাসোহারার ব্যবস্থাও রাখলেন না ষাট বছরের বৃদ্ধ! ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁর তীব্র বীতরাগ জন্মেছে তখন।

কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীরাও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন না। না করাই স্বাভাবিক। লক্ষপতি আর্নেস্ট স্টোনকে পেলে তাঁরা হয়তো ধন্য হয়ে যেতেন— কিন্তু এ যে নিঃস্ব স্টোন!

আমার মায়ের গ্রামেই একা হাতে কাজ শুরু করলেন উনি। খড়ো চাল ঘরে আবার একটি মাড়িয়া মেয়েকে কন্যাত্বে বরণ করে নতুন জীবনযাত্রার সূচনা করলেন।

রেভারেণ্ট স্টোন আমাকে ব্যাপটাইস্ করেছিলেন। ধর্মমতে আমি খ্রীষ্টান। মানুষ হয়ে উঠেছিলাম সেই ইংরাজ ধর্মযাজকের কৃপায়। তিনিই ছিলেন শৈশবে আমার অবলম্বন,—বাল্যে আমার সহচর, কৈশোরে আমার ধ্রুবতারা!

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি কি জানেন? এই মহাপুরুষকে আমি চিনতে পারিনি। আমি, হ্যাঁ আমিই তাকে হত্যা করেছি। এ খেদ আমার যাবেনা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। আজও প্রতিদিন শয্যাগ্রহণের

আগে আলখাল্লাধারী বৃদ্ধের ফটোর সামনে দাঁড়াই, নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করি! তবু সান্ত্বনা পাই না।

আমার বয়স তখন পনের। সেই পনের বছর বয়সে কি ঘটেছিল বলার আগে বলে নিতে চাই—জীবনের এই প্রথম কয়টা বছরই আমার সবচেয়ে সুখে সব চেয়ে আনন্দে কেটেছে। অদ্ভুত দু-নৌকায় পা দিয়ে চলেছিলাম এই পনের বছর। গাঁয়ের ঘটুলে আমি ছিলাম কাজাঙ্কি। অথচ রবিবারে সাহেবের সঙ্গে উপাসনা করতাম। গাঁয়ের সকলের দেখাদেখি আমিও তাঁকে সাহেব বলতাম। ইংরাজি বলতে শিখেছিলাম তাঁর সান্নিধ্যে, পড়তেও। মাড়িয়া ভাষা তো জানতামই।

সেবারে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে সাহেব অসুখে পড়লেন। গ্রামে কারও অসুখ হলে সাহেবই ওষুধ দেন। এবার সাহেব নিজেই অসুস্থ। গাইতার সঙ্গে আমি ছুটলাম শহরে। জীবনে প্রথম। আমি মাড়িয়াদের মতো কাপড় পড়তাম—সার্ট-প্যাণ্ট নয়। তাই আমার মুখে ইংরাজী শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন শহরের ডাক্তারবাবু। তিনি এলেন আমাদের সঙ্গে সাহেবকে দেখতে।

কিন্তু ঐ শহরে ডাক্তার ডাকতে যাওয়াই আমার কাল হল! বাইরের দুনিয়াকে দেখে মাথা ঘুরে গেল আমার। আমি যে মাড়িয়া নই—এ কথাটা হঠাৎ উপলব্ধি করলাম যেন। ঘন ঘন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে যাই। সাহেবের কাছে বায়না ধরে শহরে যাবার দু-একটা জামা কাপড়ও করালাম। সাহেব ওষুধ খেয়ে সামলে উঠ্‌লেন বটে, কিন্তু আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না।

সাহেবকে ধরে বসলাম—আমি শহরের স্কুলে ভর্তি হব। সাহেবের প্রবল আপত্তি ছিল—কিন্তু আমার আগ্রহে, আর সেই ডাক্তারবাবুটির পরামর্শে আমাকে শেষ পর্যন্ত শহরের স্কুলেই ভর্তি করা হল। বছর পাঁচেক পড়েছিলাম সে স্কুলে। থাকতাম ডাক্তারবাবুর বাড়িতেই। তাঁর ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম করে দিতে হত আমাকে। মায় ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা। ডাক্তারবাবু স্থানীয় লোক—ওড়িয়া। তাঁর একটি ছেলে আর একটি মেয়েও পড়ত আমাদের স্কুলে। ছেলেটি আমার সঙ্গে এবং মেয়েটি দু বছর নীচে। ছেলেটি আমাকে বিষ নজরে দেখতে শুরু করল। আমার প্রথম অপরাধ ক্লাসে তাব চেয়ে

আমি বরাবর বেশী নম্বর পেতাম। দ্বিতীয় অপরাধ তার বোন আমাকে ঐ বয়সেই একটু সুনজরে দেখতে শুরু করে। ছেলেটি বাপের কাছে আমার নামে মিথ্যা করে লাগলো। সবটা অবশ্য মিথ্যা নয়—তার ত্রয়োদশী ভগ্নীটি ইতিমধ্যে আমায় মনে কিছুটা মোহ বিস্তার করেছিল বটে।

তাড়িয়ে দেওয়া হল আমাকে। ফিরে এলাম গ্রামে। কিন্তু এখন আমি অন্য মানুষ। জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদন করে এসেছি আমি। গাঁয়ে ঐ অসভ্যদের মধ্যে আর মন বসে না। ঘটুলে যাবার কল্পনাতেই মনটা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সাহেব ডেকে পাঠালেন আমাকে। চুপটি করে গিয়ে বসলাম তাঁর পাশে। বললেন: তুমি নাকি ঘটুলে যাওয়া বন্ধ করেছ?

বললুম: হ্যাঁ।

: কিন্তু কেন?

উনি প্রশ্ন করছিলেন গোণ্ডিতে। আমি জবাব দিলুম ইংরাজিতে। বললুম: ঘটুলের ব্যবস্থাকে আমি ঘৃণা করি, সেটাকে নৈতিক অপরাধ বলে মনে করি।

সাহেবের ভ্রূ কুঁচকে উঠ্‌ল, বললেন: কিন্তু আমাদের বাপ-পিতামহের আমল থেকে কেউই তো এটাকে নৈতিক অপরাধ বলে মনে করেনি।

আমিও চটে উঠে বললুম: আপনার বাপ-পিতামহের কথা জানিনা—কিন্তু আমার বাপ-পিতামহ ঘটুলে মানুষ হননি। আপনিই তো বলেছেন, আমার বাবা হিন্দু ছিলেন।

: কিন্তু তোমার মা, মামারা—দাদামশাই?

: তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আমি স্বীকার করি না। আমি হিন্দু—মাড়িয়া নই।

বৃদ্ধ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন: তাহলে তুমি কি করতে চাও?

: আমি আবার স্কুলেই ফিরে যেতে চাই। আপনি অন্য একটা ব্যবস্থা করে দিন।

: তা না হয় দিলুম। ধর তুমিও পাশ করলে সেখান থেকে। তারপর কি করবে?

ঃ কি করব তা জানি না। তবে যাই করি এ গাঁয়ে আর ফিরে আসব না।

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ জবাব দেন নি। তারপর ইংরাজিতেই বললেন: বেশ! তাই করে দেব—কিন্তু সেই সঙ্গে তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। একথা জানবার বয়স হয়েছে তোমার।

ধীরে ধীরে আমার জন্ম ইতিহাস বলে গেলেন তিনি। সব কথাই খুলে বলেছিলেন। সে কাহিনী আপনি শুনেছেন জয়দীপ মেহ্‌রার মুখে—জয়পুরের গেস্ট-হাউসে। মনে আছে, অনেক বড় বড় লোকের নাম করে ছিলেন তিনি সে কাহিনীর মাঝে মাঝে—আলেকজাণ্ডার, টলেমি, জরোস্টার, কন্‌ফুসিয়াস্, মায় স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টের নামও করেছিলেন। আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন জন্মটা কিছু নয়—সেটা মানুষের হাতের বাইরে; কর্মেই মানুষের পরিচয়। সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে যা বলেছিলেন তার নির্গলিতার্থ হচ্ছে যে হিন্দু-সমাজে আমার ঠাঁই হবে না। মাড়িয়া সমাজে 'ভুলা-হুয়ার' কিন্তু পূর্ণ মর্যাদা আছে। তিনি চেয়েছিলেন আমি যেন মাড়িয়া পরিচয়টাই বহন করি।

সে রাত্রেই গৃহত্যাগ করেছিলাম। প্রচণ্ড অভিমান হয়েছিল ঐ বৃদ্ধের উপর। কেন শৈশবেই তিনি আমাকে হত্যা করেন নি? কেন এতদিন এসব কথা গোপন করেছিলেন আমার কাছ থেকে? আমার বাবার সঙ্গে আমার মায়ের বিবাহ হয়নি একথা কেন জানান নি। বিবাহ তো দূরের কথা—তাঁদের মধ্যে প্রণয়ও হয়নি। একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে মিথ্যা রিপোর্ট লেখাবার প্রয়োজনে আমার মাকে বলি দেওয়া হয়েছিল একজন লালসাজর্জর পুরুষের কামনার যূপকাষ্ঠে। সেই অকথ্য অত্যাচারের, সেই ক্ষমাহীন ব্যাভিচারের স্থায়ী কলঙ্কচিহ্নটার নাম আমার ব্যক্তিসত্তা।

মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল। মনে হল কয়েকটা মানুষকে পরপর খুন করতে পারলে বোধহয় এ যন্ত্রণার উপশম হবে। পেন্সিল-কাটা ছুরিটা হাতে সারারাত পায়চারি করেছিলাম আর্নেস্ট স্টোনের খড়ো-ঘরের সামনের বারান্দায়। পারলাম না। শেষ পর্যন্ত ভোর রাতে গৃহত্যাগ করেছিলাম।

এরপর সাহেবের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। নানান বন্দরে ঘুরেছি উদ্‌ভ্রান্তের মতো। ভারতবর্ষের বাইরেও চলে গিয়েছিলাম জাহাজের খালাসী

হয়ে। কোথাও শান্তি পাইনি। শেষ পর্যন্ত ফিরে এসে চাকরি নিয়েছিলাম মধ্য প্রদেশের আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগে। জন্মভূমির টান কি মানুষে সহজে কাটাতে পারে ?

নিজের গ্রামেও গিয়েছি। কেউ চিনতে পারেনি আমাকে। রেভারেণ্ট স্টোন সাহেবের কুটিরের চিহ্নমাত্র নেই। ঘটুল-ঘরটা কিন্তু আজও আছে। গাঁয়ের গাইতা সেখানেই আমার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করেছিল। শুনলাম ১৯৪০ সালে চুরাশী বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন বৃদ্ধ স্টোন। যে পেন্সিল-কাটা ছুরিটা আমি সাহস করে ওঁর বুকে বসাতে পারিনি—সেটাই আমার অলক্ষ্য হাত বিঁধিয়ে দিয়েছিলেন ওঁর বুকে। জীবনের শেষ আট-দশটা বছর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন ওখানেই। কোরাপুট থেকে আহ্বান এসেছিল ; মিশনারীরা নিয়ে যেতে চেয়েছিল—উনি যান নি। গাঁয়ের মানুষই শেষদিন পর্যন্ত শুশ্রূষা করেছে তাঁর। সাহেবের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল—না সেই গ্রামে নয়, কোরাপুটে।

আপনি তো কোরাপুটে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন-সংস্থার চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়িটা তৈরি করছেন। ঐ টিলার নীচে একটা ছোট কবরখানা আছে লক্ষ্য করেছেন ? এখন যেটা চীফ এ্যাডমিনিস্ট্রেটার সাহেবের বাংলো ওটা ছিল টি, ডি, এল, এ এস্টেটের অর্থাৎ লেবার রিক্রুটিং অফিসের ম্যানেজারের বাড়ি—সেই বাংলোবাড়ির উল্টো দিকে এই সিমেটারী।

ঐ কবরখানার উত্তর পশ্চিম ধারে দেওয়াল ঘেঁষে দেখবেন দুটি কবর আছে। বাপ আর মেয়ের। পাশাপাশি। শ্বেত করবী গাছটা এখন আর নেই ; কিন্তু গাছের অস্তিত্বটা টের পাবেন—পাঁচিলের ফাটলটা দেখে। সেটা আর মেরামত করেনি কেউ। কবরটা জীর্ণ, তবু রেভারেণ্ট আর্নেস্ট স্টোনের এপিটাফটা আজও পড়া যায়। মিসেস বারওয়েল নাকি ওটা লিখেছিলেন। এর চেয়ে ভাল এপিটাফ অন্তত আমি লিখতে পারতুম না। কাত হয়ে পড়া এপিটাফ পাথরের একদিকে তাঁর জন্ম তারিখ, অন্যদিকে মৃত্যুদিন। মাঝখানে লেখা :

'আণ্ডার দিস স্টোন লাইস
রেভারেণ্ট আর্নেস্ট স্টোন
উইথ অল হিস্ আর্নেস্টনেস।'

এ চিঠির জবাব পাওয়ার উপায় নেই। আমার পরবর্তী ঠিকানা আমি

নিজেই জানি না। এটুকু জানি যে সে ঠিকানায় ডাক বিলি হয় না। চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়েছি। সেটা বড় কথা নয়, না দিলে আমাকে ওঁরাই বরখাস্ত করতেন। স্থির করেছি জন্মসূত্রে যারা আমার আত্মীয় তাদের মধ্যে গিয়েই বাস করব। রেভারেণ্ট স্টোনের মতো আর্নেস্টনেস্ নাই থাকল, আমার যেটুকু সাধ্য তাই করব। কিছু জমি বন্দোবস্ত নেব খাস আবুজমাড়ে। খেত খামার করব। মাড়িয়া হয়ে যাব। কে বলতে পারে হয়তো সংসারও পাতব সেখানে। ওখানে তো আর আমি জারজ নই, আমি ভুলা হুয়া মাত্র! সত্তর বছর বয়সে যদি আর্নেস্ট স্টোন নতুন জীবন শুরু করতে পারেন তাহলে এ বয়সে আমিই বা পারব না কেন?

একটা কথা। নারানপুরে গিয়েছিলাম মোহনকে খুঁজে বার করতে। তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া বাকী ছিল। এ অপরাধ আমি ক্ষমা করতে পারি না। তেমন মায়ের সন্তান নই আমি। কিন্তু আমাকে কিছুই করতে হল না। দেব আঙ্গোপেনের অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে মোহনের উপর। মোহন নারানপুরে নেই। তার নাকি কুষ্ঠ হয়েছে। স্থানীয় চিকিৎসকের নির্দেশে সে গেছে বোম্বাই অথবা কলকাতায়।

শীঘ্রই চলে যাচ্ছি আবুজমাড়ে। সভ্য জগত থেকে বেশী কিছু সাথে নেব না। ঘড়ি-কলম-জামা-কাপড় ছাড়াই যদি আমার মাতৃকুলের যুগ যুগান্তর সচ্ছন্দে কেটে গিয়ে থাকে তাহলে আমারও তা কাটা উচিত। যে কয়টি জিনিস সাথে নিয়ে যাচ্ছি তার মধ্যে রইল রেভারেণ্ট স্টোনের ফটোগ্রাফ, আর আপনার দেওয়া একটি স্মৃতিচিহ্ন—সেই নিঃশেষিত পৃষ্ঠা ক্যালেণ্ডারের ছবিখানি। হোয়াইট মেন্‌স বার্ডেনের ব্যাভিচার দেখে শিউরে ওঠা কবিগুরুর ছবিখানি।

গুপ্তেজীর চিঠিখানির অনুলিপি পাঠিয়েছিলাম নারানপুরে ডাক্তার পিল্লাইকে। জয়পুরে গুপ্তেজীর অদ্ভুত আচরণের এ কৈফিয়ৎ ডাক্তার সাহেবেরও জানা উচিত। শেষদিকে মোহনের উল্লেখ ছিল। সেটার কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাই মোহন রঙিলার উপাখ্যানটাও লিখেছিলাম চিঠিতে সবিস্তারে। যে অন্যায় করেছিলাম সেদিন অন্যায় সহ্য করে তার জন্য অনুতাপও জানিয়েছিলাম অকপটে।

জবাব এল কিছুদিনের মধ্যেই। গুপ্তেজীর চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার মাত্র আছে সে জবাবে—আর কিছুই নেই। লিখেছেন: আমিও আপনার গুপ্তেজীর সঙ্গে একমত। আপনি অত্যন্ত অন্যায় করেছিলেন ঘটনাস্থলেই গুপ্তেজীকে মোহনের অপরাধের কথা না বলে। তার চেয়েও বড় অপরাধ করেছিলেন আমার কাছে সে কথা গোপন করে। আপনাকে আমি বারে বারে বলেছিলাম—পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব কথা বলে যেতে। রাঙিলার সম্বন্ধে এতবড় সংবাদটা তা সত্ত্বেও কেন যে আপনি গোপন রেখেছিলেন, তা আজও আমার বুদ্ধির অগোচর। প্রথম রাত্রেই যদি অকপটে সব কথা বলতেন আপনি—তাহলে চয়নের কেসটা নিয়ে এত বেগ পেতে হত না আমাকে। তখনই নির্ভুল ডায়াগনসিস্ করতে পারতাম।

আপনার চিঠি পড়েই বুঝতে পারলাম চয়নের কী হয়েছে। কেন সে পাগল হয়ে গেছে। কী আশ্চর্য, এমন সহজ সমাধানটা আপনার মাথায় আসেনি মোহন-রঙিলা উপাখ্যান জেনেও?

মোহন আমার চিকিৎসাধীনেই ছিল। আপনার চিঠি পেয়েই ডায়েরি খুলে দেখলাম মোহন কবে প্রথম আমার কাছে এসেছিল। ছেলেটি বুদ্ধিমান। অন্তত আপনার গুপ্তেজীর চেয়ে বুদ্ধিমান। সে বুঝতে পেরেছিল তার কুষ্ঠ হয়নি, হয়েছে অন্য একটি সুপরিচিত রতিজ রোগ। কেস হিস্ট্রি লেখাবার সময় সে প্রথম রোগাক্রান্ত হবার একটা সম্ভাব্য তারিখ বলেছিল অকপটে। খোঁজ নিয়ে দেখলাম ঐ তারিখেই গত বৎসর নারানপুরে মাডাই হয়। লাফিয়ে উঠ্‌লাম নিজের আবিষ্কারে। ডাক্তারী বইটা হাতে নিয়ে তখনই চলে গেলাম চয়নের ছাপরায়। রোগাক্রান্ত একটি পুরুষের ফটো ওর সামনে মেলে ধরে বললাম: রঙিলার ধুরবানে তোমার কি এই রকম হয়েছে?

যেন ইলেকট্রিক চাবুক মেরেছি ওকে। চয়ন লাফ দিয়ে উঠে বলে: তুই কেমন করে জানলি?

বললুম: আমাদের ডাক্তারী পাংনাহারাও (ঝাড়ফুঁক ওয়ালারা) এই ধুরবানের (মারণ মন্ত্রের) কাটান জানে। এই দেখ, ধুরবানের ছবি তুলে রেখেছি—আর এই দেখ ভাল হয়ে যাবার পরের ফটো।

ফটো জিনিসটাকে চয়ন ভাল রকমেই চিনত—এই বাঁচোয়া। ব্যস্ চয়ন সম্পূর্ণভাবে শরণ নিল আমার। অকপটে স্বীকার করল সব কথা। যে রাত্রে

অন্ধকারে সে রঙিলাকে মালকো বলে ভুল করেছিল তারপর দিন সকালেই রঙিলা ওর সঙ্গে গোপনে দেখা করে। সরাসরি দাবী জানায় চয়নকে বিবাহ করতে হবে রঙিলাকে। চয়ন জ্বলে উঠেছিল ওর নির্লজ্জতায়। যে গালাগালে সবচেয়ে আহত হয় রঙিলা সেই গালই দিয়েছিল তাকে। বলেছিল: পাংনাহিন্! তুই ডাইনি!

রাগ করেনি রঙিলা। খিলখিলিয়ে হেসে উঠে বলেছিল: তাহলে তো তুই জানিস্ই। ঠিক বলেছিস; পাংনাহিন্। কাল রাত্রে যে কাণ্ডটা তুই করেছিস্ তার পর যদি আমাকে ফেলে মালকোকে বিয়ে করতে ছুটিস তাহলে আঙুল মটকে ধুরবান ছুঁডব তোর দিকে।

চয়ন রুখে উঠে বলেছিল: তাই ছোঁড! আমি ভয় পাই না তোকে! মার আমাকে। খুন করে ফেল! দেখি তুই কতবড় ডাইনি!

অদ্ভুত হেসে রঙিলা বলেছিল: না রে, প্রাণে তো তোকে মারব না। একটি ধুরবানে তোকে মেয়েমানুষ বানিয়ে দেব! আর মাল্‌কোকে বিয়ে করতে পারবি না—তারপর খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিল: আমাদের শিরদারকে বলব, তোর জন্যে লামহাদা খাটতে যাবে কাবোঙ্গায়!

দুরন্ত ভয়ে অসাড হয়ে গিয়েছিল চয়ন। রঙিলার পিঙ্গল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয়েছিল - পারে, ইচ্ছে করলে রঙিলা একটা জলজ্যান্ত পুরুষমানুষকে পৌরুষ থেকে চিরবঞ্চিত করতে পারে!

তার সে আতঙ্ক-তাডিত মুখখানা দেখে আবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল রঙিলা। বলেছিল: সেই ঠিক হবে! পুরুষমানুষ হয়ে যেমন লোভে লোভে আসকালোন ঘরে ঢুকেছিলি তেমনি ওখানেই ঢুকতে হবে তোকে এরপর।

দুরন্ত ক্রোধে পাশে পডে থাকা ধনুকটা তুলে নিয়েছিল চয়ন। অব্যর্থ লক্ষ্যে মারলে একটা বিষাক্ত তীর। একচুল বিচলিত হল না রঙিলা। চোখ দুটো শুধু ধ্বক করে জ্বলে উঠ্‌ল তার। তীর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে! আঙ্গুলগুলো মটমট করে মট্‌কে রঙিলা বিড়বিড করে কি যেন বললে। তারপর ধীরে সুস্থে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার সময় দেওয়ালে গেঁথে যাওয়া তীরটা সবলে উৎপাটন করে আবার ছুঁড়ে দিয়ে গেল চয়নের দিকেই।

অসাড় হয়ে বসে রইল চয়ন, কাবোঙ্গা গাঁয়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী তীরন্দাজ! মাত্র পাঁচ হাত দূরের লক্ষ্য ভেদ করতে পারেনি সে। জ্ঞান হবার পর এত

কাছের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ার কথা মনে পড়ে না তার। চয়ন শিকারীর তার পৌরুষকে হারাতে শুরু করেছে!

দুদিন কি তিন দিন! চয়ন লক্ষ্য করল ধুরবানের ফল ফলতে শুরু করেছে। সে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে—তিল তিল করে তার পৌরুষ ক্ষয়িত হতে শুরু করেছে! ক্রমে সে নারীতে পরিণত হয়ে যাবে! দুঃসহ এ চিন্তা! এ কথা কাউকে বলা যাবে না। কিন্তু আজীবন এ কথা লুকিয়েই বা রাখবে কেমন করে? মাল্‌কোকে কি বলবে?

তারপরের ইতিহাস আর ওর ভাল মনে নেই।

আয়েতু আন্দাজ করেছিল কিছুটা। রঙিলাকে চেপে ধরেছিল সে: চয়ন পাগল হয়ে যাচ্ছে কেন?

অকুতোভয়ে রঙিলা বলেছিল: আমার জন্যে। আমি ওকে ধুরবান মেরেছি।

: ধুরবান! তুই ধুরবান ছাড়লি কেমন করে? তুই কি তাহলে সত্যিই পাংনাহিন?

চীৎকার করে উঠেছিল রঙিলা: হ্যা আমি পাংনাহিন! কিন্তু কথাটা তো তুই জানিস। না হলে যে আমার জন্যে লামহাদা খাটতে এল কেন তুই তাকে মালকোর হাতে তুলে দিলি।

আয়েতু তুলে নিয়েছিল মাকৃষ্টা। কিন্তু কোপ বসানোর আগেই ছুটে বেরিয়ে গেল রঙিলা। আয়েতুও ছাড়বার পাত্র নয়, তাড়া করল রঙিলাকে। অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল সেই অরণ্যচারী ডাইনীটা। আয়েতু বাধ্য হয়ে ফিরে এল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল এর শোধ সে নেবেই। যাবে আর কোথায়? ফিরতে ওকে হবেই। আর তখন আয়েতু দেখে নেবে রঙিলা কতবড় পাংনাহিন! গাঁয়ের গাইতা সে—অত সহজে তার হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া যায় না।

কিন্তু সে সুযোগ আর আয়েতু পায়নি কোনদিন।

রঙিলা ফিরে আসেনি। একদিন, দুদিন,—শেষে ভয়ই পেল আয়েতু। গেল কোথায় মেয়েটা? কোথায় তা কেউ জানেনা। জঙ্গলের পথেই মিলিয়ে গিয়েছিল আয়েতুর সেই কুড়িয়ে পাওয়া প্রাকৃতির সন্তান। তারপর তাকে আর কেউ দেখেনি কারাংমেটায়।

চিঠি শেষ হয়ে গেল। মনে পড়ল রঙিলাকে। তাকে প্রথম দেখেছিলাম কাবোঙ্গা ঘটুলে। প্রশ্ন করেছিলাম গুপ্তেজীকে—এমন মেয়ে কেমন করে এল মুরিয়া গাঁয়ে। শুনে ক্ষেপে গিয়েছিলেন উনি ; বলেছিলেন : সভ্য জগতের মানুষের অসাধ্য কাজ আছে ? জঙ্গলের মধ্যে এসে একটা মেয়ের সর্বনাশ করে যাওয়া আর শক্ত কি ? সেদিন তাঁর উষ্মা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আজ বুঝতে পারি কারণটা। মায়ের কথা মনে পড়েছিল গুপ্তেজীর।

কিন্তু গুপ্তেজী নয়, রঙিলার স্মৃতিকে ঘিরে আজ চিন্তা জাগছে আমার। মনে পড়ছে কাবোঙ্গা ঘটুলে একরাতের অতিথির সেই প্রগল্‌ভ নাচ : 'ও হো ময়না হো লালসাই' ; মনে পড়ছে চয়ন শিরদারের প্রতি নিক্ষিপ্ত সেই বিদ্রূপবাণ—'বারাং সারপার্তে উদিতন সায়দার।' মনে পড়ছে যৌবন-উচ্ছল নৃত্যরতা সেই লাস্যময়ী তরুণীকে। তারপর অন্ধকার নির্জন অরণ্যে দেখেছি তার আর এক রূপ ! সেদিন সে ছিল নিরাবরণা ধর্ষিতা ভার্গব নন্দিনী ! কে জানে উশনা-কবির আত্মজা অরজার মতো এই অরণ্যচারিণী মেয়েটির অন্তরেও হয়তো লুকানো ছিল অমৃতকুম্ভ। স্বামী-সন্তান সংসার চেয়েছিল সেও আর পাঁচটা মুরিয়া মেয়ের মতো, অরজার মতো। পায়নি ! হয়তো সে সত্যই ভালবেসেছিল একটি অনিন্দ্যকান্তি মুরিয়া যুবককে—যার কাছে তার নারীত্ব প্রথম পেয়েছিল স্বীকৃতি। ভাগ্যের খেলায় শুধু বঞ্চনাই জুটল তার কপালে। প্রমাণিত হল সে পাংনাহিন ! গুপ্তেজী যেমন মাড়িয়ামায়ের ছেলের পরিচয় বহন করে ফিরে গিয়েছিলেন নিজের সমাজে,—হয়তো রঙিলাও তেমনি বন-জঙ্গল ভেদ করে ফিরে এসেছিল তার মাতৃকুলের সমাজে। কে জানে ? অথবা হয়তো বন্যজন্তুর নখরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে তার অতৃপ্ত দেহমন !

পিল্লাই-সাহেবের চিঠির জবাব লিখে উঠতে পারিনি। বছরের প্রথম তিনটে মাস আমাদের কাজের চাপ বেশী। মাসখানেক পরে আবার চিঠি এল নারানপুর থেকে। এবার ডাক্তারবাবু নয়, লিখছেন মিসেস্ পিল্লাই : একটা সুখবর আছে। একটা নয় দুটো। প্রথমত চয়নের নাকি অদ্ভুত উন্নতি হয়েছে চিকিৎসায়। প্রায় রোগমুক্ত সে। আপনার বন্ধুর মতে আরোগ্য নাকি দ্রুততায় ওঁর প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে উঠেছে। বোধহয় প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে। এই সপ্তাহেই ইন্‌জেকৃসনের কোর্স শেষ হচ্ছে। সে এখন ধরতে গেলে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। সে যাইহোক আগামী পঁচিশে মার্চ চয়নের বিবাহের

দিন স্থির হয়েছে। এখনও প্রায় মাসখানেক সময়। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করছি, ত্রুটি মার্জনা করে এ বিবাহে যোগদান করলে শুধু আমরা দুজনেই যে বাধিত হব তা নয়, স্বয়ং চয়নও খুশী হবে। তারই অনুরোধে আপনাকে আসতে লিখছি। এই মওকায় একটা মুরিয়া বিয়ে দেখে নিতে পারবেন, এটাও কম লাভ নয় আপনার তরফে।

দ্বিতীয় সুখবরটা হচ্ছে, উনি রিসাইন দিচ্ছেন। রিসার্চের কাজে যোগদান করবার মন হয়েছে এতদিনে। বিয়ে মিটে গেলেই আমরা দণ্ডকারণ্য ছেড়ে চলে যাব।

এই সঙ্গে একটা দুঃসংবাদও দিচ্ছি গোপনে। এ অঞ্চলে আদিবাসী মহলে একটা গোপন ষড়যন্ত্রজাল বিস্তৃত হচ্ছে মনে হয়। মহারাজ প্রবীরচন্দ্রের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক বিদ্রোহ হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। চয়ন মনে হয় সেই দলে পাণ্ডাগিরি শুরু করেছে। উনি তাই তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে দিতে চান। যেন সংসার থাকলেই পাগল মানুষ পাগলামি ছাড়তে পারে! আমি তা মোটেই বিশ্বাস করিনা। ভুজুভুগি কিনা। আপনি কি বলেন?

এ বিষয়ে আমি কি বলি তা অবশ্য জানাইনি। তবে চয়নের বিয়েতে যেমন করে পারি যাবার চেষ্টা করব—একথাটা জানালাম উত্তরে। মুরিয়া বিয়ে দেখার এমন দুর্লভ সুযোগটা ছাড়ব কেন?

সরকারী এঞ্জিনিয়ারিং অফিস সম্বন্ধে যাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে তাঁরাই জানেন মার্চের শেষ সপ্তাহে ক্যাজুয়াল লীভ চাওয়ার সঙ্গে আকাশের চাঁদ চাওয়ার কোনও প্রভেদ নেই। ডিভিসানাল এ্যাকাউন্টেন্টের টেবিলে মার্চ-ফাইনান্স বিল জমেছে যেন বাইলা-ডিলা পর্বত! আমার স্বল্প-পরিসর ড্রয়ারে মেজারমেণ্ট-বই যেন কলকাতার রাস্তায় অফিসগামী ট্রামবাসের ভীড়! একটা বিল নামে তো পাঁচটা বিল ঢুকতে চায় ড্রয়ারে! তবু দিন-তিনেকের ছুটি মিলল বিশেষ চেষ্টায়। একদিন যাওয়া একদিন আসা বাদ দিলে একদিন বিয়ে দেখতে পাব।

মুরিয়া বিয়ে রাতারাতি সারা হয়না। পাক্কা সাত আট দিন ধরে চলে

বিবাহ' উৎসব। মুরিয়া বিয়ে, ভেরিয়ার সাহেব বলেছেন, নানান জাতের। আগেকার দিনে আমাদের রাক্ষস-বিবাহ, শৈব-বিবাহ, গান্ধর্ব-বিবাহ প্রভৃতি নানান জাতের বিয়ের বিধান ছিল। এখনও হিন্দু-বিবাহ, ব্রাহ্ম-বিবাহ রেজেষ্ট্রি বিয়ের প্রকারভেদ আছে। মুরিয়া বিয়েরও তেমনি ছয়টি শ্রেণী বিভাগ আছে:

সাধারণ বিয়ে হচ্ছে 'ওস্তাসানা মারমি।' বাপমায়ের ব্যবস্থাপনায় এ বিয়েতে কনেকে হলুদের টিকা পরিয়ে বরের ঘরে পাঠানো হয় 'লাগির' অর্থাৎ বিবাহের মূল অনুষ্ঠানে। এরই প্রকারভেদ হচ্ছে 'তাক দিয়ানা'। এ ক্ষেত্রে সম্প্রদান বা 'লাগির' অনুষ্ঠিত হয় কনের বাড়ির সামনে একটা নতুন তোলা ছাপরায়। কনেকে নিয়ে ইলোপ করে বন্ধুর বাড়িতে উঠে রাতারাতি রোমাণ্টিক বিয়ের ব্যবস্থাও আছে—এর নাম 'আরউইটানা।' এটি গন্ধর্বমতে। খরচ যা হয় তা বরের দেয়।

সবচেয়ে মজা হচ্ছে 'হাইওয়ার্ক ওয়াং' বা 'পাইতু'। এটির কোন বিকল্প আমাদের সভ্যজগতে প্রচলিত নেই। তাই এটির ব্যাখ্যা করতে ভয় হচ্ছে। আমাদের সমাজে এটি প্রচলিত হলে ফুলে-ফুলে-মধু-খেতে অভ্যস্ত তরুণদের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হতে পারে। এটিকে প্রাচীন সয়ম্বর প্রথার রাক্ষসরূপ বলা যেতে পারে। আগেই বলেছি মুরিয়া সমাজে ছেলেমেয়ের সমান অধিকার। ছেলে যদি কনেকে ইলোপ করে বন্ধুর বাড়িতে উঠে গন্ধর্বমতে 'আরউইটানা' করতে পারে তাহলে মেয়েরাই বা সে-জাতীয় অধিকার পাবেনা কেন? 'পাইতু'-তে কনে একদিন গোপনে গৃহত্যাগ করে এবং মনে মনে যাকে স্বামী বলে মেনে নিয়েছে,—কিম্বা যে তরুণ তাকে গোপনে ভালবাসা জানিয়েছে, তার বাড়িতে গিয়ে চড়াও হয়। লজ্জার মাথা খেয়ে ধর্না দেয় সেখানে! যতক্ষণ না ছেলেটি বিবাহে মত দেয় ততক্ষণ সত্যাগ্রহ করে পড়ে থাকে। ছেলেটির পক্ষে অভিসারিকাকে প্রত্যাখ্যান করা অপৌরুষের পরিচায়ক। সমাজ এক্ষেত্রে মেয়েটির পক্ষ নেয়। মেয়েদের হাতে এই ব্রহ্মাস্ত্রটি থাকায় ঘটুলঘরের অবাধ সুযোগ গ্রহণ করবার পূর্বে মুরিয়া যুবককে ভেবেচিন্তে অগ্রসর হতে হয়। ইংরাজ কবির সেই সাবধান বাক্যটি না-জেনেও ওরা তাই মানে—'বেটার ডাই, দ্যান কিস্ উইদাউট ল্যভ!'

বিধবা বা বিপত্নিক যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তখন বিবাহ অনুষ্ঠানকে

সংক্ষেপ করা হয়। যাতে খবরটা কমে। অনাড়ম্বর এ বিয়ের নাম—'তিকা-তাসানা।'

ছয় নম্বর বিবাহের ব্যবস্থা দেওয়া হয় যদি হঠাৎ কোন মোটিয়ারী কুমারী অবস্থাতেই জননী হয়ে পড়ার উপক্রম করে। এ ক্ষেত্রেও অনুষ্ঠান সংক্ষেপিত করা হয়। সামাজিক অনুমোদন লাভ করতে যেটুকু না করলে নয় সেটুকুই অনুষ্ঠিত হয়। এ বিয়ের গোণ্ডি নাম 'ইয়ের দোসানা মার্মি।' 'মার্মি' হচ্ছে বিয়ে—আর 'ইয়ের-দোসানা' হচ্ছে জল ঢালা। এর একটি হালবি প্রতিশব্দ আছে—'ভুল-বিহাও'। অবশ্য ভুল-বিহাও আর ইয়ের-দোসানা ঠিক সমার্থক নয়। অনাগত সন্তানের পিতা যদি আনুষ্ঠানিক ভাবে মোটিয়ারীকে বিবাহ ক'রে শিশুকে 'ভুলা-হুয়া' থেকে নিষ্কৃতি দিতে রাজি হয় তাহলে সেটাকে বলব—ইয়ের দোসানা। অপরপক্ষে মোটিয়ারীকে ভালবেসে অথবা তার প্রতি করুণাবশত যদি অপরের অপরাধের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে কোন চেলিক বিয়ে করতে এগিয়ে আসে তখন তাকে বলি 'ভুল-বিহাও'!

চয়নের বিয়ে হচ্ছে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে—অর্থাৎ 'তাক-দিয়ানা' বিয়ে। তিন দিনের মতো ছুটি পেয়ে তাই দেখতে ছুটলুম নারানপুরে।

বরকর্তা ডাক্তার পিল্লাইয়ের ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি নেই। গোটা তিনেক তাঁবুর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম কারাং-মেটায় তার আগেই কম্পাউণ্ডারবাবু তিনটি তাঁবু খাটিয়ে ফেলেছেন। একটাতে থাকব আমরা তিনজন। পাশের তাঁবুতে মিসেস পিল্লাই আর কম্পাউণ্ডারবাবুর স্ত্রী—তৃতীয়টি রান্নাঘর। লতা-পাতা দিয়ে অস্থায়ী স্নানাগারও একটি বানিয়ে রাখা হয়েছে।

স্থানটা মনোরম। কারাংমেটা গ্রামও নারাঙ্গী নদীর ধারে। একদিকে দিগন্ত-অনুসারী ধানের ক্ষেত—এখন নাড়ামুড়ো ভরা ফাঁকা মাঠ। অন্যদিকে নারাঙ্গীর বালি-চিক্-চিক টলটলে জল। আকাশের পশ্চাৎপটে নীলচে-সবুজ ঢেউয়ের পর ঢেউ-তোলা আবুজ-মাড় পাহাড়। হরীতকি-বয়রার গোটা কতক গাছের ছায়াঘন একটা জায়গায় শিবির সংস্থাপনের স্থান-নির্বাচনটা ভালই হয়েছিল বলতে হবে। শর্বরী তো নেমেই ছুটলো নদীর পাড়ে, নুড়ি পাথর সংগ্রহে। বর্ষাগমে নারাঙ্গী হয়তো উপড়ে ফেলবে ব্রীজের এ্যাবাটমেণ্ট—এখন শর্বরীও অনায়াসে পারাপার করতে পারছে!

আমরা গিয়ে পৌঁছলাম পড়ন্ত বেলায়। মহিলারা এলেন আমারই সঙ্গে। ডাক্তারবাবু এসেছেন গতকাল। ধুলায়-লাল জামা কাপড় ছেড়ে, নারাঙ্গীর জলে মুখ হাত ধুয়ে এসে বসলাম সবাই গোল হয়ে। মিসেস্ পিল্লাই টিফিন্-ক্যারিয়ার খুলে সবাইকে খাবার পরিবেশন করতে থাকেন। আমার সঙ্গে আর্দালী নন্দু থাপাও এসেছিল। ডাক্তারসাহেবের ড্রাইভার আর ক্লিনারের সঙ্গে সে লেগে গেল রান্না-তাঁবুতে কাঠের উনানে চায়ের আয়োজনে।

দুটি মাত্র খাটিয়া জোগাড় করা গেছে। দৈর্ঘ্যে সে দুটি এত ছোট যে, তাতে আমার পক্ষে শোবার চেষ্টাটা হবে হাস্যকর, সুতরাং এই মওকায় শিভ্যালরি দেখিয়ে সে দুটি মহিলাদের তাঁবুতে চালান করে দেওয়া গেল। মাটিতেই পুরু করে খড় বিছিয়ে বিছানা পেতে নিলাম। ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে জুত করে শোবার উপক্রম করছি, পিল্লাই সাহেব ধমক দিয়ে ওঠেন : ও কি মশাই, শুচ্ছেন যে? বিয়ে দেখতে যাবেন না?

: বিয়ে? সে তো কাল। আজ আবার কি?

: মুরিয়া বিয়ে আপনাদের মতো এক সন্ধ্যার ছেলেখেলা নয়। রীতিমতো সাত দিন ধরে চলে বিবাহ-উৎসব।

আমি বললুম : সে তো আমাদের বিয়েতেও চলে। পাকাদেখা, গায়ে-হলুদ, বিয়ে, বাসি-বিয়ে, ফুলশয্যা, বৌভাত—সেও তো পাঁচসাত দিনের মচ্ছোব।

ডাক্তারবাবু বলেন : আপনি যে ফর্দ দিলেন তার মধ্যে 'বিয়ে' অনুষ্ঠানটাই প্রধান—আইনের চোখে অবশ্য কুশণ্ডিকা। মুরিয়া বিয়ের পাঁচদিনের অনুষ্ঠানে সবটাই আসল। তফাৎটা কেমন জানেন? আমাদের আনন্দ অনুষ্ঠানটা যেন দুর্গাপূজা। মহাষ্টমীর সন্ধিপূজা হচ্ছে তার ক্লাইমাক্স। আর মুরিয়া বিয়ে যেন পাঁচদিনের টেস্ট খেলা। কখন কে সেঞ্চুরি করবে, হ্যাট্‌ট্রিক করবে কেউ তা জানেনা। সব অনুষ্ঠানেরই তাই সমান গুরুত্ব।

আমি বলি : চয়নের ম্যারেজ-টেস্টের এটা কোন ইনিংস্‌?

: বিশেষ কারণে পাঁচদিনের টেস্ট এবার তিনদিনে খতম হচ্ছে, আজ দ্বিতীয় দিন।

: বিশেষ কারণটা কি?

শুনলাম ব্যাপারটা। আদিবাসীদের মধ্যে একটা চাপা বিক্ষোভ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে মিটিং হচ্ছে এ-বেলা ও-বেলা। মহারাজের গ্রেপ্তারে ওরা ক্ষেপে গেছে। এমন পরিবেশে দীর্ঘদিন আনন্দ উৎসব চলে না। বস্তুত গাঁয়ের গাইতার মেয়ের বিয়ে না হলে এ-অনুষ্ঠান স্থগিতই রাখতে হত হয়তো। মুরিয়া সমাজের মাতব্বরেরা বাধাও দিতে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে সংক্ষেপে সারা হবে বিয়ে।

পরশু এসেছে কাবোঙ্গার বরযাত্রী দল। বিকেল নাগাদ। শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও। ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে গত কালকের অনুষ্ঠানসূচীর একটা রিপোর্ট পাওয়া গেল। কাবোঙ্গা ঘটুলের সব কয়জন চেলিক-মোটিয়ারী এসেছে সহযাত্রী হয়ে। এসেছে ওর বাপ কোণ্ডা, গাঁয়েব গাইতা গাদরু, চয়নের মা, কাকা, কাকিমা, ইত্যাদি।

খানকয়েক ছাপরা তুলে রেখেছে কারাংমেটার লোকেরা। অতিথিদের আশ্রয়। ছাপরাগুলি কিন্তু কারাংমেটা গ্রামসীমার বাইরে। কারণটা নিগূঢ়। গাঁয়ের ভিতর ঢুকলেই তারা হবে গাঁয়ের অতিথি। তাহলে তখন তাদের থাকতে হবে ঘটুল-ঘরে। সেই আইন বাঁচাবার জন্যে ওরা গ্রামসীমার বাইরে ঘাঁটি গেড়েছে। ওরা আহার্য সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছে,—ঝুলিতে

বেঁধে অথবা পায়ে হাঁটিয়ে। জল আর জ্বালানি যোগান দেওয়ার দায় এ গাঁয়ের।

সন্ধ্যাবেলায় আগুন জেলে কাবোঙ্গার দল ক্যাম্প-ফায়ার করেছিল। এই নাচ নাকি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ—কারণ অবিবাহিত চেলিক হিসাবে এই তার শেষ নাচ। নাচের নামও 'শেষ-নাচ'।

নাচ শেষ হল রাত নটা নাগাদ। তখন শোনা গেল আয়েতুর বাড়ি থেকে মান্দ্রি ঢোলের ডুগুডুগু ভেসে আসছে। সবাই ছুটলো সেদিক পানে। ডাক্তারবাবুও গিয়েছিলেন ওদের ওদের পিছু-পিছু। কনের বাড়ির সামনে গিয়ে জমায়েত হয়েছে ছেলে-বুড়োর দল। বুড়োর দল অবশ্য বেশিক্ষণ থাকল না, দু-এক পাত্র লাগুা খেয়ে সরে পড়ল এদিক সেদিক। কারাংমেটার চেলিক-মোটিয়ারীর দল তখন বের করে আনল ঘর থেকে কনেকে। ঢুলোসা আর জানকি দুজনে ওর দুহাত ধরে নিয়ে এসে বসাল সভার মাঝখানে। এর পর শুরু হল গান। নাচ নয় কিন্তু।

এখানেই তফাৎ। কাবোঙ্গার ওদের ছিল আনন্দ-উৎসব। তার গানের সুরও তাই দ্রুতলয়ে—তার সঙ্গে নাচ না হলে জমে না। কারাংমেটার এই সান্ধ্য আয়োজন কিন্তু বেদনাবিধূর বিদায় অনুষ্ঠান। এখানে গানের সুর তাই বিলম্বিত লয়ে। নাচবার উৎসাহই নাই কারও। মালকোই গাইল প্রথম গান। তার তিনটি স্তবক : প্রথম স্তবকটা আয়েতুর উদ্দেশ্যে :

বাবা গো বাবা, তুমি আমার কাছে (এস)।
অজানা ঘরের ঘরনী করে
(আজ তুমি আমাকে) বিদায় দিচ্ছ।
হায় বড়াদেও, কেন তুমি (আমাকে বাবার)
পুত্রসন্তান করনি ?
(তাহলে আজ) আমাকে এভাবে
চলে যেতে হত না···
আমি (বাবার) সংসারকে
বড় করতে পারতাম···
(বাবার) ক্ষেতে কাজ করতাম···
আজ আমি পরের ঘরে (চলে যাচ্ছি)॥

অন্তরাটা আখালীকে উৎসর্গ করা :

মা গো মা, তুমি আমার কাছে (এস)।
গতকালকেও আমি (তোমার হাতে হাতে)
কাজ করেছি,...
ধান ভেঙেছি, ঝাঁট দিয়েছি,
জল ভরেছি ঘড়ায়...
তুমি (এতটুকু বেলা থেকে)
আমাকে খাইয়েছে, পরিয়েছ...
আজ আমি পরের ঘরে (চলে যাচ্ছি)॥

শেষ স্তবকে সম্বোধন করা হয়েছে ঘটুল-বান্ধবীদের :

ও ডুলোসা, ও তিলোকা,
ও আলোসা, ও জানকি!
তোমরা সবাই আমার কাছে (এস)।
আমি (তোমাদের সঙ্গে) নেচেছি,
গেয়েছি, হেসেছি, কেঁদেছি...
এতদিন আমি তোমাদেরই
একজন (ছিলাম)...
তোমাদের ভালবেসেছি
আর গালমন্দ দিয়েছি...
তোমরাও ভালবেসেছ
আর গালমন্দ দিয়েছ...
সেই আমি আজ পরের ঘরে
(চলে যাচ্ছি)॥

এ-গান মালকো রচনা করেনি। কে রচনা করেছে কেউ জানে না। ছড়ার পদকর্ত্রীকে কেই বা চেনে? কিন্তু আমার কেমন মনে হল, বাপের বাড়ী ছেড়ে যাবার সময় যে মেয়েটি এ-গান প্রথম বেঁধেছিল, সে যেন আমার পরিচিত! এই মেয়েটিই না লিখেছিল সেই বাংলা ছড়াটা?

বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন
খাটের খুরো ধরে

সেই যে বোন গাল দিয়েছেন
ভাতারখাকি বলে।

গানের আসর ভেঙেছিল রাতের দ্বিতীয় প্রহরে।

আজ সকালে যে অনুষ্ঠান হয়েছে, তার নাম 'সামধি ভেট্।' সামধি অর্থ বেয়াই, ভেট তো সাক্ষাৎ। এ-অনুষ্ঠান দুই বেয়াই—দুই বেয়ানের। এখানে বর-কনে তো নয়ই—তাদের বন্ধু বান্ধবেরাও আসতে পায় না। বস্তুত এ-অনুষ্ঠানে বুড়ো-বুড়িদের রঙ্গ-রসিকতার একটা সুযোগ দেওয়া হয়। হয় টাকের পাসপোর্ট অথবা পাকা চুলের ভিসা—এর একটা না দেখাতে পারলে সামধি ভেটের আসরে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

দুর্ভাগ্য আমার—এ অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করতে পারিনি। এক কন্যার জনক ডাক্তার পিল্লাইও এখানে ছাড়পত্র পাননি।

এর পর দুপুরবেলা হয়েছে 'মাণ্ডা-মিছানা'। মাণ্ডা সম্ভবত মণ্ডপের অপভ্রংশ—মিছানা হচ্ছে আহরণ বা সংগ্রহ। বিবাহমণ্ডপ যে কাঠ দিয়ে তৈরি হবে, তার কাঠ সংগ্রহ করাও নাচ-গানের মধ্যে দিয়ে করতে হবে। অনেকটা আমাদের 'জল-সইতে' যাওয়ার মত অহেতুক হুল্লোড়। দু পক্ষের চেলিক দল এক হয়ে যাবে কাঠ কাটতে। যে গাঁয়ে বিয়ে হচ্ছে, সেই গাঁয়ের গাইতা প্রথমে এক কোপে কাটবে একটা মহুয়া গাছের চারা। তারপর অন্যান্য সকলে চালাবে ঝপাঝপ মাকস্থ। দু পক্ষের মোটিয়ারীর দল কোন সাহায্য তো করবেই না, উপরন্তু নানাভাবে বাধা দেবে। টিটকারী দেবে, কাপড় ধরে টানবে, পিছন থেকে চেপে ধরবে উদ্যত কুঠার। চেলিকদের চটলে চলবে না। শত বাধা অগ্রাহ্য করে ডালগুলো কেটে নামাবে তারা। এখানেই তাদের কর্তব্য শেষ।

এবার দু পক্ষের মোটিয়ারীর কাজ। সেই কাটা গাছের ডাল তাদের বয়ে আনতে হবে বিবাহ-মণ্ডপে। ডালপালা ছেঁটে ফেলতে হবে প্রয়োজন মত। আর এবার দু দলের চেলিকেরা নেবে প্রতিশোধ! তারা সাহায্য তো করবেই না, বরং বাধা দেবে নানানভাবে। কাপড় খুলে দেবার চেষ্টা করবে, ডাল চেপে ধরবে; অথবা টিটকারীভরা গানে বিব্রত করে তুলবে ওদের। মাতব্বরেরা মাঝে মাঝে শুধু ধমক দিতে থাকবেন : নাও-নাও রঙ্গ-রসিকতা বন্ধ রেখে কাজটা করে ফেল এবার।

বর্ণহিন্দুর বিয়েতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কন্যাপক্ষকে দিতে হয় কন্যাপন। বরপক্ষকে বড় একটা উপুড়-হস্ত হতে হয়না, উপরন্তু বরযাত্রীর অত্যাচার হয়ে দাঁড়ায় বোঝার উপর শাকের আঁটি। তাই বিয়ের লৌকিক আচারে দেখি কন্যাপক্ষকে দেওয়া হয়েছে দু'একটি সুযোগ ;—'হাত-বাঁধানি', 'শয্যা-তুলুনি' কিম্বা 'বাসরজাগানি'! ভারসাম্য রক্ষার ক্ষীণতম একটা প্রয়াস বলা যেতে পারে সেটাকে। মুরিয়ারা সাম্যের ধ্বজাধারী। চেলিক-মোটিয়ারীর সেখানে সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার। চেলিকরা যখন গাছ কাটবে তখন মোটিয়ারীরা যদি তাদের পিছনে লাগবার অধিকার পায়, তবে মোটিয়ারীরা যখন সেগুলি কুড়িয়ে আনবে তখন এরাই বা সে সুযোগ পাবেনা কেন? শুধু তাই নয় ছেলেমেয়েরা যখন রঙ্গরসে নাচবে তখন যদি বুড়োদের সরে থাকতে হয় তাহলে বুড়ো-বুড়ির সাম্‌ধি-ভেটেও ছেলে ছোকরাদের সরে দাঁড়াতে হবে।

অবশ্য কম্পাউণ্ডারবাবু বলেছিলেন, এসব আইন মুরিয়া সমাজে সর্বজনীন নয়। তিনি ইতিপুর্বে যে দুটি মুরিয়া বিয়ে দেখেছিলেন সেখানে 'সাম্‌ধি ভেটে' এ ধরণের নিষেধাজ্ঞা ছিল না। 'মাণ্ডা-মিছানাতে'ও কেউ কাউকে বাধা দেয়নি। হতে পারে হয়ত এটা স্থানীয় লোকাচার।

দুর্ভাগ্য আমার। এসব কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি গিয়ে পৌছবার আগেই এসব অনুষ্ঠান সারা হয়ে গেছে। আজ রাত্রে শুনলাম বরের মাথায় মুকুট পরানোর উৎসব হবে। তাই দেখতে গেলুম সবাই মিলে দল বেঁধে।

আমরা যখন গিয়ে পৌছলাম তখন বিবাহ-মণ্ডপে বেশ লোক জমেছে। চেয়ার কোথায় পাবে? কাটুল পেতে দেওয়া হল আমাদের জন্য। বড় বড় গোটা পাঁচেক মশাল জ্বলছে। মণ্ডপের মাঝখানে একটা মাটির বেদী। তার উপর একটা জ্যামিতিক নক্সা আঁকা। এর নাম 'ঘাড়ি'। গাইতা স্বয়ং এটি এঁকেছে, আর পূজারী মন্ত্রপাট করেছে। এটা নাকি মঙ্গলচিহ্ন। মনে হল, এ জাতীয় মাঙ্গলিক চিহ্ন হিন্দু পুজাতেও দেখেছি। মাটির বেদীর সামনে মোটা মোটা নয়টা খুঁটির উপর শালকাঠের একঠা মাচাঙ।

বেদীর সামনে একটা মাদুর পাতা। তার উপর বসেছে চয়নের শ্বশুর আয়েতু। আর তার কোলে বসে আছে চয়ন। আমাদের দেখে

মিটি মিটি হাসছে। ওর গলায় তিন-চার গ্রন্থ কড়ির মালা, উপর হাতে বাজুবন্ধ, মণিবন্ধে বালা, কপালে পুঁতির টায়রা। বরপক্ষের তরফ থেকে গাদরু একটা তাঁতের কাপড় আর একছড়া পুঁতির মালা এনে দিল আয়েতুকে। আয়েতু কিন্তু সেটা হাত পেতে নিল না। কি যেন বাক্য-বিনিময় হল। হেসে উঠ্‌ল সবাই।

ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হতে হল। শুনলাম, এগুলি বরপক্ষের তরফ থেকে কনের মায়ের মর্যাদা দেওয়া হল। সোজাকথায় শ্বাশুড়ীর 'নমস্কারী-বেনারশী'! আয়েতু তাই প্রত্যাখ্যান করে বলেছে : যার ধন তাকেই দাও হে—আমাকে কেন ? আমি কি শাড়ি পরি ?

অগত্যা ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসতে হল আখালীকে। হাত পেতে নিল পাত্রীর মায়ের মর্যাদা।

গাদরু এবার একটি কুশের আংটি, কয়েকটি কড়ি আর শিয়ারি পাতায় করে এক ঠোঙা মধুক উৎসর্গ করল আয়েতু গোণ্ডের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে। এটা পূর্বপুরুষদের প্রাপ্য। না হলে খুশিমনে নিজ গোত্রের একটি মেয়েকে ভিন্ন গোত্রে যেতে দেবেন কেন তাঁরা ? শুনলাম বিবাহের এই অংশটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কি যেন একটা গোণ্ডি শব্দ বলল ওরা, যার অর্থ 'গোত্রান্তর-অনুষ্ঠান'।

এবার আয়েতুর ছুটি হল। আর শ্বশুরের কোলে নয়, এবার বসতে হবে কোন বৌঠানের কোলে। সম্পর্কে বৌদিদি হন এমন একজন প্রৌঢ়া মহিলা এসে বসলেন সেই মাদুরে। পিসি, খুড়ি, মাসীর দল এবার এসে ঘিরে ফেললে বরকে। আমাদের যেমনভাবে শুভদৃষ্টি হয়, অনেকটা তেমনিভাবে একটা কাপড় দিয়ে আড়াল করা হল, যাতে সভাশুদ্ধ কারও দেখতে কিছুমাত্র অসুবিধা না হয়। এবার হবে 'নয়ী-মৌর' উৎসব। ডুগুডুগু করে বাজল মান্দ্রি ঢোল। কাবোঙ্গার গাইতা গাদরু এবার নিয়ে এল মুকুটটা। 'নয়ী-মৌর'। বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় 'তেল-টোপর' বা তেল-মুকুট। হাতে নিয়ে দেখলাম। তালপাতায় বোনা অদ্ভুত জিনিসটা। গোটা তিনেক নয়ী-মৌর আনা হয়েছিল—তার মধ্যে একটা পছন্দ করা হল। যে তৈরি করেছে, তার শিল্পবোধকে তারিফ করতে হয়। প্রায় ফুটখানেক ব্যাসবিশিষ্ট এই মুকুটগুলিতে বিযোড় সংখ্যক পাপড়ি থাকা চাই। যেটা পছন্দ করা হল, সেটাতে সাঁইত্রিশটা পাপড়ি।

ওদের আইনে বিবাহের সব কিছুই বিযোড় সংখ্যায় হতে হবে। নয়ী মৌরএর পাঁপড়ির সংখ্যা সাঁইত্রিশ, বিবাহ মণ্ডপের খুঁটির সংখ্যা নয়, মুকুটটা চয়নের মাথার উপর দোলানো হল সাতবার। আমাদের 'পাঁচ-এয়োর' মতো ওরাও পাঁচজন বিবাহিত মুরিয়া রমনী বরের মাথায় চাঁদোয়া ধরে রইল। বিযোড়-সংখ্যা 'এক' যেখানে যোড়-সংখ্যা 'দুই' হতে চলেছে সেখানে সবকিছু বিযোড় করার এ প্রচেষ্টা কেন? হয়তো ওদের আসল লক্ষ্য যোড়-সংখ্যা 'দুই'-কে অচিরে 'তিন' করতে!

তাই হবে। দেখলাম, কন্যাকে সবাই আশীর্বাদ করছে যে বাক্যে তার নির্গলিতার্থ—'অচিরে সন্তানবতী হও'!

নয়ী-মৌরটা সাতবার চয়নের মাথার উপর দুলিয়ে গাদরু হঠাৎ বীরবিক্রমে একটা হুঙ্কার দিয়ে চয়নের মাথায় সেটা বসিয়ে দিল। যেন অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙেছে গাদরু—সমবেত সকলে উল্লাসে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। ফিরিঙ্গি পাড়ায় সিনেমা দেখতে গিয়ে কিছু না বুঝেও আমরা যেমন মাঝে মাঝে জনতার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে হেসে উঠি ইয়াঙ্কি রসিকতায়—এক্ষেত্রেও তেমনি আমরা করতালিযোগে অভিনন্দন জানালুম গাদরুকে, তার অভূতপূর্ব সাফল্যে। গাদরু এবার চয়নের মাথায় একটা শুকনো লাউয়ের হাতায় করে তেল ঢেলে দিল আর কচি আম পাতায় হলুদ নিয়ে ওর সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দিল। এই সুযোগে মোটিয়ারীর দল 'নয়ী-মৌর' উৎসবের একটা গান গেয়ে নিল সমবেত কণ্ঠে :

বারি কাটা ছিন্দ্ বুটা রতি রতি কান্দে
ওহো..... রতি রতি কান্দে ॥
না কান্দরে ছিন্দ্ বুটা বাবু মৌর পিন্দে,
ওহো......বাবু মৌর পিন্দে ॥
বান্ধো তে বান্ধো পুজারি,
ছুটুক মৌর বান্ধো,
ওহো......ছুটুক মৌর বান্ধে ॥

অর্থাৎ,—

বাগান-ভরা তালপাতা কি
কাঁদছে তামাম্ রাত্তি?

ওহো (কেন) কাঁদিস তামাম্ রাতি?

কাঁদিস নারে তালের পাতা,

তোকেই আমার নাতি

ওহো (জানি) করবে বিয়ের ছাতি॥

বাধ্ পূজারী বাঁধবে এবার

ছোট্ট মুকুট বাঁধ,

ওহো (এল) নাতির ঘরে সাথী॥

নম্বী-মৌর গর্ভাঙ্কের এখানেই পড়ল যবনিকা।

এবার দু-তিনজনে ধরাধরি করে নিয়ে এল পাত্রীকে। একবস্ত্রা কন্যার সাজ যেটুকু, সেটুকু শুধু অলঙ্কারের আতিশয্যে। কানে, গলায়, হাতে পায়ে। তবে চুলটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে খুব যত্ন করে। আর আশ্চর্য, ওর মাথায় একটাও কাঁকুই নেই। এত সাজগোজ সত্ত্বেও বস্ত্রের স্বল্পতা হেতু আমাদের চোখে ওকে ঠিক বিয়ের কনে বলে মনে হচ্ছে না কিন্তু।

এবার আবার আয়েতুর কোলে বসল চয়ন। আর কোণ্ডার কোলে মালকো। দুই সাম্‌ধি বসল মুখোমুখি। কারাংমেটার দুলোসা, তিলোকা এসে মালকোর হাতে আচ্ছা করে তেল মাখালে কনুই পর্যন্ত। তারপর গাদরু একটা কুশের আংটি এনে পরিয়ে দিল চয়নেব বাঁ হাতের কনিষ্ঠায়। কি যেন বললে সুর করে। মন্ত্রোচ্চারণ করল বোধ হয়। এবার বরের কর্তব্য হচ্ছে নিজের আঙুল থেকে আংটি খুলে কন্যাব বাঁ হাতের অনামিকায় সেটা পরিয়ে দেওয়া। আব কন্যার কর্তব্য, কিছুতেই সেটা আঙুলে না পরা। ফলে রীতিমতো হাত কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল। বুঝলাম, এই জন্যেই মালকোর সখীরা তার হাতে তেল মাখিয়ে দিয়েছে—যাতে চয়ন হাত ধরলে সেটা পিছলে যায়! এই হাত কাড়াকাড়ির খেলা যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ বরকনে কেউই নিজের শ্বশুরেব কোল ছেড়ে উঠতে পারবে না কিন্তু। মোটিয়ারীর দল হাততালি দিয়ে ওদের ঘিরে নাচতে থাকে :

মুদা মুদা ইণ্টোনি রে দাদা।

সোনা পেকো আয়ে রেঁা দাদা॥

শেষ পর্যন্ত কিন্তু চয়নই জিতল। মালকোর বাহুমূল ধরে টেনে আনল কোলের কাছে। জোর করে পরিয়ে দিল আংটিটা ওর অনামিকায়। প্রথামতো

মোটিয়ারীরা ধিক্কার দিল মালকোকে—সে নাকি লোক-দেখানি বাধা দিয়েছে—আন্তরিকভাবে বাধা দেয়নি।

কে যেন কি একটা বললে, আর হেসে গড়িয়ে পড়ল সবাই।

আমি কৌতূহলী হয়ে বলি: কি, কি বলল ও?

পিল্লাই সাহেবের মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে, প্রায় কানে কানে বলেন: ও আর আপনাদের শুনে কাজ নেই।

বুঝলাম কিছু একটা রসিকতা করা হয়েছে, যা আমাদের ধাবনায় শ্লীলতা-বহির্ভূত।

হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালালো মালকো। আর যাওয়ার পথে তার তৈলাক্ত মুঠিতে চয়নের পিঠে কষিয়ে দিলে একটা বিরাশী-সিক্কা কিল—দুম করে! চয়নও উঠে পড়ে ছুটল তার পিছনে—কিন্তু নাগাল পেল না বধূর। কারাংমেটার চেলিকরা তাদের প্রিয় মালকোকে আড়াল করে ঘিরে দাঁড়াল, তাকে পালাবার রাস্তা করে দিল। এই নাকি নিয়ম। পরদেশী পুরুষের আক্রমণ থেকে ঘটুলের প্রতিটি মোটিয়ারীকে বক্ষা কবাব কঠিন দায়িত্ব চেলিক দলের। এই শেষবারের মত সে অধিকার প্রয়োগ করল তারা। ওদের সমবেত বাধাদানে হার মানতে হল চয়নকে। কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হল অগত্যা।

এর পর মধ্যাহ্ন-বিরতি।

তাঁবুর দিকে ফেরার পথে বললুম: যাই বলুন মিসেস্ পিল্লাই ওদের এই আংটি পরানোব খেলা আমাদের কড়ি খেলাব চেয়ে ঢের বেশী ইণ্টারেস্টিং।

শর্মিলা দেবী সায় দিয়ে বলেন: বটেই তো, আহা এমন কিল মাববার সুযোগ আমরা পাই না!

ডাক্তার পিল্লাই বলেন: প্রকাশ্যে কিল মারতে পার না বলেই বুঝি জনান্তিকে বাকি জীবনটা ধবে সে খেদ মিটিয়ে নাও?

কম্পাউণ্ডারবাবুর স্ত্রী শুনতে না পাওয়ার ভঙ্গি করে হাসি গোপন করেন।

শর্মিলা দেবী ধমক দিয়ে ওঠেন: চুপ কর দিকি।

কিন্তু চুপ করতে দিলে না শর্বরী। আমার কোল থেকে সে প্রশ্ন করে মাকে: তুমিও বাবাকে কিল মেরেছিলে মা?

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো নাচ-গান হৈ-হল্লার আওয়াজে। কী ব্যাপার? না, স্নান করানো হচ্ছে বরবধূকে। এই সাত সকালে? শুনলুম, —হ্যাঁ, তাই নিয়ম। জুত করে চা-টাও খেতে দিল না দেখছি। গুটি গুটি গিয়ে হাজির হওয়া গেল বিয়ের মণ্ডপে। মোটিয়ারীরা আট-দশ কলসি জল এনে রেখেছে সূর্য ওঠার আগেই। এবার কন্যাপক্ষের মোটিয়ারীরা ধরে নিয়ে এল বরকে—তারপর বরপক্ষের মোটিয়ারীরা ধরে আনবে কনেকে। প্রথমে স্নান করবে বর, পরে কনে। তাতেও মুক্তি নেই—ও বেলা বরকনে নাকি একসঙ্গে আবার স্নান করবে। আর সেই যুক্ত-স্নানই হচ্ছে, যাকে বলে "লাগির"—বা বিবাহের মূল অনুষ্ঠান।

স্নান করাবি তো জল ঢাল—তা নয়, বরকে ধরে নিয়ে এসে দল বেঁধে গান ধরল সবাই। আর শুধু কি গান? সেই সাথে নাচ।

বরকেও নাচতে হল ওদের সঙ্গে, মণ্ডপটা ঘুরে ঘুরে। তারপর সবাই মিলে বরকে নিয়ে গিয়ে বসাল একটা জলচৌকিতে। চার-পাঁচজন মোটিয়ারী কলসী করে ক্রমাগত জল ঢালতে থাকে ওর মাথায়। সবাই হৈ হৈ করে ওঠে। চয়ন কোন উচ্চবাচ্য করল না। আর এক হাঙ্গামা। স্নানের পর গা মুছবার আইন নেই। তাই শূন্য কলসীগুলো সরিয়ে রেখে মোটিয়ারীরা এবার নিয়ে এল ঝুড়ি আর কুলো। সেগুলি দিয়ে ক্রমাগত বাতাস করতে লাগল চয়নকে। ক্রমে যখন গায়ের জল শুকিয়ে গেল তখন চয়ন চট করে উঠে বসল একটা ঝুড়িতে। আট-দশজন মোটিয়ারী ধরাধরি করে চুপড়িশুদ্ধ বরকে নিয়ে চলল তার ছাপরার দিকে।

ওদিক দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল বরপক্ষের মেয়েরা কনেকে নিয়ে। যেন রঙ্গমঞ্চে একদলের প্রস্থান আর অপরদলের প্রবেশ। মাল্‌কোকে নিয়ে গিয়ে বসান হল সেই জলচৌকিতে। আর কাবোঙ্গার মেয়েরা এবার কলসী করে জল ঢালল ওর মাথায় আশ্ মিটিয়ে। তার সঙ্গে চলল গান:

> ডুল্‌হি না আঙ ধোইলা চেলিক-সুন্দর পানি॥
> "পানিয়া পানিয়া" বোলিস্ রে নোনা…
> আবে পানিয়া পাওয়ালিস্ রে নোনা…
> ডুল্‌হি না আঙ ধোইলা চেলিক-সুন্দর পানি॥

অর্থাৎ ঃ

কনেকে আজ স্নান করাব চেলিক-সুন্দর জলে।
"কাঁকুই কাঁকুই" মরতেছিলি খুঁজি ;
কাঁকুই খোঁজা শেষ হল আজ বুঝি !
(তাই) কনেকে আজ স্নান করাব চেলিক-সুন্দর জলে॥

অনুবাদ শুনে আমি বললুম ঃ তা না হয় বুঝলুম—কিন্তু পানির বিশেষণ 'চেলিক-সুন্দর' হল কেমন করে ?

পিল্লাই বলেন ঃ আপনি সাহিত্যিক মানুষ হয়ে এমন বেরসিকের মতো কথাটা বললেন ? Way যদি weary হতে পারে, pillow হতে পারে sleepless তা হলে পানির পক্ষেই বা 'চেলিক-সুন্দর' হওয়া অসম্ভব কিসে ?

আমি বললুম ঃ তা বটে !

স্নানের পর 'তীর-তেল' উৎসব।

বরকনেকে বসানো হল মণ্ডপে। মাথার উপর যুক্ত-কর রেখে ওরা বসল পাশাপাশি। হাতের ফাঁকে গুঁজে দেওয়া হল একটা তীর। ফলাটা উর্ধ্ব আকাশের দিকে।

মোটিয়ারীরা প্রথামত গান ধরল ঃ

দুলহা কাঁহা গেল রে বেলোসা ?
ওঁহাহি হুহার গেল সে বেলোসা॥

চয়ন চট করে উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন বললে। হাঁ হাঁ করে ছুটে এল ওর মাসী-পিসির দল। কী একটা কাণ্ড হয়ে গেল যেন। তারপর চয়ন একটু থতমত খেয়ে চুপচাপ বসে পড়ল। মোটিয়ারীরা অন্য একটা গান ধরল। মিসেস পিল্লাই কৌতূহলী হয়ে বলেন ঃ ব্যাপারটা কি ?

বুঝিয়ে দিলেন রমানাথন। বিয়ের আসনে বর যখন বসবে তখন তাকে কথা বলতে নেই। যাবতীয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঠাট্টা-তামাসা তাকে নিশ্চুপ সহ্য করতে হবে। কোন উত্তেজনাতেই তাকে বিচলিত হতে নেই। তাতে নাকি ভারি অমঙ্গল হয়।

আমি বলি ঃ কিন্তু চয়ন ঘড়া ঘড়া ঠাণ্ডা জল সহ্য করে হঠাৎ এখনই বা এমন ক্ষেপে গেল কেন ?

পিল্লাই হেসে বলেন ঃ মোটিয়ারীরা যে গান গেয়েছে সেটা প্রথামতোই

গেয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে 'বেলোসা'র নামে ও ঠাট্টাটা চয়ন হজম করতে পারেনি। ও গানের অর্থ হচ্ছে "বর কোথায় পালালো রে বেলোসা, সে কি তোর বোনকে নিয়ে ভেগে পড়তে চায়?"

যাই হোক, এর পর এগিয়ে এল পুজারী। হলুদ-গোলা জল আর তেল ঢেলে দিল বরকনের মাথার-উপর-ধরা তীরের উপর। মাথা বেয়ে গা বেয়ে পড়তে লাগল হলুদ-গোলা তেল।

শর্মিলা দেবী বললেন: রাম রাম রাম। স্নানের পর এই কাণ্ড!

পিল্লাই বলেন: না হলে আর এদের লক্ষ্মীছাড়া বলেছে কেন? তোমার লক্ষ্মীর পাঁচালীতেই তো লেখা আছে লক্ষ্মীছাড়ার সংজ্ঞা—"স্নানের পরেতে করে তৈলের মর্দন!"

আমি বললুম: আপনি কি বাংলাভাষার কোন বই পড়তে বাকি রাখেন নি? কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ থেকে যায় লক্ষ্মীব পাঁচালি?

পিল্লাই হেসে বলেন: সবই এই লক্ষ্মীব কৃপায়। শাস্ত্রেব অর্থভেদ না করতে পারলেও সহপাঠিনীব মর্মভেদ করতে যেটুকু দরকাব—

মিসেস্ পিল্লাই ধমক দিয়ে ওঠেন: আহ্! চুপ করুন তো দেখি আপনারা!

দুপুরবেলা আহাবাদির পর হবে আসল অনুষ্ঠান। লাগির। যদিও পিল্লাইসাহেব বলেছেন সবকয়টি অনুষ্ঠানই সমান গুরুত্বপূর্ণ, তবু এদের ভাবগতিক দেখে মনে হল আসল উৎসব হচ্ছে—'লাগির'। অনেকটা আমাদের সিন্দুব-দান উৎসবেব মতো।

অর্থাৎ বরকনে বিবাহমণ্ডপে গিয়ে দাঁড়াবে—সামনে-পিছনে। আমাদের বরকনে যেমন দাঁড়ায় কনকাঞ্জলির সময়। গাঁটছড়াও বেঁধে দেওয়া হবে দুজনের বস্ত্রখণ্ডে। এর পর একজন উঠবে মণ্ডপের চালে, আর মন্ত্রোচ্চারণের সাথে সাথে জল ঢালবে চালের উপর থেকে।

দুপুরবেলা আহাবাদি সেরে আরাম করছি। ওরা বলেছে লাগির বসবে 'বাহাৎ-এর্তায়' অর্থাৎ পড়ন্ত বেলায়, অপরাহ্নে। ঘণ্টা দুই তিন গড়িয়ে নেওয়া চলতে পারে। শর্মিলা দেবী পাশের তাঁবুতে শর্বরীকে ঘুম পাড়াচ্ছেন শুনতে পাচ্ছি। ডাক্তারসাহেব খড়ের গাদার উপর চাদর বিছিয়ে লম্বা হয়ে পড়েছেন। আমি গাদরুর কাছ থেকে একটা নয়ীমোর

চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম, বিকালে সেটা তাকে ফেরত দিতে হবে। স্কেচ-বইতে সেটার একটা নক্সা আঁকবার ব্যর্থ চেষ্টায় আমি গলদঘর্ম।

ডাক্তারসাহেব বলেন: কি করছেন বলুন তো তখন থেকে? পাতার পর পাতা কাটাকুটি করে চলেছেন দেখছি।

বললুম: জিওমেট্রিক্যাল ড্রইংএর একটা কঠিন অঙ্ক কষছি।

: জিওমেট্রিক্যাল ড্রইং? কারাংমেটা গাঁয়ে?

: আজ্ঞে হ্যাঁ, চোখের আন্দাজে চোদ্দ ডিগ্রী চব্বিশ মিনিটের একটা কোণ কেমন করে আঁকা যায় তাই ভাবছি। কিছুই হচ্ছে না, পাতার শ্রাদ্ধ ছাড়া!

: সে অবাক কি? অমন বিদ্‌ঘুটে একটা কোণই বা আঁকবার জন্যে মরণপণ করে বসেছেন কেন?

বললুম: কি করি বলুন। এ বেটা নিরক্ষর নয়ীমোর বানানে-ওয়ালা কোথায় ড্রইং শিখেছিল জানি না—কিন্তু লোকটা তার নক্সায় পঁচিশটা নিখুঁত পাপড়ি তুলেছে। ৩৬০ ডিগ্রীকে পঁচিশ দিয়ে ভাগ করলে এক-একটা কোণ হয় চোদ্দ ডিগ্রী চব্বিশ মিনিট। বিনা প্রটেক্টরে ও হতভাগা তালপাতার প্যাটার্নটা যদি বানিয়ে ফেলতে পারে, তাহলে চোখ আন্দাজে আমি তার একটা নক্সা আঁকতে পারব না? না পারলে এর পর শিবপুর কলেজ রি-ইউনিয়নে ঢুকতে দেবে না যে আমাকে!

হা-হা করে হেসে ওঠেন ডাক্তার সাহেব। ঠিক সেই সময়েই কারা যেন এল তাঁবুর সামনে।

: কে? ভিতরে এস—বললেন পিল্লাই মাড়িয়াভাষায়।

ঘরে এল তিন-চারটি মেয়ে। কারাংমেটার মেয়ের দল। সঙ্গে এসেছে মালকো। তার হাতে একটা মাদুর। নতনেত্রে কি যেন বললে মালকো।

ডাক্তারসাহেব হেসে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ডেকে আনলেন মিসেস্ পিল্লাইকে। বলেন: তোমার জন্য মাল্‌কো এই উপহারটি নিজে হাতে তৈরি করে এনেছে।

শীতলপাটির মত কি একটা বনজ উদ্ভিদ দিয়ে বোনা হাত চারেক লম্বা দেড়-হাত চওড়া নক্সা-কাটা একটা মাদুর। ওরা বললে মাস্‌নি। শার্মিলা দেবী হাত ধরে মাল্‌কোকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। যাবার আগে মাল্‌কো আমাদের জোহার করে গেল।

বুঝলাম এটুকু না করে তৃপ্তি পাচ্ছিল না মাল্‌কো। চয়নের আশা ত্যাগ করেছিল বেচারি। ডাক্তারবাবু সেই চয়নকে সুস্থ-সবল করে ফিরিয়ে এনেছেন মৃত্যুর মুখ থেকে। চয়ন ভাল হয়ে গেছে, আবার কাছে টেনে নিয়েছে মাল্‌কোকে, আদর করেছে তাকে। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সফল হয়েছে মাল্‌কোর। আজ সে চয়নের ঘরণী হতে চলেছে। তাই ডাক্তারবাবুকে স্বহস্তে-বোনা এই মাসনিটি দিয়ে সে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চায়।

ঘণ্টাখানেক পরে শার্মিলা দেবী ফিরে এলেন ওদের নিয়ে।

—আরে, আরে, এ কে? মাল্‌কোকে যে আর চেনাই যায় না। এতক্ষণ বাঙালী কায়দায় তিনি পাশের তাঁবুতে বসে কনেকে সাজিয়েছেন। মাল্‌কোর পরণে একটা সিল্কের ছাপা শাড়ী, গায়ে বুটিদার ব্লাউজ। মুখে শ্বেতচন্দনের অভাবে স্নো-র ফোঁটা, কপালে কুমকুমের টিপ। আর সবচেয়ে মজা, লজ্জা-জড়িত চরণে মাল্‌কো এসে ডাক্তারবাবুব পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। নিঃসন্দেহে এটা শর্মিলা দেবীর ট্রেনিং। কিন্তু তিনি তো ওদের ভাষা জানেন না। তালিম দিলেন কেমন করে? ডাক্তার পিল্লাই বেশ অভিভূত হয়ে পড়েছেন মনে হল। আজ এই যে ফুলটি ফুটতে চলেছে এর পিছনে দীর্ঘদিনের নিরলস পরিশ্রম আছে তাঁর। মুখটা তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দাঁড়িয়ে উঠে আশীর্বচন উচ্চারণ করলেন উনি। কি বললেন, তা না বুঝলাম আমি, না মাল্‌কো। উনি আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন মাতৃভাষায়।

আমি বললুম: ববকনেব জন্য আমিও একটা উপহার এনেছি, সেটা কখন দেওয়া আইনসঙ্গত?

: এখনই দিতে পারেন—বলেন ডাক্তারবাবু।

সুটকেশ খুলে বার করে দিলাম পাঁচসেলের একটা বড টর্চ। খুব খুশী হল ওরা। বারে বারে জ্বালিয়ে নিবিয়ে দেখে নিল।

বিকালে লাগির দেখতে গেলাম যখন তখনও দেখি মাল্‌কো সেই ছাপা শাড়ীখানাই পরে আছে। বাঙালী কায়দায়, অর্থাৎ যাকে মেয়েরা বলে 'ড্রেস করে'। পোষাকটা পছন্দ হয়েছে সকলের এটা বোঝা যায়। এরা বোণ্ডো-শবর বা মাড়িয়াদের মতো নয়। ব্লাউজ না পরলেও মেয়েরা বুকে শাড়ীর আঁচলটা দেয়। যদিও বেশ বোঝা যায় সেটা বেশীদিনের অভ্যাস নয়। কাপড় সরে গেলে বা পড়ে গেলেও সান পায় না সহজে।

আমরা নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলুম। অনুষ্ঠান শুরু হবে এমন সময় জঙ্গলের দিক থেকে ভেসে এল ঢোলের আওয়াজ। সবাই যেন শিউরে উঠল সে শব্দ শুনে। গাদরু দুপা এগিয়ে গেল মণ্ডপ ছেড়ে। তারপর কান পেতে শুনতে থাকে। সমস্ত বিবাহমণ্ডপটা স্তব্ধ উৎকর্ণ। কারা ঢোল বাজাচ্ছে তা ওরা জানে না, তবে সঙ্কেতটা বিপদের।

একটু পরেই জঙ্গল থেকে বার হয়ে এল ওরা। জনা তিন-চার মাতব্বর শ্রেণীর লোক। পা টলছে সকলের। মদ্যপান করেছে মাত্রাতিরিক্ত। গাদরু আয়েতুর দল বেরিয়ে এল সভামণ্ডপ ছেড়ে।

ওদের মধ্যে একজন লোকের হাতে ত্রিশূল জাতীয় একটা বর্শা। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় সেই দলপতি। ডাক্তারবাবু কানে কানে বলেন: এই লোকটাই হচ্ছে কাবোঙ্গার গুণিয়া, যে বলেছিল চয়ন আর কোনদিন ভাল হবে না।

লোকটা মাজায় হাত দিয়ে বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়াল এবার। সকলের উপর ঘোলাটে-লাল চোখ দুটো বুলিয়ে নিল—মালকোর বেশবাস দেখে ব্যঙ্গের হাসি হাসল। তারপর বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে কি যেন বলতে থাকে অনর্গল।

ভাষা না বুঝলেও তার বক্তব্যের মধ্যে ব্যঙ্গ, শ্লেষ আর উত্তেজনামূলক শব্দ যে যথেষ্ট ছিল সেটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না। বারে বারে আমাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে কি যেন বলছে সে। কিছুই বুঝতে পারছিনা। তবু ভাবগতিক যে সুবিধার নয় এটুকু বোঝা যায়।

শার্মিলা দেবী উঠে দাঁড়ালেন আখালীর দাওয়ায়। গুণিয়া উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। ডাক্তার পিল্লাইও উঠে দাঁড়ালেন। গাদরু বোধহয় বাধাদেবার জন্যই এগিয়ে আসছিল, তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আসরের মাঝখানে মহড়া নিয়ে দাঁড়াল চয়ন। দুহাত বাড়িয়ে আমাদেব আড়াল করে দাঁড়াল বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে আসা বর।

চয়ন নিরস্ত্র। গুণিয়ার হাতে দীর্ঘাকৃতি ত্রিশূল। চয়নের পাঁজরা-ঘেঁষে অবশ্য তৎক্ষণাৎ এসে দাঁড়াল সশস্ত্র চেলিকদল—দলপতির নির্দেশের অপেক্ষায়।

চয়নকে উঠে আসতে দেখে গুণিয়া নাটকীয় ভঙ্গিতে মাটিতে থুথু ফেলল। মুখটা বাঁহাতের উল্টো পিঠে মুছে নিয়ে কয়েকটা কথা বলল চিবিয়ে চিবিয়ে। আর তারপরেই খলখল করে হেসে উঠল আচমকা।

মুহূর্ত মধ্যে ক্ষেপে গেল চয়ন। গর্জন করে কি যেন বলল মাতালটাকে।

গুণিয়াও প্রত্যুত্তরে গর্জন করে উঠ্‌ল, আর সঙ্গে সঙ্গে উদ্যত করল হাতের ত্রিশূল। শিউরে উঠ্‌লুম আমরা সবাই; কিন্তু ক্ষিপ্র শার্দুলের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়ল চয়ন গুণিয়ার উপর। একটা ধস্তাধস্তি। খণ্ড-মুহূর্তের বিহ্বলতা। জনতা সম্বিত ফিরে পেয়ে বাধা দিতে আসার আগেই চয়ন কেড়ে নিয়েছে গুণিয়ার ত্রিশূলটা। আর বাঁ হাতে টিপে ধরেছে ওর গলা। ডাক্তারবাবু মাড়িয়া ভাষায় চীৎকার করে কি যেন আদেশ করলেন। মন্ত্রের মতো কাজ হল তাতে। চয়ন ওকে ছেড়ে দিল। ফিরে এল, মাথা নীচু করে গিয়ে বসল ফের বিবাহমণ্ডপে।

মাতালগুলো আর কিছু করতে সাহস করল না। গাদরু, আয়েতু আর কোণ্ডা অনেক অনুরোধ উপরোধ করল ওদের, ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে। কিন্তু না, গুণিয়া ওদের মিলিত অনুরোধ উপেক্ষা করে ফিরে গেল জঙ্গলের দিকে। যাবার আগে শাসিয়ে গেল যেন।

এবার বসল পরামর্শ সভা। সবাই গালমন্দ করল চয়নকে। সে কিন্তু আর একটা কথাও বলল না। দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইল চুপচাপ। বুড়ি কিরিংগো কি যেন একটা ফোড়ন কাটল, আর গাদরু ঘাড় নেড়ে বলল : হুয়!

ডাক্তারবাবু বললেন : চলুন, তাঁবুতে ফেরা যাক এবার। আজ আর 'লাগির' হবেনা। অমঙ্গলের সূচনা হয়েছে। চয়ন নিয়ম ভেঙেছে। আজকের রাতটা তাকে উপবাসী থাকতে হবে। কাল সকালে প্রায়শ্চিত্ত হবে—বিকালে লাগির।

চোখের উপর ঘটল ঘটনাটা। অথচ কিছুই বুঝতে পারলাম না। যেন ডাব' করা হয়নি—এমন একটা কন্টিনেণ্টাল ছবির 'র‍্যাস-প্রিণ্ট' দেখছিলুম এতক্ষণ। তাঁবুতে ফিরে এসে সবিস্তারে তার ব্যাখ্যা শুনলুম।

গুণিয়া আসছে দন্তেওয়ারা থেকে। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এনেছে সে। প্রবীর-চন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে সরকার তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা বিজয়চন্দ্র ভঞ্জদেওকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাস্তারের মহারাজা বলে ঘোষণা করেছেন। কংগ্রেস সরকারের সে নির্দেশ মেনে নিতে রাজি হলনা আদিবাসী প্রধানেরা। প্রাক্তন মহারাজার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রবীরচন্দ্র যতদিন জীবিত আছেন ততদিন মাতা দন্তেশ্বরীর নির্দেশে তিনিই বাস্তারের রাজা। 'ডিভাইন রাইট অফ কিংস্' নাকি তুচ্ছ কংগ্রেসী সরকারের ফতোয়ায় নাকচ করা যায়না।

বিজয়চন্দ্র সিংহাসনে বসলেন, কিন্তু প্রজাসাধারণের সমর্থন পেলেন না। গত সপ্তাহে জেলা কর্তৃপক্ষ নতুন রাজাকে নিয়ে গিয়েছিলেন দন্তেশ্বরী-মাতার মন্দিরে। সাড়ম্বরে নতুন রাজা মায়ের পুজা দেবেন। অভিষেকের পরে এটাই চিরাচরিত প্রথা। দন্তেশ্বরী মায়ের পুরোহিতেরা সে পুজা প্রত্যাখ্যান করে বসল। বিজয়চন্দ্রকে তারা নতুন মহারাজ বলে মেনে নিতে রাজি নয়।

দেখা দিল সেই শাশ্বত সংগ্রাম, সেই দ্বৈরথ দ্বন্দ্ব! গোবিন্দ মাণিক্য বনাম রঘুপতি, ইংলণ্ডেশ্বর বনাম টমাস বেকেট!

কিন্তু যুগ পালটেছে। রাজায় রাজায় লড়াই হলে আজকাল উলু খাগড়াই শুধু মরে; মা আর রাজরক্ত চাননা! বেকেটরাও মরেনা। মরে সাধারণ মানুষ। তাই রক্তারক্তিটা মুলতুবি থাকল।

এ পক্ষ নানাভাবে বোঝালেন। রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দাখিল করলেন। ভারত সরকারের সঙ্গে রাজন্যবর্গের সম্পর্কটা বোঝাতে চাইলেন। ওরা বললেঃ একটি মাত্র সর্তে নতুন রাজাকে মেনে নিতে রাজি আছি। তোমরা আমাদের সাবেক রাজা প্রবীরচন্দ্রকে ছেড়ে দাও। তিনি এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলুন—তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেছেন, তাঁর ভাইকে শাসনদণ্ড দিয়েছেন, তবেই রাজার ছোটভাইকে রাজা বলে মেনে নেব আমরা।

সে সর্ত এ পক্ষের থেকে পালন করা সম্ভবপর হয়নি। উত্তেজনা বাড়ছে। আদিবাসী দলনেতাদের কাছে গোপন নির্দেশ আসতে শুরু করেছে—গোপনে প্রস্তুত হও সবাই। বিদ্রোহ অনিবার্য। জোর করে মহারাজকে বন্দীশালা থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে!

গুণিয়া বলতে এসেছিল—এ সময়ে দেশেব আহ্বান উপেক্ষা করে, আদিবাসী সমাজের সম্মান ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে যারা বিয়ের আসরে নাচগান নিয়ে মাতে, তাদের ধিক, শত ধিক। আমরা কংগ্রেসী সরকারের লোক বলে সে আমাদের কিছু শিক্ষা দিয়ে দেবার শুভ কামনা নিয়ে এগিয়ে আসছিল। চয়ন ছুটে এসে বাধা দেওয়ায় শ্লেষের সঙ্গে বলেঃ পুরুষমানুষের ঝগড়ায় তুই মেয়েমানুষ কেন আসছিস্ আগ্ বাড়িয়ে?

চয়ন বিস্মিত হয়ে বলেছিলঃ মেয়েমানুষ মানে?

নিষ্ঠিবন ত্যাগ করে, মুখটা মুছে নিয়ে গুণিয়া বলেছিলঃ তোর ঐ মিথ্যাবাদী ডাক্তারসাহেব যতই মিথ্যা স্তোক দিক, আর মালকো যতই গোপন

করুক ঐ চাক্‌লার সবাই জানে রঙ্গিলা তোকে এক ধুরবানে মেয়েমানুষ করে রেখে গেছে। —বলেই তার খলখল হাসি!

সে হাসি সহ্য করতে পারেনি চয়ন। অসহ্য অপমানে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল গুণিয়ার উপর।

আনন্দ উৎসবের মাঝখানে হঠাৎ এ ঘটনায় সকলেই দিশেহারা হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত বুড়ি কিরিংগোর বিধানই বহাল রইল। আজ রাত্রে উপবাস করতে হবে চয়নকে। কাল সকালে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

চয়ন নাকি প্রথমটায় আপত্তি জানিয়েছিল প্রায়শ্চিত্তের এ ব্যবস্থায়। কিন্তু সকলের মিলিত শক্তির কাছে তাকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। রাজি হয়েছে প্রায়শ্চিত্তের অবমাননা মেনে নিতে। কিন্তু বেশ বোঝা যায় সেটা খুশী মনে মেনে নেয়নি। গুণিয়ার কথাগুলোতে সে রীতিমতো বিচলিত হয়েছে। দেশের রাজাকে যখন গায়ের জোরে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গেল তখন যারা উৎসবের আয়োজন করে, তাদের ধিক, শতধিক! চয়ন একটা ঘটুলের শিরদার হয়ে এ উপেক্ষা, এ অবমাননা যেন মেনে নিতে পারছিল না। গুম মেরে বসে রইল সে নিজের ছাপরায়—যেমন ভাবে এতদিন সে বসে থাকত তার ঘরে। চিন্তিত হল কোওা, শিউরে উঠ্‌ল মাল্‌কো বান্ধবীদের মুখে এ খবর শুনে।

মুখ শুকিয়ে ওঠার আরও একটা কারণ ছিল। খবর পাওয়া গেছে গুণিয়া তার দলবল নিয়ে ফিরে যায়নি। ঝোপের ওপাশে তারা ঘাঁটি গেড়েছে। কোওা আয়েতুর দল গিয়ে আবার তাদের কাছে ক্ষমা চাইল—বিয়েতে যোগদানেব জন্য অনুরোধ করল, কিন্তু ওবা অপমান করে তাডিয়ে দিল এদের।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে এলাম তাঁবুতে। এমন একটা কাণ্ড যে ঘটতে পারে তা কেউই আশঙ্কা করেনি। সন্ধ্যার পর আজ আর নাচগান কিছুই হলনা। রণক্লান্ত শিবিরের শোকাছন্ন স্তব্ধতা নেমে এসেছে উৎসবমুখর কারংমেটা গাঁয়ের বুকে। রাত্রে শোবার সময় বললুম: লাগির দেখা আমার বরাতে নেই। কাল সকালেই ফিরতে হবে আমাকে।

: আর একটা দিন থেকে যেতে পারেন না?—বলেন শর্মিলাদেবী।

: উপায় নেই। মার্চের আজ পঁচিশ তারিখ।

পরদিন সকালেই ফিরতে হল বটে, কিন্তু যতটা বিষণ্ণমনে ফিরতে হবে আশঙ্কা করেছিলুম তার চেয়ে সহস্রগুণ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে আসতে হল।

· ভোরবেলাতেই খবর পাওয়া গেছে—চয়ন গোপনে গৃহত্যাগ করেছে কাল গভীর রাত্রে। গুণিয়ার দল যেখানে থানা গেড়েছিল সেখানেও জনমানব নেই। অধিবাসীদের সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে চয়নের যোগাযোগ ছিলই। কালরাত্রে সেখান থেকে কী এক গোপন নির্দেশ এসেছে। এনেছিল গুণিয়াই, মধ্যরাত্রে সে এসেছিল নাকি চয়নের ছাপরায়। আজ সকালে এই কাণ্ড!

ফিরে চললাম মার্চ-ফাইনাল বিল পাশ করতে। মাল্‌কোর বুকফাটা কান্নাটা কানে বাজছে! মাড়িয়া ভাষায় কী যেন বলছে আর্তকণ্ঠে! ভাষাটা বোঝা যায়না—কিন্তু কান্নার কি কোন ভাষা আছে? প্রিয়জন-বিরহের যে আর্তি তার বহিঃপ্রকাশেরও দেশ-কাল-নিরপেক্ষ একটা ব্যঞ্জনা আছে। 'বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী'-র এ আর্তরোদন তো দণ্ডকারণ্যের ট্র্যাডিসন! সত্যযুগে মধুমত্ত নগরাধিপতির অতর্কিত অন্তর্ধানে ভার্গব-তনয়াও একদিন এ অরণ্যে অমনি বুকফাটা কান্না কেঁদেছিলেন—কেঁদেছিল চক্রবাক এই তমসাতীরেই শরাহত সঙ্গিনীর বিরহে! আজ মালকোও কাঁদছে! নয়ী-মৌর লুটাচ্ছে পথে, সিল্কের ছাপা শাড়িতে লেগেছে ধূলো, মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে মাল্‌কো!

অরণ্যবাসের মেয়াদ শেষ হয়ে এল। স্বেচ্ছায় এসেছিলাম ডেপুটেশনে—অরণ্যকে দেখব বলে। শহুরে মানুষের চোখে অরণ্য যে অপার বিস্ময়! যাবার দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই মনে হচ্ছেঃ হলনা, দেখা হল না! হে অরণ্য-দণ্ডক, দোষ তোমার নয়, অপরাধ আমার! আমিই চোখ তুলে তাকাতে ভুলেছি! তোমার গম্ভীর উদাত্তরূপ স্তরে স্তরে মেলে ধরেছ আমার চোখের সম্মুখে—আমি খেয়াল করিনি। অরণ্যকে দেখতে গিয়ে আমি শুধু দেখে এলুম অরণ্যচারীদের!

মনে পড়ছে বিভূতিবাবুর রচনা—'আজ এখান থেকে···বিদায় নিলুম, হে সুপ্রাচীন অরণ্য, তোমায় প্রণাম করি। শত বিস্ময়ের সৌন্দর্যভূমি তোমার মধ্যে হাজার বছর ধরে লুকানো ছিল, কেউ আসেনি দেখতে—এতদিনে দেখে দেখে ধন্য হয়ে গেলাম। আজ ষোলো দিন ধরে বনপুষ্প সুবাস উপভোগ করেছি তোমার বনে বনে, তোমার বনবিহঙ্গের কলগীতি শুনে কান জুড়িয়েছি··· তোমাকে প্রণাম করি।"

ষোলো দিন নয়, দীর্ঘ দু'বছরের মধ্যেও তো এমন দৃষ্টি নিয়ে অরণ্য-দণ্ডককে দেখিনি? প্রণাম জানাইনি অরণ্যের অধিদেবতাকে! রঙিন প্রজাপতি, শিমুলের রাঙা ফুল, ধনেশপাখীর ডাক, জলপ্রপাতের জলপতনধ্বনি আর লেজ-ঝোলা হল্‌দে পাখীর উপহার পাঠিয়ে এ অরণ্যও তো আমার হৃদয় জয় করতে চেয়েছিল বারে বারে। উদাসীন আমি ভ্রূক্ষেপ করিনি। স্তব্ধ গম্ভীর উদাসীন অরণ্যের স্বরূপে বৃহতের যে ব্যঞ্জনা, ভূমার যে প্রকাশ—তা আমি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করিনি। অন্যমনস্ক ক্ষ্যাপার মতো পরশ-পাথর মুঠির মধ্যে পেয়েও ছুঁড়ে ফেলেছি দূরে! এক সার অর্ধ-উলঙ্গ নরনারী আমার দৃষ্টির সামনে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল এতদিন। তাদেরই দেখেছি—অরণ্যদেবীকে নয়!

কালরাত্রে পড়ছিলুম বিভূতিবাবুর ডায়েরি। লিখছেন—"রাঙা ফুলে ভর্তি বড় শিমুলগাছটা চোখে পড়ল। আমি সৌন্দর্যে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লুম। আর নড়তে পারিনে, অন্যদিকে চোখ ফেরাতে পারিনে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি হল—সে অনুভূতি এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে, তার কথা আমি কাল সারাদিন ভুলিনি। এবং সে কথা এখানে লিখেও রাখলুম এ জন্য যে এই সব দুর্লভ অনুভূতিরাজি যখন অস্পষ্ট হয়ে যাবে,

তখন এই কটি লাইন পড়লে কালকার অনুভূতির বাণী আমার মনে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।"

তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করে খুলে বসলুম দণ্ডক-শবরীর ডায়েরি। পাতার পর পাতা লিখে গেছি—কিন্তু কই, এমন একটিও অনুভূতির কথা তো আমি লিখে রাখিনি ভবিষ্যতের পুঁজি করে? কেশকল ঘাটের ধ্যানস্তিমিত পাহাড়ের পাদমূলে বসে থাকা সেই আশ্চর্য বিকাল, চিত্রকোট জলপ্রপাতের পদপ্রান্তে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় উদ্ভাষিত জলকণার প্রতিসরণে সপ্তবর্ণা অবাক-আকাশ, কোৎরি নদীতে হঠাৎ আসা বানে আটক-পড়া পারলকোটের পর্ণকুটিরে সেই বর্ষণমুখর বিনিদ্র রাত্রি—কই সেসব কথা তো লেখা হয়নি! তবে কি যাবার দিনে বিভূতিবাবুর সুরে সুর মিলিয়ে আমার বলার অধিকার থাকবে না—"প্রণাম, হে খেয়ালী অরণ্য দেবতা, প্রণাম!"

তবু খেদ নেই। সে অধিকার না অর্জন করে থাকি নাই করলেম। আমি দেখে গেলাম অবাক আরণ্যক জীবনকে। মানবসভ্যতার গঙ্গোত্রীকে!—পাহাড়ের কোলে কোলে অখ্যাত অজ্ঞাত গাঁয়ের সরল বাসিন্দাদের। এ 'ইয়ারো'ই কি কম সুন্দব? এও তো হাজার বছর ধরে অনাদৃত পড়েছিল আমার চোখ তুলে দেখবার অপেক্ষায়! যাবার দিনে না হয় আমি বলে যাব:

প্রণাম হে আবণ্যকজীবন, প্রণাম!

তারিখটা আজও মনে আছে। ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ। শুক্রবার।

মার্চ-ফাইনালের হিড়িকে কোরাপুট থেকে ছুটে এসেছি জগদলপুরে। চীফ এ্যাকাউণ্টস্ অফিসারের দপ্তরে, শেষরাত্রে ওস্তাদের মার মারতে। সমস্তদিন উবুড় হয়ে পড়েছিলাম বিল-এম.বি-র স্তূপে। ফিনানসিয়াল ইয়ারের শেষদিন। কাজ কর্ম মিটতে রাত আটটা। শ্রান্ত দেহে অফিস থেকে বেরিয়ে জীপে গিয়ে বসলাম। ড্রাইভার পাঁড়েজি-কে বলি: ধরমপুরা কলোনীতে চল। সার্কিট-হাউসে আজ রাতে থাকব।

অফিস থেকে ধরমপুরা যেতে পথে পড়ে গুপ্তেজীর বাসা। একটা কালো বোর্ডে লেখা 'টু-লেট্'। আমার মনে হল 'টু-লেট'। কয়েকটা দিন আগে

এলে দেখা পেতুম সেই আদিবাসীদের অকৃত্রিম বন্ধুটির।

স্বল্পভাষী পাঁড়েজি সিনেমা হাউসের কাছে মোড়-ঘুরবার সময় বললে: লেকিন হুয়া ক্যা?

তাইত। ব্যাপার কি? এতক্ষণ নিজের চিন্তায় ডুবেছিলাম বলে খেয়াল করিনি। শহরটা যেন থম্ থম্ করছে। সিনেমার শো বন্ধ। দোকানপাট খোলা নেই একটাও। পথে লোক চলাচলও অতি ক্ষীণ; শুধু এখানে-ওখানে গলির মোড়ে মোড়ে জটলা। অত্যন্ত জোরে একটা ওয়েপন কেরিয়ার ওভার-টেক করে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। ব্যাপার কি? খবরের কাগজও দেখিনি দিন তিনেক। রেডিও শোনাও হয়নি। পথে পথে কেটেছে কদিন। ডুবে ছিলাম বিলের সমুদ্রে। জেলখানার উপর, হ্যাঁ। স্পষ্ট মনে পডছে, জাতীয় পতাকাটাকে উডতে দেখেছি পতাকাদণ্ডের শীর্ষদেশেই। তাহলে শহর এমন শোকাচ্ছন্ন, স্তব্ধ কেন?

সার্কিট-হাউসে পৌঁছে পেলাম খবরটা।

লোহাণ্ডিগুডায় গুলি চলেছে। হতাহত নাকি অসংখ্য!

অসংখ্য? মানে?

কেউ বলে পঞ্চাশ, কেউ বলে শ'য়ের উপর!

সার্কিট-হাউসের পাশেই একজন উঁচু মহলের অফিসারের ডেরা। হানা দিলাম সেই রাত দশটায়। বোস সাহেব জেগেই ছিলেন। বসালেন আপ্যায়ন করে। হ্যাঁ, খবর ঠিকই। গুলি চলেছে। হতাহতের নির্ভুল সংখ্যা জানা যায়নি। তবে হ্যাঁ, কিছু লোক মারা গেছে বটে।

বললাম: আমি তো কিছুই জানি না। কি হল এর মধ্যে?

শুনলাম বিস্তারিত সব ঘটনা। উডিষ্যার কোরাপুটবাসী আমার এত কথা জানা ছিল না।

বিজয়চন্দ্রকে দন্তেশ্বরী মন্দিরে পুজা দিতে না দেওয়ার পর থেকেই বাস্তারের রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। উত্তেজনা বাডতে থাকে। আদিবাসী দলপতিদের কাছে গোপন নির্দেশ আসে—জোর করে ছিনিয়ে আনতে হবে কারারুদ্ধ মহারাজ প্রবীরচন্দ্রকে। এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ওরা প্রস্তুত হচ্ছিল কদিন ধরে। গতকাল হাট ছিল করঞ্জিবাজারে। ওরা দলে দলে সমবেত হয়েছিল সেই হাটে। তীর ধনুক, বর্শা, মাকস্থ হাতে

নিয়ে মাল্লি ঢোলে যুদ্ধের দামামা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে এসেছিল সশস্ত্র জনতা। সামনের কয়েকজনের হাতে দেবনাগরি হরফে হাল্‌বিতে লেখা ফেস্টুন: "রাজাকে ফিরিয়ে দাও।"

সে ফেস্টুন দেখে বুঝতে পারা যায় এ আন্দোলনের পরিচালনা আদিবাসী দলপতিরা করছেনা, করছে আর কেউ। দেবনাগরি হরফ তো দূরের কথা, ফেস্টুন কাকে বলে তাই ওরা জানেনা। সরকারী মহলে খবর পৌঁচেছিল ঠিক সময়েই। পুলিস ফাঁড়িতে প্রস্তুতির অভাব ছিল না। পুলিসের বড় কর্তাও হাজির হলেন অকুস্থলে। নতুন মহারাজা বিজয়চন্দ্রকেও নিয়ে যাওয়া হল। বিরাট জনতা এগিয়ে আসতে থাকে পুলিস ফাঁড়ি লক্ষ্য করে। তাদের কণ্ঠে একটি মাত্র ধ্বনি—'আমাদের রাজাকে মুক্তি দাও!'

অনেক কষ্টে গতকাল সে আন্দোলনকে রোখা গেছে। পরদিন, অর্থাৎ আজ হাটবার গেছে লোহাণ্ডিগুড়ায়। নগণ্য গ্রাম। এখানেই এককালে ছিল সমৃদ্ধিশালী চক্রকোট তালুক আর কুরুশপাল। স্থানীয় লোকেরা কিছু খবর জানত না। অথচ রাত শেষ হবার আগেই দেখা গেল সেখানে দলে দলে এসে জমায়েত হচ্ছে নানান জাতের আদিবাসী জনতা। রাতে কারা যেন এসে সেই জনতাকে কানে কানে বলে গেছে: দূর বোকা! কাল করঞ্জিবাজারে তোরা অমন ভেড়ুয়ার মতো হঠে এলি কেন?

এরা বলেছিল: সাহেব যে বললে, নাহলে গুলি ছুঁড়বে?

আগন্তুক শুভার্থী বলেছিল: দূর হাঁদারাম! ওরা গুলি ছুঁডবে না। ছুঁড়লেও ফাঁকা আওয়াজ করবে, ভয় নেই।

এদের সরল প্রশ্ন: ফাঁকা আওয়াজ মানে?

আদিবাসী-দরদী মর্মাহত হয়ে বলেন: কী গাধা তোরা! ফাঁকা আওয়াজ মানে বুঝিস্ না? মানে, ধোঁয়া বের হবে, শব্দ হবে, গুলি বার হবেনা। কারও গায়ে তা লাগে না। ও শুধু ভয় দেখাবার জন্যে ছোঁড়া হয়। বোকারা ধোঁয়া দেখেই ধোঁকা খায়। দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে শুনিস্‌নি? এখন সত্যিকারের গুলি ছোঁড়া যে আইনে মানা!

একজন বলেছিল: দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে মানে? এতদিনই তো দেশ স্বাধীন ছিল। এখন পরদেশীরা এসে আমাদের রাজাকে বন্দী করে রেখেছে—এই কথাই তো সেদিন বল্‌লি!

আগন্তুক হতাশ হয়ে বলে: তোমাদের নিয়ে আন্দোলন করা ঝকমারি কাজ বাবা।

আদিবাসীদের বৃদ্ধ দলপতি বলেছিল: ওসব বাজে কথা বাদ দে। সোজা কথাটা হচ্ছে ওরা গুলি করবেনা। এই তো? গুলি করলেও তাতে মানুষ মরবে না। ফাঁকা আওয়াজের ধোঁয়ায় আর শব্দে এক-আধটু চোট লাগতে পারে, কিন্তু তাতে মানুষ মরেনা—এই কথাই তো বলতে চাইছিস্?

একজন আদিবাসী তরুণ এগিয়ে এসে বলেছিল: মরে মরুক্! আমাদের হাতেও তীর আছে! এক এক তীর, এক এক মানুষ! বল্ কি করতে হবে।

: এইতো! ঠিক বলেছিস্!—ঘনিয়ে আসে আদিবাসীদরদী! তোদের ভয়টা কি! তোদের তীর তো আর ফাঁকা আওয়াজ করবে না। একটি একটি তীর খসবে, একটি একটি পুলিস খসবে। নয় কি?

সর্দারেরা হি-হি করে হেসে উঠেছিল শুনে: তা আর নয়? একটি-একটি তীর, একটি-একটি মানুষ! হুঁ হুঁ বাবা, আমরা ফাঁকা আওয়াজ করিনা!

পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত, কিন্তু রক্তাক্ত!

পরদিন ভোরেই ওরা জমায়েত হল তীর-ধনুক হাতে। শেষরাত্রে সেই যে ভদ্রলোক হাঁড়ি হাঁড়ি শুলপি সরবরাহ করেছিল, সে বললে—নর-সিংহগড়ে নয়, ঐ পুলিস ফাঁড়ির ভিতরেই আটক আছে তোদের রাজা। যা এগিয়ে যা, কিছুতেই পিছন ফিরবি না। তাহলে দন্তেশ্বরী মায়ের অভিশাপ পড়বে তোদের উপর। যেমন করে হ'ক ছিনিয়ে আনতে হবে তোদের রাজাকে!

ঘন ঘন মাথা নেড়ে এরা বলে: হয়, হয়!

সশস্ত্র জনতা এগিয়ে আসছে!

সাবধানবানী উচ্চারিত হল—হালবিতে, গোণ্ডিতে, মাড়িয়াভাষায়!

: আর এগিও না! ফিরে যাও!

ওরা চীৎকার করে ওঠে: রাজাকে ফিরিয়ে দে!

: আর এক পা এগিয়ে এলেই আমরা গুলি ছুঁড়ব!

এদের সর্দার হা-হা করে হেসে ওঠে: ছোঁড় না কত ফাঁকা আওয়াজ ছুঁড়বি। আমরাও তীর ছুঁড়ব! এক একটি তীর, এক একটি মানুষ!—বাবা, আমরা ফাঁকা আওয়াজ ছুঁড়িনা।

এগিয়ে আসে ধনুক-হাতে সহস্র জোয়ান।

হঠাৎ গর্জে উঠল 'গুম্-গুড়াম', বজ্র! গুম্-গুম্ গুম্!

কিন্তু এ কি! এমন তো হওয়ার কথা নয়! একসার আদিবাসী ভাইরা মাটিয়ে শুয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে কেন? এ তো ফাঁকা আওয়াজ নয়! সেই বাবুটি কোথায় গেল—যে হাঁড়ি-হাঁড়ি মদ জুগিয়েছিল কাল রাতে?

ওকি?…পথের ধূলোয় এত লাল রঙ কেন?…একি রক্ত? ফাঁকা আওয়াজেই এত রক্ত? ভানপুরীর সৈঁয়াই, বেণুরের লাখমুভাই, লোহাগুিগুডার গাইতা অমন নিথর হয়ে পড়ে রইল কেন পথের ধূলায় মুখ গুঁজরে? না, না! এমন তো হবার কথা ছিল না! কোথায় কি যেন ভুল হয়েছে।

আদিবাসী নেতারা ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকায়! কি করবে বুঝে উঠ্‌তে পারেনা!

ঐ তো কাবোঙ্গার গুণিয়া! বাঁ হাতে তলপেট চেপে ধরে বসে পড়েছে পথের ধূলায়। গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে মুঠি বেয়ে! সর্দার ঝুঁকে পড়ে বললে: কী হয়েছে গুণিয়া ভাই?

যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে কাবোঙ্গার গুণিয়া শুধু বললে: ফাঁকা আওয়াজ নয়। সর্দার! ওরা সত্যিকারের গুলি ছুঁড়ছে! পালাও!

ঊর্ধ্বশ্বাসে পিছু হঠতে শুরু করেছে পঞ্চাশ গাঁয়ের আদিবাসী জনতা! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেশা ছুটে গেছে ওদের। প্রাণধর্মের তাগিদে কাজ। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল তারা বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে।

শুধু রক্তাপ্লুত কতকগুলো হতভাগ্যের মৃতদেহ পড়ে রইল পথের ধূলোয়।

* * * *

ফিরে এলাম, সার্কিট-হাউসে। রাত তখন এগারোটা।

দেখি সার্কিট-হাউসের সামনে একটা মেডিক্যাল ভ্যান। এখনি এসেছে। ভিতরে ঢুকেই দেখলাম সামনের হল কামরাটায় বসে আছেন ডাক্তার আর মিসেস্ পিল্লাই। ডাক্তারসাহেবের চোখে বাসা-ভাঙ্গা ঝড়ের পাখীর অবোধদৃষ্টি।

: কি হয়েছে?—ছুটে গেলাম ওঁর কাছে।

: বারোজন মারা গেছে।—বললেন উনি গাঢ়স্বরে।

: বারোজন? কিন্তু আপনি এখানে এতরাত্রে?

: খবর পেয়ে এইমাত্র এসে পৌঁছলাম।

: থাকছেন তো এখানেই আজ রাত্রে?

: ঠিক বলতে পারিনা। কম্পাউণ্ডারবাবুকে পাঠিয়েছি হাসপাতালে। সে ফিরে এলে বুঝতে পারব, বাকি রাতটুকু এখানেই থাকব, না লোহাগুড়ায় যেতে হবে।

: লোহাগুড়ায়!—এতরাত্রে?

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন না। বাইরে কিসের শব্দ হওয়ায় উঠে দেখতে গেলেন কম্পাউণ্ডারবাবু ফিরে এসেছেন কিনা।

শর্মিলাদেবীকে বলি: কি হয়েছে বলুন তো ঠিক করে?

: চয়ন গিয়েছিল লোহাগুড়ায় রাজাকে ছিনিয়ে আনতে!

: সে কি! তার কোন খবর পাননি

: না!

: যারা মারা গেছে……

: হ্যাঁ, কম্পাউণ্ডারবাবু সেই খোঁজই আনতে গেছেন। যে বারোজন মারা গেছে তাদের নাম ঠিকানার সন্ধানে।

নির্বাক বসে থাকি দুজন।

একটু পরে শর্মিলাদেবী বলেন: মাল্‌কোর দিকে আর তাকানো যায়না। সেও এসেছে। কম্পাউণ্ডারবাবুর সঙ্গে গেছে হাসপাতালে।

বললুম: আপনারা ভুল করেছেন। যদি, যদি চয়ন মারা গিয়ে থাকে, মানে তাহলে মাল্‌কোকে নিয়ে মুশ্‌কিলে পড়বেন আপনারা!

: কিন্তু, কি মনে হয় আপনার? চয়ন…চয়ন ··?

হেসে বলি: পাগলবাই দীর্ঘদিন বাঁচে শর্মিলা দেবী, সুস্থ সবল মানুষ বড তাডাতাডি পট্ করে মরে যায়!

বলেই বুঝতে পারি অন্যায় করেছি। ওঁর দুর্বলতম স্থানে আঘাত করে বসেছি অজান্তে। একদিন উনি বলেছিলেন—চয়নের মৃত্যুকামনা করেন তিনি। সেই কথাটা মনে করিয়ে দিতেই এ বক্রোক্তি করেছিলুম—কিন্তু এ পরিবেশে সেটা করা ঠিক হয়নি।

অসমাপ্ত বিবাহ-বাসর থেকে চয়ন নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর ওঁরা কতটা উদ্‌বিগ্ন হয়ে পডেছেন আন্দাজ করা যায়। এই মধ্য-রাত্রে দুজনে ছুটে এসেছেন নারানপুর থেকে সেই ছেলেটির সন্ধানে। ঠিক এ সময় ও আঘাত করা আমার পক্ষে সৌজন্যের পরিচায়ক নয়। মাথাটা নীচু হয়ে যায় শর্মিলা দেবীর

—বুকের উপর নেমে পড়ে মুখটা।

অপ্রস্তুতের একশেষ। আমি অনুতপ্ত কণ্ঠে বলি: মাপ করবেন শর্মিলা দেবী, আমি ঠিক ওকথা বলতে চাইনি।

ধীরে ধীরে উনি মুখটা তোলেন। দু'চোখে নেমেছে জলের দুটি ধারা। ধরা গলায় মিসেস্ পিল্লাই বলেন: বিশ্বাস করুন এঞ্জিনিয়ার-সাহেব, সেদিন আমি যা বলেছিলুম সেটাই আমার অন্তরের শেষ কথা নয়! আজ আমি সর্বান্তঃকরণে চাইছি চয়ন সুস্থ সবল হয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুক।···না, না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়! আজকের দুর্ঘটনায় চয়ন যদি আবার পাগল হয়েও গিয়ে থাকে, আর তার চিকিৎসার জন্য আবার যদি উনি ক্ষেপে ওঠেন, তবু আমি চাই সে বেঁচে থাকুক! সেই প্রার্থনাই নিরন্তর করছি, এ দুঃসংবাদ পাওয়ার পর থেকে!

ঠিক কথা। আমারই ভুল হয়েছিল সেদিন। মানুষ শুধু স্বার্থপর নয়। মানুষের সম্বন্ধে এইটেই শেষ কথা হতে পারে না। না হলে কোন বিশ্বাসের পাথেয় নিয়ে আজকের দুনিয়ায় মানুষ চড়াই ভাঙছে? পরের দুঃখে চোখের জল ফেলবার শুভলগ্ন যদি নাই এল জীবনে তাহলে এই দুনিয়াদারী প্রহসনের অর্থ কি? কে জানে হয়তো শুয়োরছানার আর্তনাদে চয়নের মা-ও স্থির থাকতে পারত না।

শর্মিলাদেবীর চোখের জল আর বাধা মানছে না। হঠাৎ ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলেন উনি। উঠে যাব কিনা ভাবছি, সেই মুহূর্তেই নিবে গেল ইলেকট্রিক বাতি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। রাত বারোটায় সার্কিট-হাউসে বাতি নিবে যায়। কর্তৃপক্ষের মিতব্যয়িতার এ বন্দোবস্তই আমাকে অব্যাহতি দিল রোরুদ্যমানা একটি মহিলার মুখোমুখি বসে থাকার বিড়ম্বনা থেকে।

টর্চের আলো পড়ল প্রবেশদ্বারে। ডাক্তারবাবু ফিরে এলেন, তাঁর পিছন পিছন কম্পাউণ্ডারবাবু। প্রবেশদ্বারের সামনে তারাভরা আকাশের পশ্চাৎপটে আর একটি হতভাগিনী তরুণীর সিলুয়েৎ! মালকো!

প্রশ্ন করি: কি হল? হাসপাতালে কোন খবর পাওয়া গেল?

কম্পাউণ্ডারবাবু জবাব দিলেন: হ্যাঁ স্যার। বারোজনই মারা গেছে। আর আহত হয়েছে অনেকে। আহতদের মধ্যে খুঁজে দেখেছি, চয়ন নেই।

আর প্রশ্ন করতে সাহস হয় না।

শর্মিলাদেবীই পরের প্রশ্নটা করেন: আর যারা মারা গেছে?

তারা হাসপাতালে নেই। মৃতদেহগুলি রাখা আছে থানায়। বারোজনের মধ্যে আটজনকে সনাক্ত করা গেছে—তারমধ্যেও চয়ন নেই। বাকি চারজন এখনও বেওয়ারিশ!

আবার প্রশ্ন করি: তাদের দেখেন নি?

না স্যার। আমাকে সেখানে ঢুকতে দিল না। সমস্ত এলাকাটা পুলিস কর্ডন করে আছে। তাই তো স্যারকে বলছি—আপনি চলুন, মাল্কো এখানে ওঁর কাছে থাক বরং।—অন্ধকারের মধ্যে দেখতে না পেলেও বুঝতে পারি মিসেস্ পিল্লাইয়ের দিকে নির্দেশ করছে সে।

শর্মিলা দেবী ডাক্তারসাহেবকে বলেন: সেই ঠিক হবে। মাল্কো আমার কাছে থাক। তুমি বরং ভ্যানটা নিয়ে মর্গে যাও!

ডাক্তারবাবু এসে পর্যন্ত কোনও কথা বলেননি। এখনও কিছু বললেন না। সামনের একখানা চেয়ারে বসে পড়েছেন। অন্ধকারে তাঁর মুখখানাও দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো ঝুঁকে পড়েন আমার দিকে। অন্ধকারের মধ্যে আমার হাতদুটি ধরে বলেন: আপনি যাবেন? অবশ্য রাত এখন অনেক, আপনিও পরিশ্রান্ত—

আমি বললাম: সেজন্য কিছু নয়, কিন্তু আমাকে আপনার সঙ্গে নিতে চাইছেন কেন?

না, ঠিক সঙ্গে নয়। আমি তাহলে এখানেই অপেক্ষা করতুম।—একটু ইতস্তত করে ফের বলেন: কাটা-ছেঁড়া মৃতদেহ আমি কেমন যেন স্ট্যাণ্ড করতে পারিনা।

বক্তা রমানাথা পিল্লাই! পাঁচবছর কাটা-ছেঁড়া মড়া ঘেঁটে রেকর্ড-মার্ক নিয়ে ডাক্তারী পাশ করেছেন। বুঝতে পারি ওঁর অবচেতন মন বলছে, চয়ন ঐ বেওয়ারিশ বারোজনের একজন! চয়নকে উনি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছেন। তাই এ দ্বিধা! ডাক্তার নিজের নিকট-আত্মীয়ের চিকিৎসা করেনা—প্রিয়জনের মৃতদেহের ময়না তদন্ত করেনা।

কিন্তু আমি নিরুপায়। আমার পক্ষে এখন কিছুতেই সম্ভবপর নয়, মড়া-কাটাঘরে যাওয়া। বলতে হল সে কথা: ডাক্তার পিল্লাই, আমি নিতান্ত

দুঃখিত। আমি যেতে পারছি না। একটা ভারি জরুরী কাজ বাকি আছে-আমার। সেটা আজ রাত্রেই শেষ করতে হবে।

আমার হাতটা ছেড়ে দিলেন ডাক্তারসাহেব।

: ও! আয়াম সরি!—সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ান এবার। মুহূর্তে মনস্থির করে ফেলেন। আদেশের ভঙ্গিতে কম্পাউণ্ডারকে বলেন: ইয়েস, আয়াম রেডি। চল আমরা দুজনেই যাই তাহলে—ওঁর কি একটা জরুরী কাজ আছে বলছেন!

বাধা দেন শর্মিলা দেবী: দাঁড়াও! আমার তো কোন জরুরী কাজ নেই। আমি যাব তোমার সঙ্গে। মাল্‌কো বরং অপেক্ষা করুক চৌকিদারের বউয়ের কাছে!

: তুমি? কিন্তু সে কাটা-ছেঁড়ার মধ্যে—

: হোক! আমি তোমাকে একলা যেতে দেবনা, চল—

ওঁরা তিনজনে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে মেডিক্যাল ভ্যানটি আর্তনাদ করে উঠ্‌ল। অন্ধকারের মধ্যে একাই পড়ে রইলাম আমি।

ওঁরা বেরিয়ে যেতেই আমাকে উঠ্‌তে হল। সত্যই অত্যন্ত জরুরী একটা কাজ বাকি ছিল আমার। সে কাজটা আমাকে যেমন করেই হক শেষ করতে হবে আজ রাত্রে—এই একত্রিশে মার্চ রাত্রেই।

স্যুটকেশ হাতড়ে বার করলাম একটা মোমবাতি। ঘড়িতে দেখলাম রাত একটা। আর বার করলাম আমার পাণ্ডুলিপি। আজ রাত্রেই 'দণ্ডক-শবরী'র ডায়েরি শেষ করতে হবে। ডাক্তারবাবুরা ফিরে এলে আমার ইচ্ছামতো এ কাহিনী আর শেষ করতে পারব না।

হাড়ে হাড়ে চিনি সেই উদাসীন নাট্যকারটিকে! লোকটার কোন সেন্স অফ প্রপোর্শান নেই! যার নিশ্চিত মরার কথা তাকে বে-মক্কা বাঁচিয়ে তোলে; যার মৃত্যুর সম্ভাবনামাত্র নেই তাকে ফেলে বেঘোরে মেরে! লক্ষকোটী নায়ক-নায়িকা নিয়ে যুগযুগান্তর ধরে ঐ যে নেপথ্য নাট্যকার লিখে চলেছে এ বিশ্বনাটক ও না কেয়ার করে বক্স-অফিসকে, না কোন নাট্য-সমালোচককে! ঐ খেয়ালী লোকটা একবারও ভেবে দেখবে না নাটকের এই অঙ্কে চয়নের এভাবে মরার কথা নয়। মরতে হলে অনেক আগেই সে মরতে পারত! লোহাগুঁড়ার ধূলোয় তাকে বে-মক্কা মেরে ফেলাটা হবে

অতি চীপ স্টান্ট! কিন্তু ও পাগল নাট্যকারকে কিছু বিশ্বাস নেই—ও সব পারে!

আমি থেকে গেলাম সেই নেপথ্য-নাট্যকারের উপর টেক্কা দিতে! ডাক্তার-বাবু ফিরে আসার আগে আমার কাহিনী শেষ করতে হবে। এ চয়ন মহা-কালের হাতের পুতুল নয়—একে সৃষ্টি করেছি আমি, একে পুনর্জীবন দিয়েছেন ডাক্তার পিল্লাই! আমার নায়ককে আমি মরতে দেবনা, কিছুতেই না—

আমি লিখব: প্রায়ান্ধকার লাসঘরে ডাক্তার পিল্লাই টর্চের আলোয় একটি একটী করে বারোটি মৃতদেহকে পরীক্ষা করে চলেন। দুর্জয় সাহসে তাঁর হাত ধরে পাশে পাশে চলেছেন সেই দুঃসাহসী বাঙ্গালী মহিলাটি। ভয়ে, আতঙ্কে, উত্তেজনায় নীল হয়ে গেলেও স্বামীর হাতটা ধরে আছেন বজ্রমুষ্টিতে। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করছেন এখনই একটি চেনামুখ দেখে শিশুর মতো আর্তনাদ করে উঠবেন তাঁর পাগল স্বামী! ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে পার হয়ে চলেছেন সার দেওয়া মৃতদেহ! তারপর? তারপর শেষ মৃতদেহটি পরীক্ষা করে ডাক্তার পিল্লাই ছোটছেলের মতো বলে উঠবেন: থ্যাংক গড! হি ইস নট দেয়ার!

—না, এখানেই শেষ করব না। এর পরেও একটা ছোট অনুচ্ছেদ লিখব। চয়ন আর অলকোর মধুমিলনের দৃশ্য। কেমন করে? ও লিখতে বসলে মন-গড়া একটী সিচুয়েসান ঠিক দাঁড় করাতে পারব। এখন কাজ হচ্ছে শুধু তাড়াতাড়ি করা। বাস্তবের চয়ন মরুক বাঁচুক, আমার চয়নকে আমি বাঁচিয়ে তুলব ডাক্তারবাবুরা ফিরে আসার আগেই।

তাড়াতাড়ি কলমটা খুলে লিখতে বসি—

এক ফোঁটা কালি নেই কলমে······

উপায় নেই! অন্ধকারের মধ্যে ভূতের মতো বসেই থাকি ডাক্তার-বাবুর ফিরে আসায় অপেক্ষায়। আমি নিরুপায়! ইচ্ছামতো চয়নকে আর বঁাচাতে পারব না। যা ঘটছে তাই আমাকে লিখতে হবে এরপর। আমাকে মেনে নিতে হবে সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন নাট্যকারের চরম নির্দেশ!

=শেষ=